রচনাবলী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

সৈয়দ মুজতবা আলী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রচনাবলি

সৈয়দ মুজতবা আলী

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৬০

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম সংস্করণ প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
পৌষ ১৪২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
চারশত ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0459-X

SYED MUJTABA ALI RACHONABOLI (Vol. 2)
Collected works of Syed Mujtaba Ali
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh
Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com
Price : Tk. 430.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ময়ূরকণ্ঠী

গুরুদেব ১৩
নন্দলালের দেওয়াল-ছবি ১৬
বড় দিন ১৭
পাণ্ডা ১৯
গীতা-রহস্য ২১
বন ২৩
'নেভা'র রাধা ২৫
বর্বর জর্মন ২৮
ফরাসি-জর্মন ৩২
'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়—' ৩৩
স্বয়ংবর চক্র ৩৫
ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন ৩৭
শিক্ষা-সংস্কার ৩৯
কোনও গুণ নেই তার— ৪১
কালো মেয়ে ৪৬
ঋতালী ৪৮
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা ৫১
শ্রমণ রিয়োকোয়ান ৫৩
প্রব্রজ্যা ৬০
কিংবদন্তিচয়ন ৬৬
গাইড ৭৯
আচার্য তুচ্চি ৮০
নিশীথদা ৮৩
পরিমল রায় ৮৫
মপাসাঁ ৮৭
৮৯ রামমোহন রায়
৯০ বিশ্বভারতী
৯২ নাগা
৯৪ হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল
৯৮ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯৯ 'জিদ-ওয়াইল্‌ড্‌'
১০১ এযাস্য পরমাগতি
১০৩ দিস্‌ ইয়োরোপ!
১০৫ শমীম
১০৭ দিনেন্দ্রনাথ
১০৯ ভারতীয় নৃত্য
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
১১৪ নির্বাসিতের আত্মকথা
১২০ জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা
১২৩ ইন্দ্রলুপ্ত
১২৫ নয়রাট
১৫৩ আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

ধূপছায়া

১৫৯ দেশভ্রমণ
১৬৩ রসগোল্লা
১৬৯ চাপরাশি ও কেরানি
১৭৭ চিল্কা
১৮২ বাঙালি
১৮৫ সুকুমার রায়
১৮৯ ভাষার জমা-খরচ

www.pathagar.com

দর্শনচর্চা ১৯২
লেসে ফ্যের ১৯৫
মার্কিনি তাত ১৯৮
বাঙালি মেনু ২০০
রন্ধন-যজ্ঞ ২০৩
'বাঁশবনে—' ২০৫
বাংলার গুণ না জর্মন গুণী ২১০
শিক্ষা-প্রসঙ্গে ২১২
পোলেমিক ২১৫
চরিত্র-বিচার ২১৮
দেয়ালি ২২০
গানের কথা : ভারত ও কাবুল ২২১
উনো, হিন্দি, ক্রিকেট ২২৩
বুদ্ধং শরণং ২২৬
অ্যার ট্রাভেল ২২৯
ভাষা ও জনসংযোগ ২৩৬
ইংরেজি বনাম মাতৃভাষা ২৩৯

টুকিটাকি

দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায়? ২৪৮
খেলাচ্ছলে ২৪৮
পিকনিকিয়া ২৫১
সাহিত্যিকের মাতৃভাষা ২৫১
আসা-যাওয়া ২৫২
দেহলি-প্রান্ত ২৫৪

চতুরঙ্গ

২৫৯ রবি-পুরাণ
২৬২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
২৭৩ পুষ্পধনু
২৭৫ মরহুম মৌলানা
২৭৯ নস্‌রুদ্দিন খোজা (হোকা)
২৮৭ নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম
২৯৯ ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)
৩০৪ মাম্‌দোর পুনর্জন্ম
৩১১ দিল্লি স্থাপত্য
৩২০ বেজো না চরণে চরণে
৩২৪ ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ
৩২৯ গাঁজা
৩৩৬ হরিনাথ দে'র স্মরণে
৩৪১ অনুকরণ না হনুকরণ
৩৪৫ ফরাসি-বাঙলা
৩৫২ চার্লি চ্যাপলিন
৩৫৭ ফিল্মের ভাষা
৩৬০ ক্রন্দসী
৩৬৫ ছুছুন্দর কা সির্‌পর চামেলি কা তেল
৩৬৮ আর্ট না অ্যাকসিডেন্ট
৩৭১ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

www.pathagar.com

সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্ম : ১৯০৪ - মৃত্যু : ১৯৭৪)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ময়ূরকণ্ঠী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মমাগ্রজ সুসাহিত্যিক
সৈয়দ মুস্তাফা আলী সাহেবকে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভেতর সাহিত্যিক হিসেবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যেরকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি, তেমনি বিধিদত্ত রসবোধ তাঁর আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হালকা কলমে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ-গল্প, আড্ডা মজলিস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার পর আর আমার কিছু লিখবার মতো থাকতে পারে না। কারণ বিশীদা যে মজলিসে সবচেয়ে উঁচু আসন পেয়েছেন সে মজলিসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসেবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনও স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।

কিন্তু বহু শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনও কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে, তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ। এই ছেলেধরার বাজারে কিছু বলা যায় না— গুরুদেবকে স্মরণ করার সময় আমরা সবাই একবয়সী ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজকের শিশুবিভাগের কনিষ্ঠতম আশ্রমিক– কাজেই বিশীদা'র যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মা-'বসুমতী'র কাছে এটা গচ্ছিত রাখছি।

ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালির গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়েছি। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে কিন্তু এ স্থলে ছাত্রের কর্তব্য সমাধান করার জন্য বলি, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, কায়রো বহু জায়গায় বহু গুরুকে আমি বিদ্যাদান করতে দেখেছি কিন্তু এ গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে কারওরই তুলনা হয় না। কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও মনের পটের উপর রবীন্দ্রনাথের আঁকা কিটসের 'অটামে'র ছবি তো মুছে গেল না। কিটস হেমন্তের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে যে আরও বেশি উজ্জ্বল করা যায়, একথা তো কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে "You do not paint a lily"— তাই মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়, রবীন্দ্রনাথ কিটসের হেমন্ত-লিলিকে মধুরতর প্রিয়তর করতেন কোন জাদুমন্ত্রের জোরে?

তুলনা না দিয়ে কথাটা বোঝাবার উপায় নেই। ইংরেজি কবিতা পড়ার সময় আমাদের সবসময় মনে হয়, ইংরেজি কবিতা যেন রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী; তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ

www.pathagar.com

হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি, কিন্তু তার বাক্য-হাস্য-নৃত্য রস থেকে বঞ্চিত থাকি বলে অভাবটি এতই মর্মন্তুদ হয় যে, শ্যামলী স্থূলাঙ্গী জাগ্রতা গৌড়জার সঙ্গসুখ তখন অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি তার সোনার কাঠির পরশ দিয়ে কিটসের হৈমন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের বিদ্যালয়ের নিভৃত কোণে। গুরুদেব কিটসের এক ছত্র কবিতা পড়েন, নিদ্রিতা সুন্দরীকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ভাষার সোনার কাঠি ছোঁয়ান, সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী নয়ন মেলে তাকায়। গুরুদেবের কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুদেব তাঁর বীণার তারে করাঙ্গুলিস্পর্শে ঝঙ্কার তোলেন, সুন্দরী গান গেয়ে ওঠে।

কিটস, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্রজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তা হলে বাঙালি তো তার রস পেতই, বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত। কিন্তু জানি ভানুমতীর ছবি ফটোগ্রাফে ওঠে না, গুরুদেবের এ বর্ণনা কারও কলম-কালিতে ধরা দেয় না। যেটুকু দিয়েছে সেটুকু আছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারে।

তার পর একদিন বেলজিয়মে থাকার সময় বিলেত যাবার দরকার হল। ইচ্ছে করেই যাওয়াটা পিছিয়ে দিলুম— তখন বসন্ত ঋতু। কিটসের 'হৈমন্তী'র সঙ্গে দেখা হতে অনেক বাকি। সায়েব-মেমসাবেরা অসময়ে দেখা করেন না।

বিলিতি হৈমন্তীকে দেখে মুগ্ধ হলুম, অস্বীকার করব না। কিটসের ফিরিস্তি মিলিয়ে 'নখশির' বর্ণনা টায়-টায় মিলে গেল, কিন্তু গুরুদেবের হৈমন্তীর সন্ধান পেলুম না। কিটসের সুন্দরীকে বারবার তাকিয়ে দেখি আর মনে হয়, আগের দিনের বেলাভূমিতে কুড়িয়ে পাওয়া ঝিনুক ঘরের ভিতরে এসে ম্লান হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় সে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল, যার মাঝখানে এই শক্তিই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেছিল, গৃহকোণের দৈনন্দিনতার মাঝখানে সে যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, 'তুলসীর মূলে' যে 'সুবর্ণ দেউটি' দশদিক উজ্জ্বল করেছিল সেই দেউটি দেবপদস্পর্শ-লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে ম্লানমুখে আপন দৈন্য প্রকাশ করতে লাগল।

তার পর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার পেলুম, জর্মনির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন— জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।

মারবুর্গের সে জনসভার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। আজ শুধু বলি, গুরুদেব সেদিন যখন 'ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশি' বাজালেন তখন মারবুর্গের পরবে জমায়েত তাবৎ জর্মনির 'গুণী-জ্ঞানী মানী তত্ত্ববিদের সেরারা' মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন, একটি বারের মতো সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোনও এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন— ডাইনে-বাঁয়ে তার শব্দটুকুও শুনতে পাইনি।

www.pathagar.com

আমার মনে হয়েছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব সেই বিপুল কলেবর অট্টালিকা বল্মীকস্তূপে নিরুদ্ধ নীরন্ধ্র হয়ে গিয়েছে।

সেই জনতার মাঝখানেই গুরুদেবকে প্রণাম করলুম— জানিনে তো কখন আবার দেখা হবে। এত সব গুণীজ্ঞানীর মাঝখানে আমার জন্য কি আর বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম গুরুদেবেরই কবিতা :

> আমার গুরুর পায়ের তলে
> শুধুই কি রে মানিক জ্বলে?
> চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলারে।
> আমার গুরুর আসন কাছে
> সুবোধ ছেলে কজন আছে
> অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
> তাই আমি তাঁর চেলারে।

বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্রশংসা-প্রশস্তি পাওয়ার পরও, আমি যখন প্রণাম করে দাঁড়ালুম, তিনি মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, 'কীরকম হল?'

আমি কোনও উত্তর দিইনি।

শহরের উজির-নাজির-কোটালরা গুরুদেবকে তাঁর হোটেলে পৌঁছে দিলেন। আমি পরে সেখানে গিয়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কাছ থেকেই বিদায় নিতে চাইলুম। তিনি বললেন, 'সে কী কথা, দেখা করে যান।'

আমি দেখা হবে শুনে খুশি হয়ে বললুম, 'তা হলে আপনি গিয়ে বলুন।'

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বললেন, 'সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক্ করুন।

গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসিমুখে বসতে বললেন। তার পর ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?'

আমি মাথা নিচু করে চুপ করে রইলুম।

কিছু কথাবার্তা হল আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে। যখন উঠলুম তখন বললেন, 'অমিয়কে ডেকে দে তো।'

চক্রবর্তী এলেন। গুরুদেব বললেন, 'অমিয়, একে ভালো করে খাইয়ে দাও।'

জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রাতেসের চোখে যখন মরণের ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যেরা কানের কাছে চিৎকার করে শুধালেন, 'গুরুদেব, কোনও শেষ আদেশ আছে?'

তখন সোক্রাতেস বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরশুদিন যে মুরগিটা খেয়েছিলুম তার দাম দেওয়া হয়নি। দিয়ে দিয়ো।' এই সোক্রাতেসের শেষ কথা।

সবদিকে যাঁর দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তা-ও মৃত্যুর বহু পূর্বে ॥

www.pathagar.com

নন্দলালের দেওয়াল-ছবি

তুর্কি-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুত্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কিবাজি কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রানির সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যচ্ছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ রূপ
— বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।

গানের আসর পারা
— সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ-বাঁশি
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।

এ যেন সুন্দরী—
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলঙ্কারের জাল;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।
চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলঙ্কার
শুনি যেন বলে চিত্রকার—
'তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহঙ্কার।'

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে।[১]

---

১. শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের 'কীর্তি মন্দিরে' রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র।

www.pathagar.com

বড় দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পুব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারাই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎলেহেম— যেখানে প্রভু যিশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরি আর তাঁর বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পাননি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার অশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরি জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যিশুকে।

দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন— প্রভু যিশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহুকবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়দাতা।

* * *

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাইনি।

ক'শ নারী-পুরুষ ছিলেন আদমশুমারি করে দেখিনি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্‌নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন— তার দু দিকে সিল্কের চকচকে দু ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মতো শক্ত শার্ট, কোণভাঙা কলার— ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েস্‌ট্‌ কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর— যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো— হাতে গেলাস।

কিংবা শার্ক স্কিনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্‌স্‌ কোট'— সিক্‌স-সিলিন্ডারি অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কারও বোতাম হাইদ্রাবাদি চৌকো, কারও বা বিদরী গোল— কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহি মোহরের।— হাতে গেলাস।

তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালি নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট করা শান্তিপুরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মিরি শালে সোনালি জরির কাজ। হীরের আংটি-বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্প— হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'-ও দু-একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর— হাতে? না, হাতে কিছু না। আমি আবার সবসময় ভালো করে দেখতে পাইনে— বয়স হয়েছে।

কিন্তু এসব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা-কালো ভিন্ন অন্য রং নিয়ে খেলা দেখবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কী ভেল্কিই-বা খেলবে?

www.pathagar.com

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপি দিয়ে 'ময়ূরকণ্ঠী-বাঙ্গালোরি' শাড়ি! জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদবাকি দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারব না। বোধহয় নেই— না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসিরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দোকোল্‌তে'? বুক-পিঠ-কাটা মেমসায়েবদের ইভ্‌নিং ফ্রক এর কাছে লজ্জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি— বাঁ হাতে কবজের মতো বাঁধা হোমিওপ্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?' বলেই লজ্জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু 'লাল' হলেন না, কারণ রুজ আগেভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই, আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্তরাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রং মেলানো রয়েছে রক্তরাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ি ভদ্রলোকরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ি শাড়ি। টকটকে লাল রঙ— ছোট ছোট বোট্টাদার। বেনারসি র‍্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ— জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকালবেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এরকম শাড়ি দেখতে পাই— মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ি নন। চুলটি গুছিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটুখানি ঢেউখেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল— গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলি শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ি ব্লাউজের কন্‌ট্রাস্‌ট্ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কন্‌ট্রাস্‌ট্-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নিচে ত্রয়োদশ শতাব্দী— উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালি মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনও আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কী করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখিরা রোস্ট হয়ে উর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ জনা, মুরগি-মুসল্লম, অগুনতি, সাদা কেঁচোর মতো কিলবিল করছে ইতালির মাক্করোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আণ্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোর ব্রিটিশ মায়োনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মুলোর আলপনা, গরম মশলার ক্বাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন

www.pathagar.com

রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মতো আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে, পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসেজের ডজন ডজন কুতুবমিনার।

কন্ট্রাস্ট্, কন্ট্রাস্ট্, সবই কন্ট্রাস্ট্।

প্রভু যিশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে— আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে!!

পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'নামিনু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।'

এরপর পাণ্ডাদের সহৃদয় অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মতো সাহস আমাদের মতো অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন 'মিয়াকি তোড়ি' অর্থাৎ মিয়া তানসেন রচিত তোড়ি রাগিণী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দু হাত দিয়ে দুটি কান ছুঁয়ে নেন। ভাবখানা এই— 'হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগেভাগেই মাপ চাইছি।' সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত— মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে।' কালিদাসও বলেছেন— সংস্কৃতটা মনে নেই— 'বজ্রমণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।'

শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনও জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমিঢ়ের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনও পার্থক্য নেই— যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনও প্রয়োজন হত না সে বিষয়ে আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি। উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে কথা সবাই জানেন; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ করেছেন যে, শিখরা তীর্থ করবার জন্য দিব্য পাকিস্তান যাচ্ছেন, পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমিঢ় আসছেন, পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে যাচ্ছেন? পাণ্ডার ব্যবসা দুনিয়ার প্রাচীনতম ব্যবসা— ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস-লিগের কর্ম নয়।

সে কথা যাক। আমি বলছিলুম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল পাণ্ডা জগতের অশোক স্তম্ভ এবং কুতুবমিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙল।

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, 'শিরনি' বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান এই তিন

www.pathagar.com

ধর্মের ত্রিবেণি জেরুজালেম। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন.ও. ওইখানেই। সেখান থেকে গেলুম বেৎলেহেম— প্রভু যিশুর জন্মস্থান।

বড়দিনের কয়েকদিন পরে গিয়েছিলুম। জেরুজালেম-বেৎলেহেমের বাস সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি এঁকে কর্তারা ভালোই করেছেন— বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইডবুক— পাণ্ডার 'এরজাৎস'— কাঁধে ক্যামেরা— হাতে লাঠি। আধঘণ্টার ভিতর বেৎলেহেম গ্রামে নামলুম।

ভেবেছিলুম, দেখতে পাব, বাইবেল বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরাজীর্ণ আস্তাবল— যেখানে যিশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কপ্পুর। সবকিছু ভেঙেচুরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করিনে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মোজায়িক বা পাথরে খচা আলপনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো রসসৃষ্টি সেন্ট সোফিয়া, সেন্ট পল কোথাও আমি দেখিনি। সে কথা আরেক দিন হবে।

গাইডবুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনও আছে সেই আস্তাবল— যেখানে প্রভু যিশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরি চুল, মান-মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া গোঁপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মতো টুপি, হাতে মালা— তার এক-একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মতো। পাদ্রি-পাণ্ডার অর্ধ-নারীশ্বর।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শুধাল, 'হোয়াট ল্যান্‌গুইজ্? কেল লাঁগ? বেলশে শপ্রাখে? লিসান এ?'— প্রায় বারোটা ভাষায় জিগ্যেস করল আমি কোন্ ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললুম, 'হিন্দুস্থানি।'

বলল, 'দস্ পিয়াস্তর।' অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও।

'দস্' ছাড়া অন্য কোনও হিন্দুস্থানি সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই-বা কী কম? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, 'প্রভু যিশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয়?'

বলল, 'হ্যাঁ।'

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আমি ভারতীয়, খ্রিস্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরিব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোব্বাটি দিয়ে দেবে— আর তাঁরই জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা?'

শুধু যে চোরা-ই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম— পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

গাইডবুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্রিক অর্থডক্স্ প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে— গির্জাটি ঘুরে সেদিকে পৌঁছতে হয়।

এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা— যেন পয়লাটার যমজ। বেশভূষায় ঈষৎ পার্থক্য।

পুনরপি সেই সদালাপ। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' অম্মো না-ছোড়-বান্দা।

www.pathagar.com

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়তো অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, 'তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু; এত পয়সা খর্চা করে পৌঁছলে মোকামে— এখন দু পয়সার চাবুক কিনতে চাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর?' তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি।

এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।

বললুম, 'দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কীরকম প্রভু যিশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও কমুনিটি আছে।'

বলে লাঠিটা বার-তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত ঘোঁত করে বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

পাণ্ডা ডাকল, 'শোনো।'

আমি বললুম, 'হুঁ।'

'তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরের জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে?'

'আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাইনে।'

খ্যাঁস খ্যাঁস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তার পর ফিস্ ফিস্ করে কানের কাছে মুখ— বোঁটকা রসুনের গন্ধ— এনে বলল, 'যদি প্রতিজ্ঞা কর কাউকে বলবে না ফ্রি ঢুকতে দিয়েছি, তবে— '

আমি বললুম, 'আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে গিয়ে বলতে পারব তো?'

তখন হার মানল। আমরা বহু লঙ্কা জয় করেছি!!

গীতা-রহস্য

গীতার মতো ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সবসময়েই কিছু না-কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম পথপ্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যেরকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোর নাস্তিকও গীতাপাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয় নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছিনে, দেশবিদেশে গীতাভক্তদের সাথে একসঙ্গে বসবাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।

তাই গীতার টীকা রচনা করা কঠিনও বটে, সহজও বটে। সর্বধর্ম সর্বমার্গের সমন্বয় যে গ্রন্থে আছে তার টীকা লেখার মতো জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অল্প লোকেরই থাকার কথা; আর ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু না-কিছু সমর্থন গীতাতে পায় তখন তার পক্ষে একমাত্র গীতার টীকা লেখাই সম্ভবপর হয়— একমাত্র গীতাই তখন সে ব্যক্তির সামান্য অভিজ্ঞতা বিশ্বজনের সম্মুখে রাখবার মতো সাহসে প্রলোভিত করতে পারে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য' প্রথম শ্রেণির টীকা। 'গীতারহস্যে' লোকমান্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিমতও আছে বটে কিন্তু এ গ্রন্থের প্রধান গুণ,

www.pathagar.com

তার তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। এই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং এই শতকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়,— কারণ তার পূর্বে সর্বধর্মে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বভাষা আয়ত্ত করতে হত, এবং সে কর্ম অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। ঊনবিংশ শতকে নানা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল এবং বিংশ শতকে সমস্ত উপাদান এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে গেল যে, তখনই প্রথম সম্ভবপর হল তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গীতা বিচার করা।

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশ-বিদেশে বহুতর সাধক, গুণীজ্ঞানী গীতাকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মালোচনা করেছেন। বাংলা-ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই গীতা সম্বন্ধে এত পুস্তক জমে উঠেছে যে, তাই পড়ে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা, ফরাসি এবং বিশেষ করে জর্মনে গীতা সম্বন্ধে আমরা বহু উত্তম গ্রন্থ দেখেছি।

তৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য লোকমান্যের গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ। এ পুস্তক লোকমান্য মান্ডালে জেলে বসে মারাঠি ভাষায় লেখেন।

'অনুবাদ সাহিত্য' প্রবন্ধ লেখার সময় আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলুম। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুস্তকখানির অনবদ্য অনুবাদ বাংলা ভাষায় করে দিয়ে গিয়ে গৌড়জনের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে গিয়েছেন। এ অনুবাদের সঙ্গে করুণ রসও মিশ্রিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,— 'লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার প্রণীত 'গীতা-রহস্য' বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ কামনায়, বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে,— অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিন পরে উহা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিয়া আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হইয়াছি।'

তার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা বলেছেন, পাঠকের দৃষ্টি আমি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই :

'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল— এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা টিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।'

যতবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদখানা হাতে নিই ততবারই আমার মন গভীর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদ ৮৭২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। এই অনুবাদকর্ম প্রায় ষাট বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরম্ভ করেন। যৌবনে তিনি বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মহারাষ্ট্রে ছিলেন তখন মারাঠি শিখেছিলেন এবং ততদিনে নিশ্চয়ই সে ভাষার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলেন— রাঁচিতে বসবাস করে দূর মারাঠা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক কেন, কোনও প্রকারের যোগ রাখাই কঠিন। তাই ধরে নিচ্ছি, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নতুন করে মারাঠি শিখে প্রায় তিন লক্ষ মারাঠি শব্দ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, মাসের পর মাস *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় তার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেছেন, এবং সর্বশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।'

www.pathagar.com

অর্থাৎ প্রুফ দেখার ভারও আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরেই ছিল।

তাই বিস্ময় মানি যে, এই হিমালয় উত্তোলন করার পর যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন লোকমান্য ইহলোকে নেই তখন তিনি সেই শোক প্রকাশ করলেন, 'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল' বলে। এ শোক, এ আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে কি ভাষা, বর্ণনশৈলী, ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ছিল না? *মৃচ্ছকটিকা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নীলপাখি,* অনুবাদ করার পরও কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে করুণ রস প্রকাশ করার ক্ষমতা অলব্ধ ছিল?

তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্বরস মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অভূতপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কী দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্যবিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে। তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চতম স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায়নি— লোকমান্যকে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেননি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গাম্ভীর্য এবং শান্তরসে সমাহত হয়ে।

কিন্তু এসব কথা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা বাঙালি যেন এ অনুবাদখানা পড়ে, কারণ লোকমান্য রচিত 'গীতা-রহস্যে'র ইংরেজি অনুবাদখানা অতি নিকৃষ্ট। যেমন তার ভাষা খারাপ, তেমনি মূলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য, কণামাত্র গাম্ভীর্য সে অনুবাদে স্থান পায়নি। অথচ বাংলা অনুবাদে, আবার জোর দিয়ে বলি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদে, মূলের কিছুমাত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়নি, মূল মারাঠি পড়ে মহারাষ্ট্রভাষী যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, অনুবাদ পড়ে বাঙালিও সেই রসে নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু অতিশয় শোকের কথা— এ অনুবাদ গত আট বৎসর ধরে বাজারে আর পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর এ পুস্তকের আর পুনর্মুদ্রণ হয়নি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোনও উদ্যোগী বাঙালি প্রকাশক যেন পুনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে এ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করেন।

আমার কাছে যে অনুবাদখানি রয়েছে তাতে লেখা আছে :

> All rights reserved by
> Messers. R.B. Tilak and S.B. Tilak,
> 568 Narayan Peth, Poona City.[১]

বন

পশ্চিম জর্মনির রাজধানী বনবাসী হতে চলেছেন শুনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ 'বনে'র উচ্চারণ 'ঘরে'র মতো। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী 'ন' অথবা 'ণ' পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে 'অ'-কারটি 'ও'-কারে পরিণত হয়। যথা— মন, বন,

১. সম্প্রতি খবর এসেছে, 'বিশ্বভারতী'তে পুস্তকখানি পাওয়া যাচ্ছে।

www.pathagar.com

উচ্চারিত হয় মোন, বোন, ইত্যাদি রূপে। কিন্তু এই জর্মন Bonn শব্দের উচ্চারণে 'ব'য়ের স্বরবর্ণটি 'ঘরে'র অ-কারের মতো উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জর্মনি আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালন করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে; জর্মনিতে ঠিক তেমনি আইন, কোনও শহরের লোকসংখ্যা যদি এক লক্ষে পৌঁছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাঁকে তখন 'গ্রোস-স্টাট্' বা বিরাট নগররূপে আদর-কদর করে বার্লিন ম্যুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন-ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনির রাজধানী, তাঁরা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।

কিন্তু এই কেঁদে ককিয়ে টায়ে-টায়ে এক-লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি। বনের হাড়হদ্দ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোকসংখ্যা কী কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিল সে-ও আমার অজানা নয়। এক-লক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারির সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল— যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত নয়, দুয়ের মাঝখানে বিস্তর যব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।

আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন-ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াইয়ে জর্মনি রুশের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা— প্যারিস ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মতো রাজধানীর বাচ্চা নিয়ে কখনও লিয়োঁ কখনও ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়ম যেরকম প্রতিবার জর্মনিকে ঠেকাতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে, এবার জর্মনি রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে। বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।

কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এস সহৃদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এপারে বন, ওপারে 'সিবেন গেবির্গে' অর্থাৎ সপ্তশ্রীলাচল। মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বুকের উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ-আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকেবেঁকে গিয়েছে। দু দিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মতো ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে— মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।

আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম। বার্লিনের মতো চওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়িও নেই। মোটরের গাঁক-গাঁকও নেই। আছে কাশী-আগ্রার মতো ছোট ছোট গলিঘুঁচি, ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি-ঘর-দোর, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধজাগ্রত রেস্তোরাঁ। আর বিশাল বিরাট বিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবনবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনিতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য

www.pathagar.com

কির্ফেল এখনও সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা ইংরেজিতে এখনও হয়নি। কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ *উপনিষদ* নিয়ে বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন। তাঁর সুহৃদ্ রুবেনসের শরীরে ঈষৎ ইহুদি রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনি ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কির আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন— প্রামাণিক পুস্তক লেখবার বাসনায়।[১]

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার ওপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো-বার্গেন্ডির সঙ্গে সে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

আমি যখন প্রথমদিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভুরি-ভুরি খাঁটি তত্ত্বকথা বলার পর বললেন :

'এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনও শিষ্যেরই বদনাম হয়নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই-বা কেন করতে যাবেন?'

রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়ল ॥

'নেভা'র রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়— তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন— কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়— ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি, তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদরের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসলিল ভঙ্গিতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্বসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে— ইট ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানি ঘরের ছেলে— তলস্তয়েরই মতো। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনও জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের একপ্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাংলো— চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাংলোয় গিয়ে উঠলেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস,

১. হালে খবর পেয়েছি তিনি রুশদেশে গিয়ে সেখান থেকে *রামায়ণের* প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

বেদনাতুর। তার ওপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে— জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গেনিয়েফ মাথা নিচু করে, দু হাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানি ঘরের ছেলে তাদের কারও দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কী হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনও জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রোববারে জেলে-তরুণীরা গির্জায় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে— বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলেনি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেননি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙমাখানো গয়না-চাপানো লোকদেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্রি তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলেগ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবিহৃদয় অতিসহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনোফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরি কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোস্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারেনি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন— নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়তো তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জামেশানো গর্ব যদি আরও ভালো করে জানতে পারতুম— তুর্গেনিয়েফ যদি আরও একটুখানি ভালো করে তাঁর হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করেনি। ইভানকে পেয়ে সে যে লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে— কোনও জমিদারের ছেলে নাকি ওরকম ধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনিদের কখনও নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কীরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তার বর্ণনা দেননি— তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দু জনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়তো মৃদু আপত্তি করত— কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনও ইচ্ছায় সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

www.pathagar.com

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছ কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব— শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনও বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়— বিধাতাপুরুষেরই মতো।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কী নিয়ে আসব?'

কোনও উত্তর নেই।

'বল কী নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না— শুধু তুমি ফিরে এস।'

'কিছু না? সে কী কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সবকিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে দামি জিনিস আনতে চাই। বল কী আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোনও-একটা কিছু-একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বলল, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এস।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই, তুমি তো কখনও পাউডার-সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাওনি— তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।'

নিরুত্তর।

'বল।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তার পর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এস।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সবসময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারিনে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেননি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেননি ॥

www.pathagar.com

বর্বর জর্মন

ন্যুরন্‌বের্গের মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তরিবত করে তামাম দুনিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওহ্, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছে! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হলে তোমাদের দমটি পর্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।

বিলেতি কাগজগুলো যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধু মার দিয়েই খুশি হবে না, হরেকরকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সেসব কথা সবাইকে ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহাই সুখ; তার পর দেশটার কলকব্জা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভুঁড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের করে তাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।

কিন্তু এ দেশের ইংরেজি কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিলি তো বাবা যুদ্ধের বাজারে বেশ, না হয় স্কচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিস, না হয় এসপেরেগাস আরটিচোক খেতে পাসনি, না হয় তুলতুলে ফ্ল্যানেল আর নানারকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাসনি বলে সর্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিলি, তাই বলে যা বুঝিসনে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেল্লাচেল্লি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিস, সেকথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দু দিন ফুর্তি কর, যে জায়গা নাগাল পাসনে, সেখানে চুলকোতে যাসনে। কিন্তু শোনে কে! সেই জিগির— জর্মন বর্বর, 'বশ', 'হান'।

পরশুদিন জর্মন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম, পুরনো বইয়ের দোকানে— একখানা কেতাব, আজকালকার জলের চেয়েও সস্তা দরে কিনলাম। তার নামধাম—

Bengalische Erzaehler / Der sieg der seele / aus dem indisghen / ins deutsch uebertagen / von / Reinhardt Wagner /

অর্থাৎ 'বাঙালি কথক।' (Erzaehler ধাতুর অর্থ কাহিনী বলা) 'আত্মার জয়, ভারতীয় ভাষা হইতে জর্মনে রাইনহার্ট ভাগনার কর্তৃক অনূদিত।'

চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালি লাইনে একটি অজন্তা ঢঙের সুন্দরী বাঁশি বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এড্‌মুন্‌ড্ শেফার।

কেতাবখানা যত্রতত্র বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না— এস্তেহার রয়েছে! 'ব্যুশারফ্রয়েন্ডে' সংঘের সভ্যরা কিনতে পাবেন। বর্বর জর্মন বটতলা ছাপিয়ে, পেঙ্গুইন বেচে পয়সা করতে চায় না, তার বিশ্বাস— দেশে যথেষ্ট সত্যিকারের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হল না, চুকে গেল— বাংলা কথা।

'বাংলা কথা' ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন। প্রথম আলাপে জিগ্যেস করেছিলাম, মহাশয় কোন ভাষার অধ্যাপক?

বাংলার।

বাংলার? বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে?

আজ্ঞে।

ছাত্র কটি?

www.pathagar.com

গেল পাঁচ বছরের হিসাব নিলে গড়পড়তা ৩/৫।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে ফ্রি-ক্লাসে নিদেনপক্ষে দেড়শটা বাঁদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল— ৩০০ আপন ওয়ান প্রফেসারের। বললাম, ৩/৫ একটু কম নয়?

ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েননি— The rose which is single need not envy the thorns which are many?

উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা রেকর্ডখানি লাগালেন। ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বললাম, কুল্লে ৩/৫-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসার। জর্মনরা বর্বর।

অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তর্জমা করে দিলুম।

'সঙ্কলনটি আরম্ভ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলার tschota galpa (ছোট গল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে একরকমের ছোটখাটো উপন্যাস বলা যেতে পারে; শুধু নায়কনায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভিতরকার প্রাণবস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়, সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটিমাত্র মূল সুরের চতুর্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতিরসে ভেজানো। আবার এ-ও দেখা যায়, ভারতবাসীর ধর্ম তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাঁধা যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যা সমাধান এমন সব কারণের ওপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমে নভেলে থাকে না। আশা-নিরাশার দোলা-খাওয়া কাতর হৃদয় এইসব গল্পে কখনও-বা ধর্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, কখনও-বা তার ছোট গণ্ডির ভিতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক হৃদয়ের কঠোর দুঃখ; চরম শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আন্দ্রেয়াস হয়েসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, "মানুষের আত্মার ভাঁজে ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।"

'ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেয়ালে বেশ্যা হয়নি। গ্যেটের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেননি, এঁদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।

'সঙ্কলনটি সুখ-দুঃখের গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে; হাস্যরসের গল্প নিতান্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে; দুঃখ-যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই একরকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণ রসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্যরস আলাদা করে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হল; হয়তো পশ্চিম দেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।

'বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সবচেয়ে ভালো রচনা বাদ দেওয়া অন্যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর 'লিপিকা' থেকে তাই কয়েকটি সবচেয়ে ভালো লিখন দেওয়া হল; এগুলোকে ছোট ছোট গল্প বলা ভুল হবে।[১] লেখাগুলো সহজেই দু ভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া বলে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ করে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মতো কিসের যেন প্রতীক, কেমন

১. রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো কাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না।

www.pathagar.com

যেন অস্বচ্ছ অর্ধ-অবগুণ্ঠিত অনাদি অনন্তের আস্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্তর্নিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে যায়।

সর্বশেষে যাঁরা তাঁদের লেখার অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে যাঁরা এই সঙ্কলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করাতে সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে কৃতজ্ঞ— হের দ.প. রায়চৌধুরী, ডি.ফিল. (গ্যোটিঙেন), ইঞ্জিনিয়র বিদ্যার্থী অ. ভাদুড়ী; য. চ. হুই, এম.এস-সি.; য. ভ. বসু, ডি. ফিল. (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাধারী স. চ. ভট্টাচার্য।[২] সুরসিক, বহু ভাষার সুপণ্ডিত ল. ভ. রামস্বামী আইয়ার[৩] এম.এ.বি.এল. বেশির ভাগ মূল লেখাগুলো পাঠিয়েছেন ও সঙ্কলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।'

অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা যায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শুধু একটি বক্তব্য যে অবতরণিকার ভাষ্যটি সরল, যাঁরা মূল জর্মনে কানট-হেগেল এমনকি টমাস মান্‌ও পড়েছেন তারাই জানেন জর্মনে কীরকম আড়াইগজি সব বাক্য হয়। ভাগনারের জর্মন অনেকটা বাংলা ছন্দের— কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মতো। বাক্যগুলো ছোট ছোট; সাদামাটা খাস জর্মন কথার ব্যবহার বেশি, কিন্তু দরকারমতো শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছ্‌পা হননি। জর্মন গুরুচণ্ডালীর সম্বন্ধে বাংলার মতো ভয়ঙ্কর সচেতন নয়। ভাগনার আবার সাধারণ জর্মনের চেয়েও অচেতন।

পাঠকের সবচেয়ে জানার কৌতূহল হবে যে, কার লেখা ভাগনার সাহেব নিয়েছেন। তার ফিরিস্তি দিচ্ছি:—

১. আমার দেশ (কবিতা) : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়[৪] (Schridvidschendralal Raj)
২. সন্ন্যাস; শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিল্বদল)
৩. অঙ্কিত; গোলাপ; চোর; কুসুম; শিউলি : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (সিঁদুর চুপড়ি, মধুপর্ক)
৪. দেবতার ক্রোধ; রত্নপ্রদীপ : শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আল্পনা ও জলছবি)
৫. পদ্মফুল; জন্ম-মৃত্যু শৃঙ্খল (আংশিক অনূদিত) : শ্রীমণীন্দ্র-লাল বসু (মায়াপুরী)
৬. একাকী; প্রেমের প্রথম কলি : শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)
৭. বউ চোর, রসময়ীর রসিকতা : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি)
৮. গলি; পরীর পরিচয়; নূতন পুতুল; ছবি; সুয়োরানীর সাধ; সমাপ্তি; সমাধান; লক্ষ্যের দিকে; সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়; পায়ে চলার পথ; কণ্ঠস্বর; প্রথম শোক; একটি দিবস : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Schrirabindranath Thakur (লিপিকা)
৯. আঁধারে আলো : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

২. D. P. Roy Chowdhury.; A. Bhadhuri.; J.C. Huii. J. Bose; S.C. Bhattacharjya.

৩. ইনি শব্দতাত্ত্বিকদের সুপরিচিত।

৪. জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্বেই ভাগনার 'শ্রী' ব্যবহার করেছেন। বাংলা 'শ' বুঝাতে হলে জর্মনে sch (ইংরাজিতে Schedule-এর sch), 'জ' বুঝাতে হলে dsch,' 'চ' বুঝাতে হলে 'tsch,' 'য়' বুঝাতে হলে 'j' ব্যবহার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১০. পাষাণ হৃদয় : শ্রীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)

এখনই বলে দেওয়া ভালো যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয় ভাগনার ১৯১২-২০-এর সময় বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন ও সে যুগে এঁদের যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনটা ঠিক ভাগনারের হাতে ছিল না। এ দেশ থেকে যেসব বই পাঠানো হয়েছিল, তা থেকে ভালো হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জর্মন কায়দায় 'টেগোর' লেখেননি।

নানা টীকা-টিপ্পনী করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। জর্মন-মন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।

সাধারণ জর্মনের পক্ষে দুর্বোধ্য কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে; যেমন— অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণা, আরতি, আষাঢ় B.A., বেলপাতা, ভৈরবী, রাগিণী, ভর্তৃহরিম ফুলশয্যা, চোরা বাগান, দোয়েল, জয়দেব, যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পয়সা, পানি কৌড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শুভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্ম সমাজ, ইংরেজি, উড়িয়া বামুন।

সবগুলোর মানে, সব কটাই অতি সংক্ষেপ ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল— *মেঘদূত*কে Epos বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামুনরা যে গঙ্গাস্নানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোঁটা-তিলক কেটে দেন সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে রান্নার নামে কী বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B.A. উপাধি ভাগনার জর্মনদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M.A. যে লাতিন Magister Aritum সেটা বলতে ভোলেননি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জর্মনদের ভক্তি বেড়েছে।

আম-কাঁঠাল, শিউলি-বকুল বহু গল্পে বারবার এসেছে, কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ঘাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেননি। তবে তিনি রজনীগন্ধার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট।

অনুবাদ কীরকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে এই কথাটি বারবার বোঝা যায় যে, দূর বার্লিনে বসে কী গভীর ভালোবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদগুলো করেছেন এবং সেই ভালোবাসাই তাঁকে বাংলার ছোট গল্পের অন্তস্তলে নিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবী কোন সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেটে, কৃত্তিবাস কাশিরাম দাস কে এইসব বিস্তর বায়নাক্কা বরদাস্ত করে জর্মন ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার হৃদিরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।

বর্বর নয় তো কী!!

www.pathagar.com

ফরাসি-জর্মন

গল্প শুনিয়াছি, এক পাগলা মার্কিন নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'হস্তী' সম্বন্ধে যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে তাহাকে এক লক্ষ পৌন্ড্ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে বৃহৎ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিন বিশেষ করিয়া ওই বিষয়টিই নির্বাচন করিবেন কেন?

সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরেজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপিসে ছুট দিল। হরেক সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পক্ষাধিককাল যাইতে-না-যাইতেই সে আসামের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল 'আসামের পার্বত্যাঞ্চলে হস্তী শিকার'।

ফরাসি খবর শুনিয়া ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল। হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকি ভাড়া লইয়া আস্তে আস্তে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতিগুলির দিকে তাকায় আর শার্টের কফে নোট টুকে। তিন মাস পর চটি বই লিখিল 'লামুর পারমি লেজেলেফাঁ অর্থাৎ 'হস্তীদের প্রেমরহস্য'।

জর্মন খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপিসে, না গেল চিড়িয়াখানায়। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম 'আইনে কুর্ৎসে আইনক্যুরুঙ ইন ডাস স্টুডিয়ম ডেস এলোফান্টেন', অর্থাৎ 'হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা'।

গল্পটি প্রাক্-সোভিয়েট যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান, না ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না ঢুকিল লাইব্রেরিতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় 'ধান্যেশ্বরী' জাতীয়) ও ত্রিশ বান্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে খিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, 'ভিয়েদিল লিলি ভি এলেফান্ট?' 'তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ?' অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হস্তী সম্বন্ধে যেসব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অস্বীকার করিতে হয়।

আমেরিকান এইসব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই 'হাতি পুষিল'। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল 'বিগার অ্যান্ড বেটার এলেফেন্টস—হাউ টু গ্রো দেম?' অর্থাৎ 'আরও ভালো ও আরও বৃহৎ হাতি কী করিয়া গজানো যায়।' শুনিয়াছি আরও নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু 'নেটিভ' 'কালা আদমি' বলিয়া তাঁহার পুস্তিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামঞ্জুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে-কলমে বলা হইল যে, যেহেতু ভারতবাসী হস্তীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে!

গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না সত্য, কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-ধলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে বোঝায় জর্মন ও

www.pathagar.com

ফরাসিকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনরা নতমস্তকে স্বীকার করে যে 'কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্পের' অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরেজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনও জিনিস অর্ধপক্ক রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ বৈদগ্ধ্যে পৌঁছাইয়াছিল।

জর্মন যদি কোনও ভারতবাসীকে পায় তবে ইতি-উতি করিয়া যে কোনও প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে, তার পর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামি (তা আপনি যত ফর্সাই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশস্তি গাইবে। তার পর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, 'আপনারা দেশে কী খান, কী পরেন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কান্ট বড় না শঙ্কর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজন্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রামাণিক সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সর্পপূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কি না, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ত্রী থাকে, হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া কেন?'

'কিন্তু হাঁ', বার-তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে, 'হ্যাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যিশুখ্রিস্টের পরে আর হয় নাই। ইংরেজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাঁহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না; আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যই কি গান্ধী গ্যেটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ওই একমাত্র বাইমারই তাঁহার মন কাড়িল?'

ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই ॥

'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়—'

সংবাদপত্রের পাঁজে যারা পোড় খেয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছেন, তারা অত্যন্ত আত্মজনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন, তবে সাংবাদিককে অশ্রুসংবরণ করে সে মহাপুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাঁজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও খেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায়নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে।

বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশবিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মতো কলহাস্যমুখরিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন দ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখিনি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে গম্ভীরভাবে, তেজীয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছলছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ-বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি-তামাসায় নেমে পড়েছেন।

www.pathagar.com

চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক সরোজিনী যে ভাষা-শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোনও সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্রনাথ গল্প বলতে অদ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মতো কখনও শতধা উচ্ছ্বসিত হতেন না। সরোজিনী আপনভোলা হয়ে দেশকালপাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগুজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমত ঢের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনও কাউকে খুব কাছে আসতে দিতেন না, সরোজিনীর মজলিসে কারও পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।

এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনীর ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও তার কাব্যসৃষ্টি তার ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইল কেন?

আমার মনে হয় সরোজিনীকে যারা বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তার মজলিসে আসন পাবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তারাই স্বীকার করবেন বিদেশি মায়ামৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্য না খেয়ে তিনি হর্‌লিকস খেয়েছিলেন বলে তার কবিতা কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি, পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনও বিদেশি সরোজিনীর মতো ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না। এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি দ্বন্দ্বের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শুধু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশি ভাষা তার কবিত্ব প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারত না— মাইকেলের প্রতিভা যেরকম বিদেশি ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল।

তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশি ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টিকর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনও ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব পাকিস্তান উর্দু গ্রহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দি-মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।

পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হইনি। আমি শুধু বলতে চাই, সরোজিনীর কবিতার চেয়ে তার ব্যক্তিত্ব বহুগুণে বৃহত্তর ছিল। তিনি আর পাঁচজন কবির মতো অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকি সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তার কথা, তার হাসি, তার গালগল্প, তার রাগ, আর অসহিষ্ণুতা, তার ধৈর্যচ্যুতি, তার আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সবকিছুই ছিল কবিজনোচিত। রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী, বাক্‌নিপুণা সরোজিনী— এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন তখন সেসব রূপই তার কবিরূপের নিচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি লিখেছিলেন বাংলার কুঁড়েঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কী পুণ্য করেছিল তার বুকে ফুটে উঠল সরোজিনী?

www.pathagar.com

স্বয়ংবর চক্র

ট্রামে বাসে মেয়েদের জন্য আসন ত্যাগ করা ভদ্রতা অথবা অপ্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সর্বত্র আলোচনা শোনা যায় এবং আলোচনা অনেক সময় অত্যধিক উষ্মাবশত মনকষাকষি সৃষ্টি করে। একদল বলেন, মা জননীরা দুর্বল, তাঁহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য; অন্য দল বলেন, মা জননীরা যখন নিতান্তই বাহির হইয়াছে, তখন বাহিরের কষ্টটা যত শীঘ্র সহ্য করিতে শেখেন ততই মঙ্গল।

মেয়েরা যদি শব্দার্থেই ট্রামে-বাসে বাহির হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তাহারা যে শীঘ্রই ব্যাপকার্থে অর্থাৎ নানা প্রকার চাকরি ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে যাহা পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল এদেশে তাহার পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে। সবকিছু ঘটিবে, এমন কথাও বলিতেছি না।

১৯১৪-এর পূর্বে জর্মন পরিবারকর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন, পুত্রকে শিক্ষাদানের গ্যারান্টি দিতে আমি প্রস্তুত, কন্যাকে বর দানের। দেশের অবস্থা সচ্ছল ছিল; যুবকেরা অনায়াসে অর্থোপার্জন করিতে পারিত বলিয়াই যৌবনেই কিশোরীকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিবার পূর্বেই কিশোরীদের বিবাহ হইয়া যাইত; তাহারা বড় জোর আবিটুর বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইত।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে দেশের প্রায় সকল যুবককেই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইল। মেয়েদের উপর ভার পড়িল খেত-খামার করিবার, কারখানা, দোকান আপিস চালাইবার, ইস্কুলে পড়াইবার, ট্রাম, ট্রেন, চালু রাখিবার। জর্মনির মতো প্রগতিশীল দেশেও মেয়েরা স্বেচ্ছায় হেঁসেল ছাড়ে নাই, নাচিতে-কুঁদিতে বাহির হয় নাই। সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল, হোটেলের আগুন শতগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

যুদ্ধের পর যুবকেরা ফিরিয়া দেখে, মেয়েরা তাহাদের আসনে বসিয়া আছে। বেশির ভাগ মেয়েরা আসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, যদি উপার্জনক্ষম বর পাইয়া ঘরসংসার পাতিবার ভরসা তাহাদিগকে কেউ দিতে পারিত। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? জর্মনিতে তখন পুরুষের অভাব। তদুপরি ইংরেজ-ফরাসি স্থির করিয়াছে জর্মনিকে কাঁচামাল দেওয়া বন্ধ করিয়া তাহার কারবার রুদ্ধশ্বাস করিবে; জর্মনির পুঁজির অভাব ছিল তো বটেই।

তখন এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হইল। মেয়েরা চাকরি ছাড়ে না, বর পাইবার আশা দুরাশা বলিয়া চাকরি ছাড়িলে খাইবে কী, পিতা হৃতসর্বস্ব, ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত অথবা বেকার। বহু যুবক বেকার, কারণ মেয়েরা তাহাদের আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপার্জনক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহ করিতে অক্ষম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সমস্যাটি জটিল নয়। যুবকেরা পত্নীর উপার্জনে সন্তুষ্ট হইলেই তো পারে। কিন্তু সেখানে পুরুষের দম্ভ যুবকের আত্মসম্মানকে আঘাত করে। পত্নীর উপার্জনের ওপর নির্ভর করিয়া পুরুষ জীবনযাপন করাকে কাপুরুষতা মনে করে। মেনীমুখো, ঘরজামাই হইতে সহজে কেহ রাজি হয় না; বিদেশে না, এদেশেও না। ইংলন্ডে তো আরও বিপদ। বিবাহ করা মাত্র যুবতীকে পদত্যাগ করিতে হইত— স্বামী উপার্জনক্ষম হউন আর নাই হউন। (রেমার্কের 'ডের বেকৎসুক্'— দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

যত দিন যাইতে লাগিল গৃহকর্তারা ততই দেখিতে পাইলেন যে, 'মেয়েকে বর দিব'— ভালোই হউক আর মন্দই হউক— এ গ্যারান্টি আর জোর করিয়া দেওয়া যায় না। কাজেই প্রশ্ন উঠিল, পিতার মৃত্যুর পর কন্যা করিবে কী? সে তো ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাড়িতে বসিয়া অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করিয়া বসিল। এদিকে-ওদিকে তাকাইতেও আরম্ভ করিয়াছে। না হয় তাহাকে কলেজেই পাঠাও; একটা কিছু লইয়া থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত যদি সেখানে কোনও ছোকরাকে পাকড়াও না-ও করিতে পারে তবু তো লেখাপড়া শিখিবে, তাহারি জোরে চাকরি জুটাইয়া লইবে।

আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৯২৪–৩২ সালে যেসব মেয়েরা কলেজে যাইত তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী হইয়া, কারণ বারে বারে দেখিয়াছি ইহারা উপার্জনক্ষম বর পাওয়া মাত্রই 'উচ্চশিক্ষাকে' ভালো করিয়া নমস্কার না করিয়াই অর্থাৎ কলেজ-আপিসে রক্ষিত সার্টিফিকেট মেডেল না লইয়াই— ছুটিত গির্জার দিকে। আরেকটি বস্তু লক্ষ করিবার মতো ছিল— তাহা সভয়ে নিবেদন করিতেছি। ইহাদের অধিকাংশই দেখিতে উর্বশী-মেনকার ন্যায় ছিলেন না। সুন্দরীদের বিবাহ ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত— তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিবে কোন দুঃখে? কলেজে যে কয়টি সুন্দরী দেখা যাইত, তাহাদের অধিকাংশ অধ্যাপক-কন্যা।

অচ্ছেদ্য চক্র ঘুরিতে লাগিল আরও দ্রুত বেগে। কলেজে পাসকরা মেয়ে আশকারা পাইয়াছে বেশি। যে চাকরিবাজারে সাধারণ মেয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত তাহারা সেই সব চাকরির বাজারও ছাইয়া ফেলিল— চক্রের গতি দ্রুততর হইল। পার্থের সন্ধান নাই— তিনি তখনও অজ্ঞাতবাসে— স্বয়ংবর চক্র ছিন্ন করিবে কে?

কিন্তু ইতোমধ্যে সেই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান স্বয়ংবর চক্রের একটি স্ফুলিঙ্গ নৈতিক জগতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

মেয়েরা অর্থোপার্জন করিতেছে। পিতা মৃত। পরিবার পোষণ করিতে হয় না। বিবাহের আশা নাই। অর্থ সঞ্চয় করিবে কাহার জন্য? নিরানন্দ, উত্তেজনাহীন শুষ্ক জীবন কেনই-বা সে যাপন করিতে যাইবে? অভিভাবকহীন যুবতী ও প্রৌঢ়ারা তখন বিলাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দোষ দিয়া কী হইবে? পিতা বা ভ্রাতা না থাকিলে অরক্ষণীয়ার কী অবস্থা হয় তা বেদেই বর্ণিত হইয়াছে— যতদূর মনে পড়িতেছে কোনও এক বরুণ মন্ত্রেই— ঋষি সেখানে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

উপার্জনক্ষম যুবতীরা বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়ামাত্রই চক্র দ্রুততর হইল। যেসব যুবকেরা অন্যথা বিবাহ করিত, তাহারা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। মুক্ত হট্টে দুগ্ধ যখন অপর্যাপ্ত তখন বহু যুবক গাভী ক্রয় করা অবিমৃষ্যকারিতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। বিবাহসংখ্যা আরও কমিয়া গেল— গির্জার বিবাহ-পুরোহিতদের দীর্ঘতর অবকাশ মিলিল। নাইট ক্লাবের সৃষ্টি তখনই ব্যাপকভাবে হইল, 'গণিকা' জাতির জন্ম হইল— ইহাদেরই নাম ইউরোপীয় সর্বভাষায় জিগোলো। যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, সে-ই গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল। (মাউরার জর্মনি 'পুটস দ ক্লক ব্যাক' দ্রষ্টব্য)।

তখন পুরুষ বলিল, 'স্ত্রী-পুরুষে যখন আর কোনও পার্থক্যই রহিল না, তখন পুরুষ ট্রামে-বাসে স্ত্রীলোকদিগের জন্য আসন ত্যাগ করিবে কেন?' উঠিয়া দাঁড়াইলেও তখন বহু মেয়ে

www.pathagar.com

পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। সবকিছুই তখন ৫০/৫০। আমার দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস কলিকাতা কখনও ১৯৩২-এর বার্লিনের আচরণ গ্রহণ করিবে না। বাঙালি দুর্ভিক্ষের সময় না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে; কুকুর-বিড়াল খায় নাই। তবুও সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম— অর্থনৈতিক কারণে মানুষ কী করিয়া নৈতিক জগতে ধাপের পর ধাপ নামিতে বাধ্য হয়।

অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করিবেন, জর্মনির স্বয়ংবর চক্র কি কেহই ছিন্ন করিতে সক্ষম হন নাই? হইয়াছিলেন। সে বীর হিটলার। পার্থের ন্যায় তাঁহারও নানা দোষ ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের পর তিনিই চক্রভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে ড্রেসডেন শহরে এক নির্দিষ্ট দিনে চারিশত যুবক-যুবতীকে সগর্বে শোভাযাত্রা করিয়া দল বাঁধিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিলাম। অন্য শহরগুলিও পশ্চাৎপদ রহিল না; সর্বত্র সপ্তপদী সচল হইয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে গিয়া দেখি কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীবর্জিত। হিটলার কী কৌশলে চক্রভেদ করিয়াছিলেন সেকথা আরেকদিন হইবে !!

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে-বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসির প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন— ইহার জন্য প্রধানত আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশি রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা— সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশিকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দ্দিন পূর্বে বিদেশিরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনও কোনও ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশি : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়া পলাইলে। শুনিলাম, শেষটায় নাকি আমজাদিয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে ত্রিভুবনবিখ্যাত ফরাসিস শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফ্কে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন্ জংলির রান্না খাইতে গেলে!

ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই— ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তা-ও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখো, কারণ ওই রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা না খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কী সুর ভাঁজিবে? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও? আমজাদিয়ার 'জংলি'ও তাই তোমার শেফ্কে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনও তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙা বোতল— শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি,

www.pathagar.com

টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাকে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনি সাজিতে হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়া অলিভ ওয়েল ঢালো, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুঁড়া ছিটাও— বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে— ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম— লক্ষ করিয়াছ কি শতকরা আশিজন সুপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয়?— অতএব লবণ ঢাল। তৎসত্ত্বেও যখন দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিম্ভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন কর। তোমার গাত্রে যদি পাচকরক্ত থাকে তুমি তাবৎ প্রলেপসিঞ্চন অনুপানসম্মত বা মেকদার-মাফিক করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু 'ভদ্রলোকে'র ছেলে, বাড়িতে মা-মাসিরা ওই কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নাই?

সায়েব : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় : ওইসব জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ কর না কেন, গ্রিল কবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ওই কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা শেক্সপিয়র-কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনও যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘণ্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অনুপানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন কর।

সায়েব : সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজাদিয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কী প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব : নোংরামি? সে কী কথা?

ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ওই তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ওই তো ন্যাপকিন। ঘষো আর দেখ, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি, দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ওইদিকে ধাওয়া করো তবে ম্যানেজার পুলিশ ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ রাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে।

সায়েব : সেকথা থাকুক (ধুয়া)।

www.pathagar.com

ভারতীয় : হ্যাঁ, আলোচনাটি আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালি খ্রিস্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশমাছ খাইতে যান— বেজায় সায়েব কি না— ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতরে বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রুবর্ষণ)।

সায়েব : আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।

ভারতীয় : ইংরাজ হইয়া বেকন-আণ্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসি হইয়া শ্যাম্পেন না খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালি হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লজ্জা করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে 'ব্রিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার' বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ওই বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাঁহারা এই নির্মম পর্দাপ্রথা মানেন কেন?

ভারতীয় : সে তাঁহারা মানেন; তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব : তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয় : সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব : (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয় : খারাপ-ভালোর কথা জানি না সাহেব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুর্দশা-পঙ্কে নিমগ্ন— ডাঙায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা, তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব : এসব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয় : আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে।

[ডিসেম্বর ১৯৪৫]

শিক্ষা-সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হইবে এইরকম একটি খবর শুনিতে পাইলাম।

পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই বিষয়ে নানা তর্ক নানা আলোচনা করিবেন; সেইসব পণ্ডিতের নামাবলিতে দেশবিদেশের নানা ডিগ্রি নানা উপাধির লাঞ্ছন অঙ্কিত থাকিবে; নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রকাশ করিবেন। সেখানে আমাদের ক্ষীণ নেটিভ কণ্ঠ পৌঁছিবে এমন দুরাশা আমরা করি না। আমাদের প্রধান দোষ অবশ্য যে আমরা 'ওল্ড ফুলজ' 'ধর্মপ্রাণ'; আমাদের যুক্তিতর্ক ধর্মশাস্ত্র হইতে সঞ্চয় করি, সেগুলো এ যুগে বরবাদ রদ্দি

www.pathagar.com

জঞ্জাল। কিন্তু আমরা নাচার। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে মূলা খাইয়াছে তাহার ঢেকুরে মূলার গন্ধ থাকিবেই, আমরা 'মূলা' না খাইয়া থাকিলেও জানি যে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে 'মূলের' অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুনিতে পাই সায়েবরাও নাকি তাই বলেন—নদীর মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাকি তাঁহারা বিস্তর পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করেন।

দেশে যখন ধনদৌলত পর্যাপ্ত ছিল তখন বহু লোক তীর্থ করিতে যাইতেন এবং বহু পণ্ডিতের এই ধারণা যে তাবৎ উত্তর ভারতে রেলগাড়ি প্রচলিত হইবার পূর্বেও যে ভাঙা ভাঙা হিন্দি দিয়া কাজ চালানো যাইত তাহার কারণ যাত্রীদের তীর্থপরিক্রমা। দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পীঠ বেলুচিস্থানের হিঙ্গুলা হইতে বামজঙ্ঘা পীঠ শ্রীহট্ট পর্যন্ত বহু বহু যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, বহু ভাষার বহু শব্দের আদান-প্রদান সংমিশ্রণের ফলে পণ্ডিতজন নিন্দিত একটি 'চলতি' ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া অধুনা হিন্দুস্তানি নামে পরিচিত। সে যাহাই হউক, এই অবদানের স্মরণে তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া বক্ষ্যমাণ আলোচনা নিবেদন করিতেছি না।

তীর্থে পুণ্যসঞ্চয় হইত কি না সে তর্ক অধুনা নিষ্ফল, কিন্তু এ বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান সঞ্চয় হইত, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইত, সঙ্কীর্ণতা হ্রাস পাইত এবং নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াও যাত্রী হৃদয়ঙ্গম করিত ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ। আবার বলি, নানা পার্থক্য নানা বৈষম্যের গন্ধধূপধূম্রের পশ্চাতে ভারতমাতার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইত। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত সেই সুস্পষ্ট আলেখ্য।

শিক্ষার এক মূল অঙ্গ ছিল তীর্থভ্রমণ, দেশভ্রমণ বলিলে একই কথা বলা হয়।

প্রশ্ন এই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো অজস্র ডিগ্রি প্রতি বৎসর অকৃপণভাবে বর্ষণ করেন, কিন্তু কখনও তো বিদ্যার্থীকে বার্ষিক পরিক্রমার সময় জিজ্ঞাসা করেন না, 'তুমি দেশভ্রমণ করিয়াছ, ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ হৃদয়ে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছ?'

বোধহয় করা হয় না, তাই যখন সাধারণ বাঙালি গ্র্যাজুয়েট লিলুয়ার টিকিট কাটে তখন বলিয়া বেড়ায়, 'ভাই, কী আর করি, হাওয়া বদলাইতেই হয়, পশ্চিম চলিলাম!'

অসহিষ্ণু পাঠক বলিবেন, 'কী বিপদ! বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন?'

নাই-বা দিলেন, কিন্তু এমন বন্দোবস্ত কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বাঙালি ছেলে ছয় মাস এলাহাবাদে পড়িল, আরও ছয় মাস লাহোরে এবং সর্বশেষ তিন বৎসর কলিকাতায়? নিন্দুকে বলে যে, কলেজের ছেলেরা নাকি প্রায় দুই বৎসর গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায়, শেষের চারি মাস, তিন মাস, অবস্থাভেদে দুই মাস নোট মুখস্থ করিয়া পাস দেয়। তবেই জিজ্ঞাসা, চারি বৎসরের এক বৎসর অথবা এম.এ. পাসের জন্য ছয় অথবা সাত বৎসরের দুই অথবা তিন বৎসর যদি কোনও ছেলে প্রদেশে প্রদেশে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে (সে শতকরা এক শত নাই হউক) তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ এই কলেজ সেই কলেজ করে, তবে কি পাপ হয়?

এমনকি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নাই যেখানে তাবৎ ভারতের ছেলে অধ্যয়ন করিতে সমবেত হয়, একে অন্যকে চিনিতে পারে? (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আলীগড়ে ঈষৎ হয়, কিন্তু নানা কারণে এস্থলে তাহার আলোচনা আজ আর করিব না) অথচ সংস্কৃত

www.pathagar.com

পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশের ছাত্র কাশীর চতুষ্পাঠীতে সমবেত হয়, মুসলমান ছাত্র দেওবন্দ যায়। (বিশ্বভারতীর কথা তুলিলাম না, কারণ সরকারি ছাপ লইতে হইলে সেখানকার ছাত্রকে এখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়।)

অবিশ্বাসী পাঠক বলিবেন, 'কথাটা মন্দ শুনাইতেছে না, তবে ঠিক সাহস পাইতেছি না। অন্য কোনও দেশে কি এ ব্যবস্থা আছে?' 'হোমে'র অর্থাৎ সদাশয় সরকারের দেশের কথা বলিতে পারি না এবং তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কারণ শুনিয়াছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি স্থিতি নাকি ইটন-হ্যারোর ক্রীড়াভূমিতে। তাই যদি হয়, তবে দেব পতঞ্জলির ভাষায় বলি, "হেয়ং দুঃখমনাগতম্"। স্বরাজ পাইয়া বিদেশে অপ্রতিহতভাবে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিবার কুমতি ভারতের যেন কদাচ না হয়; তাহাতে পরিণামে যে দুঃখ পাইতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বর্জনীয়।

কিন্তু ফ্রান্সে আছে, জর্মনিতে আছে, সুইটজারল্যান্ডে আছে, অস্ট্রিয়ায় আছে, তাবৎ বলকানে আছে, অথবা ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলকান রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা যাইত, বৎসর দুই নানা কলেজ নানা দেশ ঘুরিয়া পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বাড়ির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস দিত, বিদেশের 'টার্ম' স্বদেশে গোনা হইত, আর দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তো কথাই নাই। এমন জর্মন ছেলে কস্মিনকালেও খুঁজিয়া পাইবেন না যে ঝাড়া পাঁচ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবি লইয়াছে। হয়তো উত্তরায়ণ কাটাইয়াছে রাইনল্যান্ড, কলোনে অথবা হাইডেলবের্গে— দক্ষিণায়ান কিল অথবা হমবুর্গে, তার পরের বৎসর ম্যুনিকে ও সর্বশেষ দুই বৎসর স্বপুরী ক্যেনিগসবের্গে। শুধু তাহাই নহে। দেশের এক প্রান্তের ছাত্র যাহাতে অন্য প্রান্তে যায় তাহার জন্য রেল কোম্পানি তাহাকে সিকি ভাড়ায় লইয়া যাইতে বাধ্য। ছুটির সময় যখন বাড়ি যাইবে, ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্যও সিকি ভাড়া।

কিন্তু আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। কারণ, স্মরণ আছে, শান্তিনিকেতনের নন্‌কলেজেট হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. পাস করা একটি গুজরাতি ছেলের বাসনা হয় এম.এ. বোম্বাই হইতে দিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন নামঞ্জুর করিলেন, কারণ সে কলিকাতার নন্‌কলেজেট! কর্তাদের বুঝাইবার বিস্তর প্রয়াস করিলাম যে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন্‌কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়, অন্তত বিশ্বভারতীয় কলেজ অনেক মার্কামারা সফরীপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে, কিন্তু অরণ্যে রোদন।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে কী অপূর্ব বিশ্বপ্রেম, সহযোগিতা!

কোনও গুণ নেই তার—

বেহারি ভাইয়ারা (সদর্থে) বাংলা ভাষা এবং বাঙালির ওপর খড়গহস্ত হয়েছেন শুনে বহু বাঙালি বিচলিত হয়েছেন। বাঙালির প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙালিরা সবিস্তর জানতে পান তবে আরও বিচলিত হবেন— কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠি-গুজরাতি ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাটি করে না বলেই খবর পায় না।

www.pathagar.com

তাবৎ মারাঠি-হিন্দি-গুজরাতি আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙালি-বিদ্বেষ বর্তমান আছে সেকথা অস্বীকার করবার যো নেই।

কিন্তু বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে বাংলা ভাষা তথা বাঙালি বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে আমরা তাদের অনেকখানি ক্ষমা করতে পারব। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশি সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমরাই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে 'সপ্তকোটি কণ্ঠে' উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমরাই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্য-বিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয় বাংলা দেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে অনাদৃত, আজ না হয় কেন্দ্রে আমরা চক্রবর্তী নেই, তাই বলে বাংলা দেশ আরও বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘানীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই স্কন্ধে।

অবাঙালিরা যে বাঙালির দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালি যেখানে যায় সেখানকার হনুমানজি, রণছোড়জি (আসলে ঋণ ছোড়জি অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করিতে সাহায্য করেন) বা অম্বামাতার সেবা না করে কালীবাড়ি স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পুজো না করে সরস্বতীকে আহ্বান করে— কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গড্ডালিকার তাঁবেতে পড়েন। খুলে বলি।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন ধর্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালিই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনওখানেই এদের জন্য আজ আর কোনও মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কী করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন— অথচ বেদে এদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে— এমনকি বাঙালি যেমন সামাজিক ধর্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর ভারতে তেমনি হনুমানজি, গুজরাতে রণছোড়জি, মহারাষ্ট্রে অম্বামাতা।

বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালির পয়লা নম্বরের 'দোষ' সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ— সর্বত্রই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গৌড়ীয় সারস্বত ও কিম্বদন্তি এই যে, তাঁরা আসলে বাঙালি), তাই সেখানকার চিৎপাবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ, সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন— যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন। এই খাওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বাঙালি সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ— কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নিমন্ত্রিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্রত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই ও 'হস্তিনাং তাড়্যমান

www.pathagar.com

পিণ গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম' উপদেশটি অবাঙালিই দিয়েছেন। রাজপুতরা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাঈ গেয়েছেন—

ফলমূল খেয়ে হরি যদি মেলে
তবে হরি হরিণের।

কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্যে যদি বাঙালি অন্যান্য প্রদেশের বিরাগভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে, বাঙালি ভারতব্যাপী জৈন প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি।

আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমরা পরীক্ষা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত কায়দায় পরীক্‌ষা আত্‌মা উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এসব শব্দ কীভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এসব শব্দ বাংলা কায়দায় উচ্চারণ করি।

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দি-গুজরাতি-মারাঠিরাও করেন। সাধারণ হিন্দি বলার সময় সবাই ক্ষত্রিয়কে শত্রিয় বলে, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনি পরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল— যার ফলে লক্ষ্মণ লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দি, বাংলা, গুজরাতির ওপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গেল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাংলা স্বীকার করল না। বাঙালি তখন সেই ধ্বনিপরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাংলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এস্থলে বাঙালি পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে, তাই করল— ইংরেজ, ফরাসি অথবা জর্মন যখন তার ভাষাতে গ্রিক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন দিয়েই করে, এমনকি গোটা বাক্যও আপন কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজ্ঞেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priori-কে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রায়োরাই বলেন)। হিন্দি গুজরাতি মারাঠি ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন মেনে নিয়েছে এমনকি মারাঠিরা জ্ঞানেশ্বরকে দানেশ্বর বলেন! কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।

অবাঙালিরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ 'বিকৃত' করে তার ওপর 'অত্যাচার' করেছি।

কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙলা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহিত্য হিন্দি, মারাঠি বা গুজরাতিকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয় আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাংলা লিখতুম তা হলে 'মেজদিদি', 'বিন্দু', 'জ্যাঠাইমা' চরিত্র আঁকা অসম্ভবপর হত কি না? ইংরেজের অত্যাচার-জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'এই ভূতের খাজনা দেবো কিসে?' উত্তরে বললেন, 'শ্মশান থেকে মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ঈমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' এ উত্তর বিদ্যাসাগরী বাংলায় কখনও রূপ পেত?

www.pathagar.com

ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞাজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ তথা বাংলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাংলা ভাষা যখন আপন নিজস্বতা খুঁজছিল তখন সে জানত না যে ইংরেজি ফরাসি জর্মন একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেনি। প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম বঙ্কিম পান; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এঁদের নিয়ে গর্ব না করি তবে আমাদের নিমকহারামির অন্ত থাকবে না।

* * *

অবাঙালিরা যখন বাঙালির প্রতি বিরক্ত হন তখন তাদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালিরা আর কিছু পারো না পারো একটা জিনিসে তোমরা যে ওস্তাদ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই,— তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরেজিতে তাকে এত 'বুস্‌ট' করো যে অবাঙালি পর্যন্ত সেই প্রোপাগান্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জব্বর কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালি মাত্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পঞ্চ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অর্বাচীনের ফতোয়া সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালিকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনাবার হক তার তখন আলবত আছে।

আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালি বেচারি পড়েছে মাত্র *গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার* এবং *চিত্রাঙ্গদার* অনুবাদ। হয়তো আরও দু-একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজি যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন যে এগুলোর মধ্যে এমন কী কবিত্ব, এমন কী তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়। ইয়েট্‌স্ সাহেব যখন *গীতাঞ্জলিকে* প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় :— রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে হয়তো এমন কোনও অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরেজিভাষী ইয়েট্‌স প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মতো বাঙালি অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরেজি জানে না এবং আর পাঁচজন অবাঙালি যদি আমারই মতো হয় তাতে আমার রাগ করার কী আছে?

সাধারণ বাঙালি যখন অবাঙালির এই 'নীচ' আক্রমণে মার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালি রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিছক ঢিটেমি করে বাঙালির নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয় ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে পাথরও ছোড়া হয়, তখন মানুষ জানা-অজানাতে অন্যায় কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোঁকে তখন অবাঙালি আমাদের অন্যান্য মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতনামা হয়েছে সেকথা বলতেও কসুর করে না।

আমি বাঙালি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কী করে বুক ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার

www.pathagar.com

প্রয়োজন আমরা কখনও অনুভব করিনি। এঁরা বাঙালির ধর্মজগতের গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালি জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি, উর্দু নিয়ে চর্চা করেছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধহয় বাঙালিকে নিতান্ত নিষ্কর্মা জেনেই দায় করে একমাত্র তাকেই অকৃপণ হস্তে এতগুলো ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হুঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর ওপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।

আজকাল অবশ্যি ধর্ম রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাংলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লি সর্বত্রই পেনশন টানছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য বিবেকানন্দ এবং দূর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালির জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন সেকথা আমরাই এখনও ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি— বিজ্ঞাপন দেবে কে, বুসট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম!

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীরে অনেকগুলো জানালা তৈরি করে দিয়েছেন— তারি ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেলুম। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপন সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে তুললুম।

সবচেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল খ্রিস্টান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসি বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালি এবং তাঁরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালি সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের সকলেই জানা-অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্যক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।

বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরেজি তথা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যকলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তাঁরা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তাঁরা বাঙালির চেয়ে ভালো ইংরেজি শিখলেন বটে— যদিও সে ইংরেজি সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না— কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে লোকমান্য টিলক (কথাটা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জন্মালেন বটে কিন্তু সেসব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসার হল না বলে মারাঠি, গুজরাতি সাহিত্য আজও বাংলার অনেক পিছনে।

অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তা হলে ঘুচবে কবে? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে। ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি— তার কারণটাও অনায়াসে বোঝা যায়— কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সর্বপ্রদেশের সর্বপ্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী

www.pathagar.com

বহু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অবজ্ঞাপ্রসূত এসব বিদ্বেষ কস্মিনকালেও যাবে না, এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্রাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবে না। ব্যবস্থাটা হবে এই যে, বহু ছাত্র মারাঠি, বহু ছাত্র গুজরাতি, অন্যেরা তামিল অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ওইসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনূদিত হবে। ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিদ্বেষ থেকে যায় তবে তার জন্য অন্তত আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না।

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন— সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে করে না— কিন্তু যদি জিগ্যেস করেন, সবচেয়ে মর্মন্তুদ আমার কাছে কী লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানিনে। সন্ধের সময় বাড়ি ফেরে— আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায়নি— আমার মনে হয়, এ জীবনে কোনওদিনই সে কোনও দিকে তাকিয়ে দেখেনি।

দেবতা ওকে দয়া করেনি। রং কালো এবং সে কালোতে কোনও জৌলুস নেই— কেমন যেন ছাতা-ধরা মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দু খানা শরের কাঠি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পড়েনি কে জানে। আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মতো ভাষা আমার নেই। শুধু জানি— স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরও জানি, একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না, শুনব, যক্ষ্মা কিংবা অন্য কোনও শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।

শুনলুম, মাস্টারনিগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে— সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ-দাদা করেছিলেন তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকভাবে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনওদিন বর জোটে তবেই ভগবানে আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।

জানি, জানি, জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে, কলকাতাতেই আছে। কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার অভ্যাস নেই, কখনও হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে— আমার মা-ও কম খাটতেন না— কিন্তু তাঁর খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,— কিন্তু এই যে

www.pathagar.com

পাড়ার কালো মেয়েটি যে সকাল হতে না-হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠছে, দুপুরবেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটবে হয়তো হেডমিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা-অবহেলা— হয়তো তার শ্রীহীনতা নিয়ে দু-একটা হৃদয়হীন মন্তব্যও তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায় গর্তে ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক-মাইলের ধাক্কা আমি জানিনে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক, জুটত এবং ছোট হোক, বড় হোক কোনও না-কোনও সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দু মুঠো অন্ন জুটত— তা সে গতর খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক— তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তারা কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়তো বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনি আর তারই মতো মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরি হয়— বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়বে, যে দেশে কখনও একান্ন পরিবার ছিল না সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষবে কে? কিন্তু আর আর দেশ আমাদের মতো মারাত্মক গরিব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেটভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনি যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মতো পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে; কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ সে কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয় : এ দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, একথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনও গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়— আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনওপ্রকার আনন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারিনে।

এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে?

আমি সোজাসুজি বলব, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারও নিন্দে সে কখনও করতে যায়নি। সে চেষ্টা করেছে আপনাদের আনন্দ দিতে— তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকেনি; এর গলদ, ওর ত্রুটি নিয়ে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনও সস্তা রুচিকে সে টক-ঝাল

www.pathagar.com

দিয়ে খুশি করতে চায়নি। কিন্তু, এখন যদি না বলি যে, আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেননি, কোনও পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেননি, তা হলে অধর্মাচার হবে।

বেকার সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তাঁরা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনও ভবিষ্যৎ নেই— এই কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়— কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, একথা ভাবতে গেলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বদেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তাঁরা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এঁরা আর ভয় করেন না!!

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্রীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা 'ত'য়ের মতো হয় তখন r টাকে 'ঋ' বানাতে কারও বড় বেশি আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদি হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদিটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগ্‌গি নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই; কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্স ত্যাগ করার পূর্বে প্রাণভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫-এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মতো 'পরিপক্ব' হবে না।— কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫-এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তাঁর পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমানধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন) এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন্ সাহসে?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাঁদের ইতিহাস, শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলো সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বংশানুক্রমে মহাপুরুষ মোসেজ (মুসা), নোয়া (নুহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছায়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মুহম্মদে, অন্য অংশ তাঁর খুড়োর

www.pathagar.com

ছেলে আলীতে। আলী মুহম্মদের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হুসেনের শরীরে আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তার পর সেই জ্যোতি বংশানুক্রমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সে-ও খাঁটি; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তাঁর ছেলে হুসেনে বর্তে ক্রমে ক্রমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে।

তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় 'দশবাঁ নকলঙ্কি অবতার আগা সুলতান মুহাম্মদ শাহ'।

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কী প্রকারে? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরও নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবর্তী সিন্ধু প্রদেশ আর কাঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন।) এই মিশনারিদের ওপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারও ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোনও আপত্তি নেই— মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারিদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব— কিন্তু পাঞ্চরাত্র মতবাদের। এঁরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সেকথাটা আজও খোজাদের 'জমাতখানা'তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপন মসজিদের নাম 'জমাতখানা' বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাঁদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বর্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খান রূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে একমুহূর্তে সর্বসৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নতুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী— বা অন্য যে কোনও শতাব্দীতে— কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকর্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কী প্রকারে?

ভারতবর্ষে সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরানের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইলি মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া

www.pathagar.com

দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজারা যদিও কোরানকে 'ভালো কেতাব'রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানেন কচ্ছি এবং গুজরাতি ভাষায় লিখিত নিজস্ব 'গিনান' গ্রন্থাবলিকে। 'গিনান' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞান' শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এসব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তা-ও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সবচেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জমাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনও কোনও স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংশ ফেলে দেয় এবং এইসব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তাছাড়া পালা-পরবে দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার-ব্যবসা জগৎজোড়া— শাঙ্গাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এতসব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনও হিল্লে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কী প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?

বিলক্ষণ। শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্রায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতু শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মতো বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদ্বুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টিল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশি। তবে?

খোজারা বলেন, 'আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতি পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূতপবিত্র। কোনও বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তাঁর হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।'

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল-দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প— এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি, খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিগ্যেস করেন, 'একথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে?'

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি? মানুষ কি গরুকেও পুজো করে না?'

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না ॥

www.pathagar.com

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনতে পেরেছিল, আর আজ যে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ বড় একটা করে না তার কারণ কী?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে প্রশ্ন স্বগত— আমরা, অর্থাৎ বাঙালিরাই রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনি? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, নাট্যনির্মাণক্ষমতা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, সার্বভৌমিক ধর্মানুভূতি, ঔপন্যাসিক অন্তর্দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টা, বৈয়াকরণিক অনুসন্ধিৎসা— সবকিছু মিলিয়ে তাঁর অখণ্ডরূপ হৃদয়মনে আঁকার কথা দূরে থাক, যেখানে তিনি ভারতের তথা পৃথিবীর সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তারই সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন কজন বাঙালি?

কবিতার কথাই ধরা যাক। সেখানে দেখি কেউ কেউ 'কল্পনা' ছাড়িয়ে কবির সঙ্গে কল্পলোকে 'হংসবলাকা'র পাখা মেলতে নারাজ, কেউবা 'মহুয়া'তে পৌঁছে বঁধুকে 'মহুয়া' নাম ধরে ডেকেই সন্তুষ্ট, আর রোগশয্যায় কবিকে সঙ্গ দিতে রাজি অতি অল্প দুঃসাহসী রসজ্ঞ। কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি নিজে গুরুদেবের গদ্য কবিতার রস পাই না। কাজেই আমরা সকলেই পরমানন্দে অন্ধের হস্তীদর্শন করছি— কিন্তু আমাদের চরম সান্ত্বনা, এ সংসারের অধিকাংশ অন্ধ আপন আপন যষ্টি ত্যাগ করে বৃহত্তর লোকের ক্ষীণতম আভাস পাওয়ার জন্য অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উদ্‌গ্রীব নয়।

এ কথাও বলা বৃথা যে রবীন্দ্রকাব্যের সম্পূর্ণ রস পাই আর না-ই পাই, তার কাব্যজগতের মূল সুরটি আমরা ধরতে পেরেছি। মনে পড়ছে বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কাব্যে প্রধান দুটি মিল দেখিয়ে একখানা সরেস প্রবন্ধ পড়েছিলেন— বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার ও প্রেমের কবি। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে সভাপতি রূপে কবিগুরু লেখাটির প্রচুর প্রশংসা করে বলেন যে, 'যদিও মিল দুটি স্বীকার্য তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন, এই দুই বস্তু বাদ দিয়ে ভারতীয় কোনও কবি কি লিখতে পারতেন?' রবীন্দ্রনাথ সালঙ্কার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন— এতদিন পরে স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে তার প্রতিবেদন দেওয়া আমার পক্ষে 'সাহিত্যিক' সাধুতার পরিচায়ক হবে না, তবে ভাবখানা অনেকটা এই ছিল যে রাফায়েল মাদোন্না এঁকেছেন, অজন্তাকারও মাতাপুত্র এঁকেছেন কিন্তু দু জনের ভিতর সত্যিকার মিল কতদূর?

অর্থাৎ রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর যদি এই শ্রেণিরই হয় তবে তার কোনও মূল্য নেই।

(এ স্থলে অবান্তর হলেও একটি কথা না বললে হয়তো প্রবন্ধলেখকের প্রতি অন্যায় করা হবে। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে প্রবন্ধটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সপ্রমাণ করে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল তবু সভাস্থ আর পাঁচজন সে মত পোষণ করেননি, এবং বিশ্বভারতীর যে কোনও ছাত্র এরকম প্রবন্ধ লিখতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হারাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটি গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন :

www.pathagar.com

আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান ॥

শুধু কদমফুল। প্রকৃতির কত নগণ্য সৌন্দর্যবস্তু মানুষের কত উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্পর্শমণির স্পর্শে হেমকান্ত সফল পরিপূর্ণতায় অজরামর হয়ে গিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে— ক্যাথলিকদের ভাষায় বলি, ক্যাননাইজড হয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙালির স্পর্শকাতর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করবে।

অথচ আজকের দিনে এ কথাও সত্য যে অল্প বাঙালিই রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের আড়াই শ গান শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তবে কি আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইনি? সেকথাও সত্য নয়। আমরা এতক্ষণ বাঙালি যুধিষ্ঠিরকে শুধু তাঁর নরক দর্শন করাচ্ছিলুম এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম যে বাঙালির পক্ষেও যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে চেনা এত কঠিন হয় তবে অবাঙালির পক্ষে, বিশেষত সাহেবের পক্ষে— তা তিনি ইংরেজই হোন আর জর্মনই হোন— সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ যান তখন তিনি বিশেষ করে জর্মনিতে রাজাধিরাজের সম্মান পান। সে সম্মানের কাহিনী বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে নানা ভাষায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

তার পর রবীন্দ্রনাথ আবার জর্মন যান ১৯৩০ সালে। মারমুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ততম গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কী এক জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত জর্মনির বিদ্বজ্জন তখন মারবুর্গে সমবেত; তাঁরা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। অধ্যাপক অটো সে বক্তৃতার জর্মন অনুবাদ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রচনা পাঠ শুনেছিল এবং পাঠ শেষ হলে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল, তার তুলনা দেবার মতো ভাষা আমার নেই।

সেদিন বিকেলবেলা মারবুর্গের পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন পুস্তকের জর্মন অনুবাদ পাওয়া যায়। নির্ঘণ্ট শুনে আশ্চর্য হলুম— *গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, চিত্রা, ডাকঘর, সাধনা* এবং *নেশানালিজম*! মাত্র এই কখানি বই নিয়ে আর ইংরেজি ভাষায় এক বক্তৃতা শুনে জর্মনরা এত মুগ্ধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং এখনও আছে যে, ইংরেজি বা জর্মনে এই কখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের আসল মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জর্মনির এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। *গীতাঞ্জলির* ধর্মসঙ্গীত জর্মন মনকে চমক লাগাতে পারে, *গার্ডেনারের* প্রেমের কবিতাও জাদু বানাতে পারে, *সাধনার* রচনাও বিদ্যুৎশিখার মতো ঝলকাতে পারে কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অনুবাদ অপরিহার্য!

www.pathagar.com

কিন্তু কোনও ব্যাপক অনুবাদকার্য কেউ হাতে তুলে নেননি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত শুধু সবচেয়ে বড় দুঃখটা নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথের গানের মতো হুবহু গান জর্মনে আছে এবং সেগুলো জর্মনদের বড় প্রিয়। এগুলোকে 'লিডার' বলা হয় এবং শুধু লিডার গাইবার জন্য বহু জর্মন গায়ক প্রতিবছর প্যারিস, লন্ডন যায়। এসব লিডারের কোনও কোনও গানের কথা দিয়েছেন গ্যোটের মতো কবি, আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মতো সঙ্গীতকার।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে গ্যোটে-বেটোফেনের সমন্বয়। একাধারে এই দুই সৃজনপন্থার সম্মেলন হয়েছিল বলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জর্মন লিডারের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, এবং বিশেষ করে সুর ও কথার অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত অর্ধনারীশ্বর পৃথিবীর কোনও গান বা 'লিডার' জাতীয় সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হননি— রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যেরকম হয়েছে।

বাঙালিকে বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্য একমাত্র জর্মনিই ঠিক বুঝতে পারবে।

কোনও ব্যাপক অনুবাদ তো হলই না, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানও জর্মন-কণ্ঠে গীত হল না।

কাজেই 'সাত দিনের ভানুমতি' আট দিনের দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো অনুবাদক কবি ইয়োরোপে জন্মাবেন সেদিন ইয়োরোপ—

'চিনে নেবে চিনে নেবে তারে।'॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ান

বাস্তুবাড়ি আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কতদূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা-ওটা-সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কতদিক দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারি খুশি কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনও আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। অথচ নতুন করে সবকিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে। হটেন্‌টটদের মতো রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোনওপ্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।

www.pathagar.com

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও একদিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজন রূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়তে লাগল। কিন্তু সে সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহনমন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সেকথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করেনি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই সে আমাদের কানের কাছে অহরহ ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরও দু-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরণ্যে মহাজন জাতি একথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমনকি ইংরেজ যার ওপর রাজত্ব করেছে সে যে একদিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য ছিল সেকথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসি এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনও নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনও জন্মাননি, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমরা ছোট জাত নও' একথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেঁধেছে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যদিও আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহু লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশে বহু দিক দিয়ে যুগ যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু, সেই জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নতুন কোনও যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলুম না। এমন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে রকম এ দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কী পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং একথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। একদিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ দেশে এসে আমাদের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও একদিকে যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন-আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিবিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছুদিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন— জাপান হাট থেকে সরে যেতেই আহমদাবাদ ডাইনে, পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে।) ভৌগোলিক ও কৃষ্টি-জাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয়।

www.pathagar.com

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভি-মৌলানারা আরবি-ফারসি জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পাননি— এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কি কীরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানিনে। [বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনে'র দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং এই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীন সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।]

জাপান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই নেই। [তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে অতি উত্তম জাপানি ভাষা শিখে এসেছেন। সে ভাষা শেখাবার জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই— তাঁর স্ত্রীও জাপানি মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়নি।]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানি ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানি ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে সংস্কৃতি চীন এবং জাপানে প্রসারলাভ করেছে— সে সংস্কৃতি প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানি বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বাতাবরণের ভিতর নতুন নতুন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খ্রিস্টধর্ম ও প্যারিসের খ্রিস্টধর্মও এক জিনিস নয়, মিশরি মুসলিমে ও বাঙালি মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছে সে ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, জাপানিতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ— এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এঁদের প্রধান কাজ গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাপানি শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সেসব জীবনী নিয়ে বাংলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রিয়োকোয়ান জাপানি ছিলেন— কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারেনি। বইখানি ইংরেজিতে লেখা, নাম 'Dew-drops on a Lotus Leaf'। আর কিছু না হোক নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয়, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং' বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারিনি। শঙ্করাচার্য যখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'

www.pathagar.com

আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়তো জীবনকে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
— খাটে, ছেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনও।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
— শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন ॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রিয়োকোয়ান-চরিত্রের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন : রিয়োকোয়ানের আমলের বড় জাগিরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মাকিনোর দূত রিয়োকোয়ানের কুঁড়েঘরে পৌঁছাবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রিয়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটিরের চারদিকের জমি-বাগান সবকিছু পরিষ্কার করে দিল।

রিয়োকোয়ান ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ। মাকিনোর দূত তখনও এসে পৌঁছয়নি। রিয়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, 'হায় হায়, এরা সব কী কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সবচেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল ঝিঁঝিঁপোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে, হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে, কে জানে?'

রিয়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল। শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটিরের চারিপাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্যদিনের আমার নর্ম্য-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কী হবে উপায় এবে
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই-বা কী আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগিরদারের প্রাসাদকাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

www.pathagar.com

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।[১]

ফিশার বলেন, এই জাপানি শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখৎকে[২] , তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রিয়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষীগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তির রাজবৈদ্য। তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, 'আমাদের পিতামহী মারা যান ১৮৮৭ সালে। তিনি যৌবনে রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।'

রিয়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১১ সালে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুওসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রিয়োকোয়ানের প্রিয়া শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রিয়োকোয়ানের কবিতা থেকে 'পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু' নাম দিয়ে একটি চয়নিকা প্রকাশ করেন। রিয়োকোয়ানকে কবি হিসেবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিকা প্রকাশ করেননি; তিনিই তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি— আর যে পাঁচজন তাঁকে চিনতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্পা, খামখেয়ালি ধরনের লোক, যদিও শ্রমণ হিসেবে তিনি অনিন্দনীয়। এমনকি রিয়োকোয়ানের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেননি। তাঁদের কাছেও তিনি অজ্ঞেয় অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রিয়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, চয়নিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ মানুষটিকে চেনা কারও পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধুলা করে। তাতেই নাকি পেতেন তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ। খেলার সাথি না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভিতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট ছোট পাখি তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারি খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল-সন্ধ্যা তাদেরি সঙ্গে ফুর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রাতে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু কব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কী করে যে গেছে চলে!

---

১. শেলির 'What if my leaves are falling' ভিন্ন অনুভূতিতে, ঈষৎ দম্ভপ্রসূত।

২. Calligrapher = সুদর্শন লিপিকার।

www.pathagar.com

এই আপনভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসারবিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজন সুলভ গভীর আত্মীয়তাবোধ। এই 'সর্বং শূন্যং সর্বং ক্ষণিকং' জগতের প্রবহমান ঘটনাবলিকে তিনি আর পাঁচজন শ্রমণের মতো বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্যবিলাসী কবিদের মতো চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনাবোধ যে রিয়োকোয়ানের ছিল না তা নয়— তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে, তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে— কিন্তু সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তস্তল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন তিনি কখনও কাউকে আপন ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেননি, অন্যান্য শ্রমণের মতো বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেননি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সালে শ্রীযুক্ত সোমা গায়েফু কর্তৃক 'তাইগু রিয়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্রব্রজ্যাভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশি শিক্ষক য়াকব ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রিয়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়েফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি শ্রমণ রিয়োকোয়ানের মর্মস্থলে পৌঁছতে পেরেছেন।

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম হয়। রিয়োকোয়ান-বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রিয়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রিয়োকোয়ানকে বুঝতে হলে তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সবসময়ই প্রকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোনও কবিই এ জীবনে পাননি। সাধারণ কবি এরকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে নিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব মিলে মিশে চলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রিয়োকোয়ানের পিতার দ্বন্দ্ব-মুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনও সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রিয়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনও সমাজের আর পাঁচজনের জীবনের মতো গতানুগতিক ধারায় চলতে পারেনি। রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবকিছুই ছিল, রাজধানীতে রিয়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসতগ্রামের অধিবাসীরা রিয়োকোয়ান পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও কেন পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্ত্র গ্রহণ

www.pathagar.com

করলেন এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রিয়োকোয়ান-জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেননি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সে যুগে এমন কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বসমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সেরকম কোনও ইঙ্গিতও করেননি।

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান শিশুবয়স থেকেই অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির পরিচয় দেন। আর সব ছেয়েমেয়ে যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকত তখন বালক রিয়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কনফুৎসিয়ের তত্ত্ব-গম্ভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়েছেন।

রিয়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দুটি কথা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। রিয়োকোয়ান বালক বয়সেও কখনও মিথ্যা কথা বলেননি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রিয়োকোয়ানের বাল্যজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁরই সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দুঃখে রিয়োকোয়ান বড়ই ব্যথিত হন ও ক্রুদ্ধনয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা তাঁর আচরণ লক্ষ করে বললেন, "এরকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ওই চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।' তাই শুনে বালক রিয়োকোয়ান বাড়ি ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রিয়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষাণস্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, তিনি পাষাণস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ি এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কী করছিলে?' রিয়োকোয়ান বড় বড় চোখ মেলে বললেন, "তবে কি আমি এখনও মাছ হয়ে যাইনি, আমি না দুষ্টু ছেলের মতো তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?'

রিয়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ত পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রিয়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হতে পারেননি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মতো এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়—

সকাল বেলায় কখনও গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদো'[১] দ্বীপ পানে
শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

১. রিয়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

www.pathagar.com

প্রব্রজ্যা

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখসমৃদ্ধি সর্বস্ব দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তি বিশ্লেষণ করেছেন। কারও মতে রিয়োকোয়ানের কবিজন সুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারও মতে ভোগবিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রিয়োকোয়ান নাকি এই সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা[১] তরুণীর বাড়িতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছে থেকে প্রচুর খাতিরযত্ন পেতেন, তার ওপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশি করার জন্যে নাচল, গাইল— প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোনও কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয় গাইশা তরুণী বারবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চার শ টাকা খরচ করে সে রাত্রে রিয়োকোয়ান বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকালবেলা রিয়োকোয়ান বাড়ির পাঁচজনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কী হয়েছে বুঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুণ্ডিত মস্তক আর দেখা গেল তাঁর সর্বাঙ্গ জাপানি শ্রমণের কালো জোব্বায় ঢাকা।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্য রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার পর বাড়ি ছেড়ে পাশের কহ্‌শহ্‌জি সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ি পড়ে। সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, “প্রিয়, তুমি এ কী করেছ! তোমার গায়ে এ বেশ কেন?’

রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বল্লভকে ঠেকাতে পারে?

ফিশার বলেন, এসব কিংবদন্তি তাঁর মনঃপূত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন, সে জায়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম-বসন্তে যেরকম মধুর শান্ত ভাব ধারণা

---

১. ‘গাইশা’ ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; *মৃচ্ছকটিকের* বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রিসের ‘হেটেরে’ শ্রেণীয়া।

www.pathagar.com

করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল; একদিকে ঋজু শান্ত পাইনবনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্যদিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচিবিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই— রিয়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে একথা বলেননি— এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তার সদুত্তর তো কেউ কখনও খুঁজে পায়নি। সন্ন্যাসী-চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; আরও তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু এই তারা তো সন্ন্যাস নেয় না? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরও বেশি, মৃত্যুভয়ে তো বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।

গাইশা তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? তাই-বা কী করে হয়? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে— রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা প্রণয়িনী তাঁকে করুণ কণ্ঠে প্রেম নিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন :

মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে প্রণিপাত! (— সত্যেন দত্ত)

এবং এসব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালি জানি। 'ওরে বেলা যে পড়ে এল'— অত্যন্ত সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কী করে এক জমিদারের কানে এই মামুলি কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছল। শুনেছি, সে জমিদার নাকি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এ কয়টি কথা যে পূর্বে কখনও তিনি শোনেননি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মুহূর্তেই পালকি থেকে বেরিয়ে একবস্ত্রে সংসার ত্যাগ করলেন?

সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শুক্তিরও অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মুক্তায় পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন শুক্তি কোন মুক্তায় মুক্তি পেল।

রাজার ডাকঘর অমলের জানালার সামনেই বসল কেন? অমলই-বা রাজার চিঠি পেল কেন?

শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, 'তীব্র সংবেগানামাসন্ন:' (১, ২৯)। অর্থাৎ যাঁদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তারাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই-বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলি তো দেননি।

www.pathagar.com

তাই বোধহয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মুহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয় সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।'

রিয়োকোয়ান উনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি জনসাধারণের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাঁকে স্বার্থপর বলা চলে না।'

এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোনও অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্তত ভারতবর্ষে নয়।

সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের সম্মুখে কী কী বাধাবিপত্তি উপস্থিত হতে পারে, তার বর্ণনা ভারতবর্ষের সাধকেরা দিয়ে গিয়েছেন। সংসার ত্যাগের প্রথম উত্তেজনায় মানুষ যে তখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখা টানতে পারে না, সে সাবধানবাণী ভারতীয় গুরু বারবার সাধনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষ নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এইসব চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বলেই পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকের ধ্যান-মার্গ অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চীন-জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধভূমি ভারতবর্ষের এ ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। তারা নিয়েছে আমাদের সাধনার ফল— আমাদের পন্থা যে কত পতন-অভ্যুদয় দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তার সন্ধান ভারতবর্ষের বাইরে কম সাধকই পেয়েছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভবের প্রত্যাশা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে বহু নবীন সাধক সাধনার দৃঢ় ভূমি থেকে বিচ্যুত হন।

রিয়োকোয়ানের জীবনী-লেখক অধ্যাপক ফিশারের বর্ণনা হতে তাই দেখতে পাই, তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে কী অহেতুক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে নির্বাণের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব যেসব আত্মনিপীড়ন বর্জনীয় বলে বারবার সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন, বহু জাপানি সঙ্ঘে সেই আত্মনিপীড়নকেই নির্বাণ লাভের প্রশস্ততম পন্থা বলে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল।

ফিশার বলেন, 'সঙ্ঘের চৈত্যগৃহে কুশাসনের উপর পদ্মাসনে বসে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নবীন সাধককে প্রহরের পর প্রহর আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হত। একমাত্র আহারের সময় ছাড়া অন্য কোনও সময়েই দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অনুমতি তাদের ছিল না। একটানা কুড়ি ঘণ্টা ধরে কখনও কখনও তাদের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতে হত এবং সেই ধ্যানে সামান্যতম বিচ্যুতি হলে পিছন থেকে হঠাৎ স্কন্ধোপরি গুরুর নির্মম লগুড়াঘাত।'

ধ্যানে নিমজ্জিত হবার চেষ্টা যাঁরাই করেছেন, তাঁরাই জানেন, প্রথম অবস্থায় নবীন সাধক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলে জড়-সাধনা এবং পতঞ্জলি তাই যে উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অল্প সময়ে ফললাভের আশা করা সাধনার প্রতিকূল। অত্যধিক মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কত সাধক যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, সে কথা ভারতীয় গুরু জানেন বলেই শিষ্যকে অতি সন্তর্পণে শারীরিক ও মানসিক উভয় সাধনাতে নিযুক্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে উপদেশ দেন।

www.pathagar.com

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, রিয়োকোয়ান সঙ্ঘের উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনায় ভেঙে পড়েননি। নয় বৎসর ধ্যান-ধারণার পর তাঁর গুরুর মৃত্যু হয়। রিয়োকোয়ান তখন সঙ্ঘ ত্যাগ করে, পর্যটকরূপে বের হয়ে যান। রিয়োকোয়ানের পরবর্তী জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, তিনি অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিষ্ফলতা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটনে বাহির হয়ে যান।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর রিয়োকোয়ান ধ্যান-ধারণা ও পর্যটনে অতিবাহিত করেন। তাঁকে তখন কোন সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার সন্ধান আমরা কিছুটা পাই তাঁর কবিতা থেকে; কিন্তু সেগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের সাধনার ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে লেখবার উপায় নেই।

কিন্তু একটি সত্য আমরা সহজেই তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করতে পারি। দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি রিয়োকোয়ান কখনও পাননি। মাঝে মাঝে দু-একটি কবিতাতে অবশ্য রিয়োকোয়ানকে বলতে শুনি, তিনি শান্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি ভিন্ন কবিতায় তিনি হয় নববসন্তের আগমনে উল্লসিত, নয় বাদলের মাঝখানে দরিদ্র চাষার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে বেদনানুভূতিতে অবসন্ন। আমার মনে হয়, রিয়োকোয়ান যে চরম শান্তি পাননি, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য। নির্দ্বন্দ্ব জীবনের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের তো কবিতা রচনা করবার জন্য কোনও আবেগ থাকার কথা নয়। শান্ত রস এক প্রকারের রস হতেও পারে, কিন্তু সে রস থেকে কবিতা সৃজন হয় কি না তা তো জানিনে এবং হলেও সে রস আস্বাদন করবার মতো স্পর্শকাতরতা আমাদের কোথায়? দাক্ষিণাত্যের আলঙ্কারিকেরা তাই শঙ্করাবরণম্‌কে সন্ন্যাস রাগ বলে সঙ্গীতে উচ্চ স্থান দিতে সম্মত হন না। তাঁদের বক্তব্য সন্ন্যাসীর কোনও অনুভূতি থাকতে পারে না, আর, অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টিও হতে পারে না।

রিয়োকোয়ানের কবিতা শঙ্করাবরণম্‌ বা সন্ন্যাস রাগে রচিত হয়নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সাধনা ও পর্যটনের পর যখন তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পিতা জাপানের রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন তখন এক মুহূর্তেই তাঁর সমস্ত সাধনা-ধন তাঁকে বর্জন করল।

খ্রিস্ট বলেছেন, 'The foxes have holes and the birds of the air have nets; but the Son of man hath not where to lay his head' অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জন্মভূমি নেই, আবাসভূমিও নেই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে রিয়োকোয়ান বিচলিত হয়ে হঠাৎ যেন বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন।

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন— সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্যনবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা।
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা !

এ কি শ্রমণের বাণী, এ কি সন্ন্যাসের নিরাবলম্বতা !

www.pathagar.com

ফিশার বলেন, 'মাতৃভূমির আহ্বান রিয়োকোয়ানকে এতই বিচলিত করে ফেলল যে তিনি স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।'

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার চেয়ে হয়তো সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই তাঁর হৃদয় তৃষাতুর হয়েছিল বেশি। আত্মজনের সঙ্গসুখ শ্রমণ রিয়োকোয়ান কখনও ভুলতে পারেননি; সে সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া 'ক্ষণেকের খেদ' নয়, চিত্তাকাশে 'উড়ে-যাওয়া আবছায়া' নয়, সে বেদনা অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে নির্বাণ অন্বেষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে কবি রিয়োকোয়ান শ্রমণ রিয়োকোয়ান হতে পারতেন না। কবি ও শ্রমণের মাঝখানে যে অক্ষয় সেতু রিয়োকোয়ান নির্মাণ করে গিয়েছেন, সে সেতু আমাদের কাছে চিরবিস্ময়ের বস্তু, সেই সেতুর বিশ্বকর্মা তিনি কখনওই হতে পারতেন না।

ফিশার বলেন, কিন্তু বাড়ির কাছে পৌঁছে রিয়োকোয়ান থমকে দাঁড়ালেন, নিজের আচরণে লজ্জিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্বিতীয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ফিশার বলেন, বোধহয় রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাসক্তি থেকে প্রবলতর ছিল বলেই শেষ মুহূর্তে তিনি স্বগ্রামে প্রবেশ করলেন না। তাই হবে। কারণ, উপেন দুই বিঘে জমি কিছুতেই না ভুলতে পেরে শেষকালে যখন আপন বাস্তুভিটায় ফিরে এল, তখন সে দুটি আমের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। আর যে চিত্ত সন্ন্যাসের দৃঢ় ভূমি নির্মাণে তৎপর সে চিত্ত ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে স্বগৃহে ফিরে এলেও গৃহ-সংসারের প্রকৃত রূপ হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও প্রবাসের দূরত্বে যে গৃহ তার কাছে মধুময় বলে মনে হয়েছিল ('নিকটে ধূসর-জর্জর অতি দূর হতে মনোলোভা') তার বিকট রূপ দেখে সে তখন পুনরায় 'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র সংসারে প্রণিপাত' বলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

বৌদ্ধ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সন্ন্যাসধর্মকে ক্ষুণ্ন করে না। স্বয়ং বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর কপিলাবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন। শ্রমণ রিয়োকোয়ান বোধিলাভ করতে পারেননি বলেই স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এই সময় রিয়োকোয়ানের পিতার নিজের হাতের লেখা একটি কবিতা পুত্রের হাতে এসে পড়ে; কবিতাটি তিন লাইনে লেখা জাপানি হাক্কু পদ্ধতিতে রচিত :—

কী মধুর দেখি রেশমের গাছে ফুটিয়াছে ফুলগুলি;
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা-তুলি !

রিয়োকোয়ানের মৃত্যুর পর এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে। আর এক প্রান্তে রিয়োকোয়ানের নিজের হাতে লেখা, 'হায়, এই কুয়াশার ভিতর বাবা যদি থাকতেন! কুয়াশা সরে গেলে তো বাবাকে দেখতে পেতুম।'

বোধহয়, এই সময়কারই লেখা আরেকটি কবিতা থেকে রিয়োকোয়ানের মনের সংগ্রাম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে :

এই যে জীবন, এই যে মৃত্যু প্রভেদ কোথাও নাই,
যে জন জানিল তার কাছে বাঁচা হয়ে ওঠে মধুময়।

www.pathagar.com

কিন্তু হায় রে মাটি দিয়ে গড়া অন্ধ আমার হিয়া
ফিরে চারিদিকে— রিপুর ঝঞ্ঝা যখন যেদিকে বয়।
দুর্বার রণ! তার মাঝখানে শিশু আমি, অসহায়
ধুক্‌ধুক্‌বুকে বাজে 'ভুল' বাজে 'ঠিক'—
চরম সত্য স্মরণ ছাড়িয়া লুপ্ত হয়েছে হায়!

এই দ্বন্দ্বই তো চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সর্বদেশের সর্বকালের বহু লোক এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সত্য দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আমার রিপু যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে— এই প্রতিবন্ধক ভিতরের না বাইরের, তাতে কিছুমাত্র আসে-যায় না, রাধার বেলা শাশুড়ি ননদী, হাফিজের বেলা—

প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মতো ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে!

এ দ্বন্দ্বের তুলনা দিয়েছেন সব কবিই আপন হৃদয় দিয়ে। পূর্ববঙ্গের কবি হাসান রাজা চিঁড়ে-ভানার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন—

হাসনজানের রূপটা দেখি ফাল্‌দি ফাল্‌দি উঠে
চিঁড়া-বারা হাসন রাজার বুকের মাঝে কুটে।

রিয়োকোয়ান কান পেতে বুকের ধুকধুকে শুনতে পেয়েছেন 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক'!

এ তো গেল রিয়োকোয়ানের মনের দ্বন্দ্বের কথা, কিন্তু বাইরের দিকে রিয়োকোয়ানের জীবন অত্যন্ত সহজ গতিতেই চলেছিল। আহার শয়ন বাসস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে সন্ন্যাস আশ্রমের অভাব-অনটন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবন সম্বন্ধে জাপানে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং সে গল্পগুলোর ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রমণ রিয়োকোয়ান আর কিছু না হোক, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিলাস-ব্যসনের মোহ সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই গল্পগুলোর কয়েকটি অনুবাদ করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃদ্ধ বয়সে রিয়োকোয়ান স্বগ্রামের দিকে ফিরে আসেন, আর পাশের পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই জরাজীর্ণ গৃহে বহুকাল ধরে কেউ বসবাস করেনি, তার অর্ধেক ধসে গিয়েছে, বাকিটুকু লতাপাতার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ফিশার বলেন, বহু বৎসরের পরিভ্রমণে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমণের কাছে এই ধ্বংসস্তূপই শান্তিনীড় বলে মনে হল।

এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ফিশার দীর্ঘ আলোচনা করেননি। আমাদেরও মনে হয়, করার কোনও প্রয়োজন নেই। গৃহী হোন আর সন্ন্যাসই হোন, বার্ধক্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন। রিয়োকোয়ানের বেলা শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, সর্বসঙ্ঘের দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমণমণ্ডলীর প্রধান তো হতে চানই নি[১], এমনকি কারও সেবা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

---

১. জাতকের গল্পে আছে, এক বৃদ্ধ শ্রমণ কোনও সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলে সেই সঙ্ঘের প্রধান শ্রমণ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। হয়তো জাতকের এই গল্পটি রিয়োকোয়ানের অজানা ছিল না, ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জাতক বৌদ্ধধর্মের কতখানি স্থান অধিকার করেছে, সেকথা অমরাবতী, সাঁচীর ভাস্কর্য-স্থাপত্য দেখলে আজও চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

রিয়োকোয়ানের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পেয়ে তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি।

বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

এই সময়ের লেখা একটি কবিতাতে রিয়োকোয়ানের শান্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :

এই তো পেয়েছি শান্তিনিলয়, খরতাপ হেথা নাই,
জীবন-সাঁঝের শেষ কটি দিন কাটাব হেথায় আমি
স্বপ্নের মোহে, কল্পনা বুনে। গাছেতে ছায়াতে হেথা
আমারে রাখিবে সোহাগে ঘিরিয়া— কাটাব দিবস-যামী।

কিংবদন্তিচয়ন

লুকোচুরি খেলা

রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলেপিলেদের নিয়েই বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন। ফিশার বলেন, তিনি কোনও জায়গাতে কিছুদিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত। ফিশার বলেননি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতিও তাঁকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা' কবিতাটি আমার মতের সায় দেবে।

রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তার ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল। রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর আনন্দের সীমা নেই। বেশি ঝুলোঝুলি করতে হল না। রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ি, তার ওপর পেয়েছেন মৃদঙ্গের তাল। তদ্দণ্ডেই খেলাতে যোগ দিলেন। খেলাটা বনের ভিতর ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে সেখানে উপস্থিত। সবাই হেথায় হোথায় লুকালো। রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত— তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে। ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা ঝোলা আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাঁকে কেউ কক্‌খনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই-বা কী, তাঁর তো মুখ ঢাকা, চিনবে কী করে?

খেলা চলল। সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়োকোয়ান যে কুঁড়েঘরে লুকিয়ে ছিলেন, সেকথা কারও অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, 'দেখি, আমরা সবাই চুপচাপ বাড়ি চলে গেলে কী হয়?'

রিয়োকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেলবেলাটা কাটালেন— পরদিন সকালবেলা কাঠুরের বউ ঘরে ঢুকে চমকে উঠে বলল, 'ওখানে কে ঘুমুচ্ছে হে?' তার পর চিনতে পেরে থ' হয়ে বলল, 'সে কী, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! আপনি এখানে কী করছেন?'

www.pathagar.com

রিয়োকোয়ান আস্তিন-ফাস্তিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে চুপ, চুপ, চুপ। ওরা জেনে যাবে যে। বুঝতে পার না !'

'চলো' খেলা

রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়েরা হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সেকথা সবাই জানে, আর পাঁচজনও তাঁকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কী সম্পদ ছিল মানুষ তাকে ঠকাবার চেষ্টা করবে? ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশি কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে-তাকে কবিতা দিতে রাজি হতেন না, বিশেষ করে যারা তাঁর কবিতা বিক্রি করে পয়সা মারার তালে থাকত, তাদের ফন্দি-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সবসময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশি, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু একবার।

জাপানে 'চলো' খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোনও খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাধাসাধি করতে হত না।

রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, 'এস, "চলো" খেলা খেলবে?' রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজি । মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, 'কিছু একটা বাজি ধরে খেললে হয় না? তা হলে খেলাটা জমবে ভালো।'

রিয়োকোয়ান বলেন, 'তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তা হলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জামা দেবে—শীতটা তো বেড়েই চলেছে।'

মনসুকে বললেন, 'বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি?'

রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই-বা কী, দেবেনই-বা কী? বললেন, 'আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।'

মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফুর্তি চেপে বললেন, 'তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও তাতেই আমি খুশি হব।' রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজি হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকোয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরু, আবার রিয়োকোয়ানের হার হল। করে করে সবসুদ্ধ আট বার খেলা হল, রিয়োকোয়ান আট বারই হারলেন। এবার চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার যো নেই।

রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন :

'চিনি মিষ্টি
ওষুধ তেতো।'[১]

মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত হয়নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, 'কিন্তু "চলো" খেলা কি সব বারই একইরকমের হয় না? তাই একই কথা আট বার লিখে দিয়েছি।'

১. খুব সম্ভব কবিতাটির গূঢ়ার্থ, 'বাজি জেতাতে বড় আনন্দ, আর বাজি হারাতে খুব দুঃখ।'

www.pathagar.com

কুড়িয়ে-পাওয়া

রিয়োকোয়ানকে কে যেন একবার বলেছিল রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারি আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেইকথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, 'একবার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কী আনন্দ লুকানো আছে।' রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পয়সা পেয়েছিলেন। এগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছড়িয়ে ফের তুলে নিলেন। অনেকবার ছড়ালেন, কুড়ালেন, কিন্তু কোনওরকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, 'এটা কীরকম হল? আমায় সবাই বলল, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারি ফুর্তি, কিন্তু আমার তো কোনও ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠকাবার লোক নয়।' আরও বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোনও সুখই পেলেন না। এইরকম করতে করতে শেষটায় বেখেয়ালে সবকটি পয়সাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।

তখন তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'এইবারে বুঝতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈকি।'

ধূর্ত নাপিত

রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসৃষ্টি হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ যোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দু পয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এসব লেখা বিক্রি করতেন না— গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা করতেন।

শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতোই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড্ড বেশি জ্বালাতন করলে তিনিও 'দেব' 'দিচ্ছি' করে কোনও গতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।

শেষটায় ধূর্ত নাপিত একদিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বললে, 'ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকি অর্ধেক আর কামাব না।' এরকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কী আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে মাথাটি মুড়িয়ে— উভয়ার্থে— আশ্রমে ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙাল— ভাবখানা এই, সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মতো শ্রমণ তাকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।

কিন্তু খদ্দেরদের ভিতর দু-চারজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকায়ানের ভুল দেখিয়ে শুদ্ধ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, 'ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ওরকম ধারা করেছি। তুমি আমার মাথা অর্ধেক কামিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে দিইনি। আর ওই যে বুড়ি আমাকে সিম বিক্রি করে সে

www.pathagar.com

সর্বদাই আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বুড়িকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এস।'

তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে হাসলেন।

রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি

শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরনের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন 'চলো' খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ খেলাতে হারেন বলে সকলেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।

তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজির পর বাজি তিনি জিতে চললেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভারি খুশি— রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়িতে আর জিতে জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার একটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এরকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্রত্ব কী করে বজায় রাখা যায় আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনে।'

রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারি লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনও-গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়িতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিগ্যেস করলেন, 'কী করেছ, খুলে বল।' রিয়োকোয়ান বললেন, 'ভারি বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কী যে করব ভেবেই পাচ্ছিনে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাতলাতে পার? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশি করতে হবে।'

কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা বুঝতে পারেননি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, 'তাই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।'

রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরদিন ভোরবেলা দু জনা মোড়লের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, এরকমভাবে গম্ভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উদ্বেগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাঁকে মাপ করতে রাজি আছেন। তদ্দণ্ডেই দুশ্চিন্তা কেটে গেল আর মহা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজির। তোমিতোরি প্রচুর খাতিরযত্ন করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশিতে সবকিছু বেবাক ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, 'এস, "চলো" খেলা আরম্ভ করা যাক।'

রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন। খেলা আরম্ভ হল।

এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন।

www.pathagar.com

কী বিপদ

রিয়োকোয়ান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে ভালোবাসতেন। তারা মাঝে মাঝে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করত।

কথা নেই বার্তা নেই একদিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও।' (রায়ো মুদ্রার দাম প্রায় চার টাকার মতো)। রিয়োকোয়ান তো অবাক। এক রায়ো? বলে কী? তাঁর কাছে দু গণ্ডা পয়সা হয় কি না-হয়।'

ছেলেরা ছাড়ে না। আরেক জন বলল, 'আমাকে দুটো রায়ো দাও'। কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে। নিলামের মতো দাম বেড়েই চলল আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাত দু খানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবেন কোথায়?

যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগুল হয়ে ছিল। রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এরকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, 'ও ঠাকুর, ওঠ। এরকম করছ কেন?' কোনও সাড়াশব্দ নেই। আরও কাছে এগিয়ে এসে দেখে তাঁর চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়াচড়া নেই।

ভয় পেয়ে সবাই কানের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, 'ও ঠাকুর, ওঠো। ওরকম ধারা করছ কেন? তখন কেউ কেউ বলল, 'ঠাকুর মারা গিয়েছেন।' দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।

যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক, ঠাকুর তা হলে মারা যায়নি। সবাই তখন তাঁর আস্তিন ধরে ঝুলোঝুলি করে চেঁচাতে লাগল, 'ঠাকুর মরে যাননি, ঠাকুর বেঁচে আছেন।'

রায়োর কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে। কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

*　　　*　　　*

ফিশার আরও বহু কিংবদন্তি উদ্ধৃত করে তাঁর পুস্তিকাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন। সেগুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসর্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণিজগৎ নিয়ে দিনযাপন করেছেন। কিংবদন্তির চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশি।

বস্তুত, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তাঁর কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হাল্কা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনও প্রকৃত সমঝদার যদি এই গুরুভার গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

www.pathagar.com

মহা পরিনির্বাণ

ভিক্ষুণী তেইশা (তাইশিন) রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সেকথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তেহাত্তর বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ, তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশা গুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই—

নয়ন আমার যার লাগি ছিল তৃষাতুর এতদিন
ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন
তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা
তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।
এতদিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে আজ
শান্তি বিরাজে ঝঞ্ঝা-মথিত ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝ ॥

শেষ দিন পর্যন্ত তেইশা রিয়োকোয়ানের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। গুরুর মন প্রসন্ন রাখার জন্য তেইশা সবসময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিশার তাঁর পুস্তকে সে বেদনার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন।

শেষ মুহূর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত এখনও রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—

নলিনীর দলে শিশিরের মতো মোদের জীবন, হায়—
শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সমুখ পানে।
আমার জীবন তেমনি কাটিল, এবার হয়েছে শেষ
কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে— চলে যাবে কোনখানে!

রিয়োকোয়ান শান্তভাবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারীহৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সেকথা তেইশার ওই সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায় :

গভীর দুঃখে, হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে
এ মহাপ্রয়াণ দুর্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে।
সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্রভেদ কিছুই নেই
তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।

এ কবিতা পড়ে আমাদের মতো গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শান্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এরকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনও গতিকে শেষ পর্যন্ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মতো খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায়? ঋষি বলেছেন, 'একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়'; কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্রয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল।

www.pathagar.com

জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন—

রক্তপদ্মপত্রের মতো মানব জীবন ধরে,
একে একে সব খসে পড়ে ভূমি 'পরে
ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন
সেই তো জীবন।

কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ওপারের যাত্রী— তাঁর দুঃখ কিসের? বিরহবেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল।

'— কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অণুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?' (রবীন্দ্রনাথ)

তাই ফিশার বলেন, 'শত শত লোক শ্রমণের শবযাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল। আর যে সব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলাধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার।'

ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে—

চলে যাব যবে চিরতরে হেথা হতে
স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাব কোন পথে?
কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু
পেলব-কুসুম মুকুলিত মঞ্জরি
নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা
কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি
রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মেপল লইবে পরে
এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে।
এরাই তখন কহিবে আমার কথা।
ফুল্লকুসুম মুখর কোকিল যথা।
রক্তবসনা দীপ্তা মেপল শাখা
প্রতিবিম্বিত আমার আত্মা— এদেরই হিয়ায় আঁকা।

ফুটবল

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যে মশাই দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছিলেন; আমিও দূর থেকে বিস্তর সিনেমা-স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ওঁদের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদগদ হয়ে মনে মনে ওঁদের পেন্নাম জানিয়েছি।

তাই কী করে যে 'ইস্টবেঙ্গল' ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনও সমঝে উঠতে পারিনি। তবে শুনেছি আমরা যেরকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুশি হই, সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে

www.pathagar.com

কৌতূহলের সঙ্গে তাকায়— তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যেদিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমতো মনমরা হয়ে যায়। (আরও শুনেছি, একটা খাঁচার গোটাকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল— তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।)

তাই যখন 'ইস্টবেঙ্গলে'র গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন তখন আমি খুশি হলুম বইকি। তার পর তাঁদের মাধ্যমে আর সকলের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেল। সবকটি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নম্র। আমি বরঞ্চ সদম্ভে তাঁদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলার 'বি' টিমের খেলাতে কীরকম কায়দাসে একখানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইড্ গোল ছিল।

কেউ কেউ জিগ্যেস করলেন, আমি তাঁদের খেলা দেখতে যাব কি না? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাব। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তো যে-করেই হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে— বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুশি করার জন্যই তাঁদের কী বিপুল আগ্রহ!

ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

* * *

দিল্লিতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনেরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিব্য সিট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে— সিটিফিটি দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ও ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, 'আরে বাপু, মুখে আঙুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন? রবিঠাকুরের "ডাকঘর" দেখতে গেলেই পারিস।'

খেলা দেখতে এসেছে বাঙালি— তাদের অধিকাংশ আবার পদ্মার ওপারের— আর মিলিটারি; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারি এসেছে গোর্খা টিমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কী করতে গিয়েছি সে কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে 'মোহনবাগান' কিংবা 'কালীঘাট' ফ্যান ছিলেন না, সে কথা বলব না, তবে কলকাতা থেকে এত দূর বিদেশে তাঁরা তো আর গোর্খাদের পক্ষ নিতে পারেন না। 'দোস্ত নিস্ত, লেকিন দুশমন ই-দুশমন হস্ত' অর্থাৎ 'মিত্র নয়, তবে শত্রুর শত্রু' এই ফারসি প্রবাদ সর্বত্র খাটে না।

পিছনে দুই সর্দারজি বড্ড ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ইস্টবেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লাক্সে কপাল জোরে, ওরা নাকি বড্ড রাফ খেলে (সবুট গোর্খার সঙ্গে রাফ্ খেলবে ইস্টবেঙ্গল!) আর পদে পদে নাকি অফসাইড্। ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে দু ঘা বসিয়ে দিই কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।

* * *

খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল ইস্টবেঙ্গল নিশ্চয় জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোর্খারা গোটা চারেক ফাউল করলে আর ইস্টবেঙ্গল গোটা তিনেক গোল দেবার মোকা নির্মমভাবে মিস করল। একবার তো বলটা গোলবারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোললাইনের উপর। গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেলে। আমি

www.pathagar.com

দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম, 'হে মা কালী, বাবা মৌলা আলী তোমাদের জোড়া পাঁঠা দেব, কিন্তু এরকম আস্কারা দিয়ে মস্কোরা কোরও না, মাইরি।' বলেই মনে পড়ল 'মাইরি' কথাটা এসেছে 'মেরি' থেকে। থুড়ি থুড়ি বলে 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী'কে স্মরণ করলুম।

হাফটাইম হতে চলল গোল আর হয় না— এ কী গব্বযন্ত্রণা রে, বাবা। ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে— রেফারি দেখলুম বেজায় দড় লোক। কেউ ফাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দু কথা শুনিয়েও দেয়। জিতা রহো বেটা। ফাউলগুলো সামলাও, তার পর ইস্টবেঙ্গলকে ঠ্যাকাবে কেডা।

না; হাফটাইম হয়ে গেল। খেলা তখনও আঁটকুড়ি— গোল হয়নি।

ওহে চানাচুর-বাদাম-ভাজা, এদিকে এস তো, বাবা। না, থাক, শরবতই খাই।

চেঁচাতে চেঁচাতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। চ্যালাই পয়সাটা দিল; তা দেবে না? যখন হুইসিল দিতে জানে না! রেফারি আর ক বার হুইসিল বাজাল? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।

* * *

হাফটাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন। গপাগপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই ধরার মতো গোল মারা।

আমি তো খেলার রিপোর্টার নই, তাই কে যে কাকে পাস করল, কে কতখানি প্যাটার্ন উইভ করল, কে ক জন দুশমনকে নাচাল লক্ষ করিনি, তবে এটা স্পষ্ট দেখলুম, বলটাই যেন মনস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোর্খার গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। একে পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনও-বা তিন কদম পেছিয়ে গিয়ে, কখনও-বা কারও দুপায়ের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে বলটা হঠাৎ দেখি, ধাঁই করে হাওয়ায় চড়ে গোর্খা গোলের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনসিলে এসে আটকে গিয়েছে—বিকৃত-স্বরে বেরুল 'গো— অ— অ— ল!' ('রূপদর্শী' দ্রষ্টব্য)।

ফুটবল ভাষায় একটি তীব্র 'সট'-এর ('Sot'— Shot নয়) ফলে গোলটি হল।

পিছনের সর্দারজি বললেন, 'ইয়ে গোল বচানা মুশকিল নহি থা।'

আমি মনে মনে বললুম, 'সাহিত্যে একে আমরা বলি, "মুখবন্ধ"। এরপর আরও গোটা দুই হলে তোমার মুখ বন্ধ হবে। লোকটা জোরালো না হলে—।'

* * *

এসব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা রসের গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখল, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল! সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বাঁচাতে পারত না। দশটা গোলি লাগিয়ে দিলেও না। এবার ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম। ভারি খুশি। আমায় বলল, 'প্রত্যেক গোলে আপনার রি-অ্যাকশন লক্ষ করছিলুম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছি)— আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলুম ওরা ফাইনাল জিতবেই)।' তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকাল।

মোরগ যেরকম গটগট করে গোবরের ঢিপিতে ওঠে আমি তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।

www.pathagar.com

তার পর শাঁ করে আরও একখানা।

দশ-বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি, নির্ভেজাল গোল!

পিছনের সর্দারজি চুপ।

চ্যালাকে বললুম, 'চল বাড়ি যাই। খেলা কী করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো!'

রাত্রে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ঢাউস ট্রফি। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, 'বাচ্চাটাই ভালো। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।'

ওদেরই বিস্তর নাইন-নাইন্টি পুড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

বেমক্কা

বন্ধুবর

গুলাম কুদ্দুসকে—

লোকসঙ্গীত ও বিদগ্ধ সঙ্গীতে যে পার্থক্য সেটা সহজেই আমাদের কানে ধরা পড়ে, তেমনি লোকসাহিত্য ও বিদগ্ধ সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা বিলক্ষণ সচেতন। আর্টের যে কোনও বিভাগেই— নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য— তা সে যাই হোক না কেন, এই বিদগ্ধ এবং লোকায়ত রসসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি।

তাই বলে লোকসঙ্গীত কিম্বা গণসাহিত্য নিন্দনীয় একথা কোনও আলঙ্কারিকই কখনও বলেননি। বাউল ভাটিয়াল বর্বরতার লক্ষণ কিম্বা বারমাসী যাত্রাগান রসসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, একথা বললে আপন রসবোধের অভাব ঢাক পিটিয়ে বলা হয় মাত্র।

কিন্তু যখন এই লোকসংগীত বা লোকনৃত্য শহরের মাঝখানে স্টেজের উপর সাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বরে শোনানো এবং দেখানো হয়, তখনই আমাদের আপত্তি। যখনই বলা হয় এই সাঁওতাল নাচের সামনে ভরতনৃত্যম হার মানে কিম্বা বলা হয় এই 'রাবণবধ' পালা 'ডাকঘরে'র উপর ছক্কাপাঞ্জা মেরেছে— তোমরা অতিশয় বেরসিক বর্বর বুর্জুয়া বলে এ তত্ত্বটা বুঝতে পারছ না, তখন নিরীহ বুর্জুয়া হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি না করে থাকতে পারিনে।

কথাটা খুলে বলি। লোকসঙ্গীত (এবং বিশেষত গণনৃত্য) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পার্থক্য অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু একটা পার্থক্য এ স্থলে বলে নিলে আমার প্রতিবাদের মূল তত্ত্বটা পাঠক সহজেই ধরে নিতে পারবেন; এই ধরুন, সাঁওতাল কিম্বা গুজরাতের গরবা নাচ। এগুলো গণনৃত্য এবং এর সবচেয়ে বড় জিনিস এই যে, এ নাচে সমাজ বা শ্রেণির সকলেই হিস্যাদার। চাঁদের আলোতে, না-ঠাণ্ডা না-গরম আবহাওয়াতে জনপদবাসী যখন দু দণ্ড ফুর্তিফার্তি করতে চায়, তখন তারা সকলেই নাচতে শুরু করে। যাদের হাড় বড্ড বেশি বুড়িয়ে গিয়েছে তারা ঘরে শুয়ে থাকে, কিন্তু যারা আসে তাদের কেউই নাচ থেকে বাদ যায় না। হয় নাচে, না হলে ঢোল বাজায়— বাচ্চা কোলে নিয়ে আধবয়সী মাদেরও নাচের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। তাই বলা যেতে পারে সাঁওতাল কিম্বা গরবা নাচ— অর্থাৎ তাবৎ গণনৃত্যই— নাচা হয় আপন আনন্দের জন্য— লোককে দেখানোর জন্য, কিম্বা 'লোক দেখানো'র জন্য নয়। অর্থাৎ লোকনৃত্যে দর্শক থাকে না।

www.pathagar.com

কিন্তু যখন উদয়শঙ্কর নাচেন তখন আমরা সবাই ধেই ধেই করে নেচে উঠিনে, কিম্বা যখন খানসাহেব চোখ বন্ধ করে জয়জয়ন্তী ধরেন তখন আমরা আর সবাই চেল্লাচেল্লি করে উঠিনে। ইচ্ছে যে একদম হয় না সে কথা বলতে পারিনে, তবু যে করিনে তার একমাত্র কারণ উদয়শঙ্করের সঙ্গে পা মিলিয়ে কিম্বা খানসাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রসসৃষ্টি আমরা এক মুহূর্তের তরেও করতে পারিনে। (যদি পারতুম তবে উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য, খানসাহেবের গান শুনবার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতুম না— কিম্বা বলতে পারেন, সিঙ্গীর গলায় আপন মাথা ঢোকাতে পারলে সার্কাসে যেতুম না)।

তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের জন্য শ্রোতা এবং দর্শকের প্রয়োজন।

লোকনৃত্যে যখন সবাই হিস্যা নিতে পারে আপন পা চালিয়েই, তখন একথা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন যে, সে নৃত্য খুব সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ থাকার কথা নয়, ভাবভঙ্গি প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্য মুদ্রা সেখানে থাকতেই পারে না এবং তাই বলা যেতে পারে, সে নৃত্যে আর যা থাকে থাকুক, বৈচিত্র্য থাকতে পারে না।

তাই গণনৃত্য মাত্রই একঘেয়ে।

কম্যুনিস্ট ভায়ারা (কমরেডরা) মনস্থির করেছেন গণ-কলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং সেই গণনৃত্য শহুরে বুর্জুয়াদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। তাই মেহন্নত, ততোধিক তকলিফ বরদাস্ত করে তাঁরা শহরে স্টেজ খাটান, পর্দা ঝোলান, রঙ-বেরঙের আলোর ব্যবস্থা করেন আর তার পর চালান হৈদ্রাবাদী কিম্বা কুয়াম্বতুরেরও হতে পারে— জানিনে, ধোপার নাচ। কিম্বা গুজরাতি গরবা। বলেন, 'পশ্য, পশ্য'— থুড়ি, 'দ্যাখ, দ্যাখ, এরই কয় লাচ।'

পূর্বেই নিবেদন করেছি গণনৃত্য নিন্দনীয় নয়, কিন্তু যে গণনৃত্য একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হতে বাধ্য, সেই নাচ দেখতে হবে ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে? ঘন ঘন হাততালি দিয়ে বলতে হবে 'মরি, মরি'? দু চার মিনিটের তরে যে এ নাচ দেখা যায় না, সেকথা বলছিনে।

আলো-অন্ধকারে ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছেন, দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, চাঁদ উঠি উঠি করেও উঠছেন না— এমন সময় দেখতে পেলেন গাঁয়ের মন্দিরের আঙিনায় একপাল মেয়ে মাথায় ছ্যাঁদাওলা কলসিতে পিদিম রেখে চক্কর বানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দমধুর পা ফেলে নাচছে। জানটা তর হয়ে গেল। দু মিনিট দাঁড়িয়ে আলোর নাচ আর মেয়েদের গান, 'সোনার দেওর, আমার হাত রাঙাবার জন্য মেহেদি এনেছ কি?' দেখে নিলেন। কিন্তু তার পর? যে নাচ আস্তে আস্তে বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় না, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, পদবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে নাচ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছয় না, সে নাচ দেখবেন কতক্ষণ ধরে? এ নাচের পরিসমাপ্তি কোনও রসসৃষ্টির অভ্যন্তরীণ কারণে হয় না; এর পরিসমাপ্তি হয় নর্তকীরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখনই।

আলো-অন্ধকার, চাঁদ উঠি উঠি, শ্যাওলামাখা ভাঙা দেউলের পরিবেশ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে আসা নৃত্য শহরের স্টেজে মূর্ছা তো যায় বটেই, তার ওপর মাইক্রোফোনযোগে চিৎকার করে তারস্বরে আপনাকে বলা হয় 'এ নাচ বড় উমদা নাচ।' এ নাচ আপনাকে দেখতে হয় আধঘণ্টা ধরে! আধঘণ্টা ধরে দেখতে হয় সেই নাচ, যার সর্ব পদবিন্যাস মুখস্থ হয়ে যায় আড়াই মিনিটেই।

www.pathagar.com

পনেরো টাকার সিটে বসে (টাকাটা দিয়েছিলেন আমার এক গোলাপি অর্থাৎ নিম-কমুনিস্টি কমরেড) আমি আর থাকতে না পেরে মুখে আঙুল পুরে সিটি দিয়েছিলুম প্রাণপণ। হৈ হৈ রৈ রৈ। মার মার কাট কাট। এ কী বর্বরতা?

আমি বললুম, 'কেন বাওয়া, আপত্তি জানাবার এই তো প্রলেটারিয়েটস অব দি প্রলেটারিয়েট কায়দা।'

আমরা হাসি কেন?

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্যপ্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, 'আমরা হাসি কেন?'

এতদিন বাদে আজ আর সবকথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যেসব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্রবন্ধটি মোটের ওপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, 'আমরা হাসি কেন?' যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনও পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখে জল বেরিয়ে গিয়েছিল।' (ঠিক কী ভাষায় তিনি জিনিসটে রসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই— আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

* * *

দিল্লির ফরাসিস ক্লাবের ('সের্কল ফ্রাসেঁ' অর্থাৎ 'ফরাসি-চক্র') এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসি গুণী গত বুধবার দিন ওই একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 'আমরা হাসি কেন?' একখানি প্রামাণিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসি রাজদূত এবং আরও মেলা ফরাসি জাননেওয়ালা ফরাসি অ-ফরাসি ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসি কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নতুন কথা নয়— এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেয়েছিলেন—

ল্যামা ইসটিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয় আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন 'কোতি' 'উবিগাঁর' খুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডা. কেসকর উত্তম ফরাসি বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রাঞ্জল ফরাসিতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

সেই বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারণানুসন্ধান, 'হাসি কেন?' আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম— ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেরকম ধারা হয়েছিলুম— কিন্তু তবু কোনও হদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লির শহর যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি। তার হিসেব-নিকেশ এখনও আরম্ভ হয়নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ স্টু, মাটন রোস্ট আর প্লাম পুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট। তার পর যেদিন উত্তম ফরাসি রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসাঁ রুটি কীরকম উপাদেয়, একটি মামুলি অমলেট বানাতে ফরাসি কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপূর্ব স্যালাড্ নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায় সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসি রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এ দেশে বসেই হবে।

সের্কল ফ্রাসেঁ দিল্লিবাসীকে তার জন্য তৈরি করে আনছেন।

* * *

প্রবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন যে জিনিস তো আর কালি-কলমে ওতরাবে না— তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন। এক রমণী গিয়েছেন এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধঘন্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অতি কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, 'ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।'

ডাক্তার বললেন, 'ও! তাঁর কী হয়েছে?'

রমণী বললেন, 'ঠিক ঠিক বলতে পারব না তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সিল মাছ।'

'বলেন কী? তা, তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি বারান্দায় বসে আছেন।'

'তাঁকে নিয়ে আসুন তো, দেখি, ব্যাপারটা কী।'

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সিল মাছ।

www.pathagar.com

গাইড

দিল্লিতে একটি সরকারি টুরিস্ট ব্যুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা-সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লিতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্রলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'পাণ্ডা' এবং 'গাইড' হরেদরে একই মাল। তীর্থস্থানের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়— তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন, পাণ্ডা আপনাকে ধরে— আর ঐতিহাসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যদি সমন্বয় ঘটে তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সমন্বয় হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহা ধর্ম— ক্রিশ্চান, ইহুদি এবং মুসলমান— এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। তার ওপর জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঁঠা) এবং টুরিস্ট (গাইডের কুরবানির বকরি) জেরুজালেমে না আসে।

দিল্লি অনেকটা জেরুজালেমের মতো। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতি সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের তিনজনের কবর দিল্লিতে। কুতুবমিনারের কাছে কুৎব উদ্‌দিন বখতিয়ার কাকির (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ুনের কবরের কাছে নিজাম উদ্‌দিন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলা উদ্‌দিন খিলজি এবং মুহম্মদ তুগলকের গুরু) আর দিল্লির বাইরে শেষ গুরু নাসির উদ্‌দিন 'চিরাগ দিল্লি'র কবর। আর কালকাজি, যোগমায়া তো আছেনই।

এসব জায়গায় পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে এটা হচ্ছে আকবরের দুধ-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারত!

বেঙ্গল কেমিকেলের আমার এক সুহৃদ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলনা— ভক্তিভরে বললে, এ দোলনায় দোল খেতেন রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বন্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহপিশাচ। বললেন, 'যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানির নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান!'

পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বন্ধু সে জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্রাণপণ পলস্তারার পর পলস্তারা রঙ লাগানো হচ্ছে।

* * *

দিল্লিতে ভালো গাইডের সত্যই অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালি লোক। তিনি কখনও কখনও ভালো গাইড পেয়ে যান— সে বিষয়ে তিনি 'দেশে' মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তারা না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছড়াতে গাঁজা-গুল।

www.pathagar.com

ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিম্বদন্তি মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সেসব গল্প শুনে আপনি এত খুশি যে দিনের শেষে তাঁকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচকচ করে না।

একদা ভিয়েনা শহরে আমি এইরকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বলল, 'এই দেখুন শ্যোনব্রুন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রান্ৎসয়োসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পল্টনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারি রাজকর্মচারী রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য-বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তার পর হুজুর বেরুতেন সোনার পাত মোড়া গাড়িতে, বিবি সাহেবা বেরোতেন রুপোর গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সেসব দিন!'

খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, 'দেখুন দেখুন, এই ছোট্ট বাড়িখানা, ফ্রান্ৎসয়োসেফ যেরকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্যে-ক্লেশে কাতর হয়ে এই লজঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কটি সিম্‌ফনি— সেই ত্রিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুন— তিনি এইখানেই রচেছিলেন।'

আমি করজোড়ে সে বাড়িতে নমস্কার করলুম দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, 'একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়িতে দেহত্যাগ করেছিলেন সেইটে দেখিয়ে দাও।'

সে বাড়ির সামনে আমরা দু জনাই নিস্তব্ধ। এই জীর্ণ-শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন!

* * *

আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছা, ওই পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকেন, খাণ্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে।'

আচার্য তুচ্চি

দিল্লির ইন্ডিয়ান কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্পে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভাস্থলে ইতালির রাজদূত ও শ্রীযুক্তা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধহয় আর কারওর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যেসব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতি এবং চীনা অনুবাদে এখানে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চি নানাপ্রকারের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে

www.pathagar.com

পারব না কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনও অটুট; তাই আশা করা যেতে পারে, তিনি আরও বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।

* * *

ইতালির ইস্কুলে থাকতেই তুচ্চি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকার পূর্বেই তাঁর *মহাভারত, রামায়ণ* ও কালিদাসের প্রায় সবকিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল— টোলে না পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেই কটি ছেলে করতে পেরেছে? কলেজে তুচ্চি সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশের সংস্কৃতচর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তাঁর অন্যতম সার্থক শিষ্য।

* * *

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশ চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চিকে। ১৯২৫-এ এঁরা দু জন ভারতবর্ষে আসেন।

অধ্যাপক ফরমিকি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'জানো, সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে কাব্যনাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়— তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শান্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণতজ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।'

এবং আশ্চর্য, আমার মতো মূর্খদেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর— কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনও জানতুম না, এখনও জানিনে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহ্নের বাড়ির বারান্দায় মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদান্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কী অদ্ভুত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে, অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি স্নেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই সাংখ্য বেদান্তের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।

হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালেসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছু-পা হত সেকথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

* * *

গুরু পড়াতেন সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতেন ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুন্‌দ্‌জিয়ো পড়ব।

তুচ্চি বললেন, 'উপস্থিত মাদ্‌জিনি পড়।'

www.pathagar.com

তার পর বুঝিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছ। তোমাদের চিন্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কী, স্বাধীনতা-সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদ্‌জিনি যেরকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যেরকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এরকম আর কেউ কখনও পারেননি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।'

হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শান্তসমাহিত গম্ভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন— তাঁর ধাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান আর মাদ্‌জিনির ভুবনবিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদ্‌জিনি পড়েছেন তাঁরাই জানেন— এমনকি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চার্চিল মাদ্‌জিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। তুচ্চি পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর দিক্‌চক্রবালের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে মাদ্‌জিনির ভাষায় বলতেন।

'আভান্তি, আভান্তি ও ফ্রাতেল্লি—'

'অগ্রসর, হও, অগ্রসর হও, হে ভ্রাতৃবৃন্দ—'

'আসবে সেদিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে— পিছনের সবকিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনও রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।'

এসব সাহসের বাণী সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলুম তাতে আর বিচিত্র কী?

* * *

তার পর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভারত-তিব্বত বহুবার ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতালির সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতালির প্রাচ্যবিদ্যমন্দির আচার্য তুচ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়, বাংলা, হিন্দি শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে, এবং চীনা, জাপানি, তিব্বতি ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তুচ্চি নিজে যেসব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যেসব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ গ্রন্থের আরও দু পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

* * *

সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, 'বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত-ইতালিতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সেকথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়), কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নতুন করে আমাদের ভাবের লেনদেন আদানপ্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

'আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি সেটিকে সফল করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।'

*　　　*　　　*

আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন ॥

নিশীথদা

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বার্থ দেশসেবক শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী-জ্ঞানী, বহু প্রখ্যাত কর্মী তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন— এমনকি, একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখেনি। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশস্তি কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।

আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনিনি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম বন্ধুরূপে তাঁর জীবন-অপরাহ্ণে। তিনি তখন কলকাতার ভিতরে-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কী বোঝায়। তার পর নানা রকম গালগল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বলল, "আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে কটু-কাটব্য আরম্ভ করেছ (আমি তখন 'সত্যপীর' নাম নিয়ে ওই কাগজে কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কী, 'সিডিশন', 'ডিফেমশন', 'মহারানির বিরুদ্ধে লড়াই', এসব জিনিসের অর্থ কী?" আমি কোনও কিছু বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, 'আমরাই জানিনে, উনি জানবেন কী করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলবার জন্য যেসব আইন-কানুন বানিয়েছে, সেগুলো কোন স্থলে প্রযোজ্য, কাকে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপ্পনী, নজির-দলিল ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধেমতো কখনও সেটা টেনে টেনে রবারের মতো লম্বা করে, কখনও ফাঁদ ঢিলে করে পাখিকে উড়ে যেতেও দেয়। এই দেখুন না, লোকমান্য টিলককে যে আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন ওরকম ধারা কাজে লাগানো যায়, সেকথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু টিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয় আর কিসে হয় না, সেকথা ঝানু উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলিপুর পাঠাবে তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে অনেক নতুন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা— অর্থাৎ উকিল ব্যারিস্টাররা— তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সবসময়ে যে হারি, তা-ও বলতে পারিনে।' তার পর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার ফোন নম্বরটা জানেন তো? কোনও অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আমি যা পারি করে দেব।'

www.pathagar.com

প্যারীদা কান পেতে শুনেছিল, লক্ষ করিনি। তক্ষুনি বললে, 'নম্বরটা টুকে নাও, ওহে আলী। কাজে লাগবে।'

পরের খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলিপুরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানা-অজানাতে কত অসংখ্যবার ফিস্ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠল।

কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।

নিশীথদা প্রায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কী করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলুম, তাঁকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি, সে শুধু যাঁরা নিশীথদাকে চিনতেন তাঁরাই বলতে পারবেন।

একই প্লেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়িতে উঠলুম। সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, 'কবি (বিশ্ব সাক্ষী, আমি কবি নই), চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এস।' বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম, তিনি নানারকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুজ্যে, আব্দুর রসুল এঁদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তানদের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।

আমি মূর্খের মতো মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেটের মতো আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদু হাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চুপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তার পর মাত্র একখানি চোখা যুক্তি দিয়ে আমাকে দু টুকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ বোধ হয়নি। তাই শেষের দিকে যখন যেসব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, সেখানেও আমি তর্কে হেরে যেতুম, তখন প্রতিবারে আনন্দ অনুভব করেছি, এই লোকটির সংস্রবে আসতে পেরেছি বলে।

কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ! আর কী একখানা স্নেহকাতর হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। আইন আদালতের খররৌদ্র তাঁর সে শ্যামমনোহর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারেনি।

তাঁর বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকালবেলা দেখি, ড্রেসিংগাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাইনে। কী হয়েছে, ব্যাপার কী নিশীথদা?

তিন দিন ধরে স্ত্রীর চিঠি পাননি।

সে কী নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?

সেই জ্বলজ্বলে চোখ— সে চোখদুটি কেউ কখনও ভুলতে পারে— দিয়ে বললেন, 'কবি, সব জান, সব বোঝ, কিন্তু বিয়ে তো করোনি, তা হলে এটাও বুঝতে।'

www.pathagar.com

নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরও কিছুদিন কেন এ সংসারে থাকলেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতিও যেন নিভে গিয়েছিল।

আজ বোধহয় নিশীথদার আর কোনও দুঃখ নেই— আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥

পরিমল রায়

পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লি শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল।[১] মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে, আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লিতেই ফিরে আসবেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তথা বাংলা সাহিত্যামোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পরিমল রায় সত্যই নানা গুণের আধার ছিলেন।

একদা 'মৌলানা খাফী খান' আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কী প্রকারে কলকব্জা কারখানা ফ্যাক্টরি তৈরি করার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনেছি। পরিমল রায় জানতেন, তাঁর শ্রোতারা অর্থনীতি বাবদে এক-একটি আস্ত 'বিদ্যাসাগর'; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল বক্তব্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার অলৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলুম। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করলুম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাঘা পণ্ডিতের মতো খেঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধাগুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর শ্রদ্ধার অন্ত রইল না। পণ্ডিতজনের বিনয় মূর্খের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপচারি হয়নি। তার কয়েকদিন পরে আরেক সভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিনতে পারছেন কি?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ'। আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তাঁর ভাষণের আটটি পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাতুর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

১. স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাই।

www.pathagar.com

কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যাঁরা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই উল্লসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনওগতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনও বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারি সাহিত্যসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলে তাঁর বেশি সময় কাটত অধ্যাপন-অধ্যয়নে। তার পর যেটুকু সময় বাঁচত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন।

এবং সকলেই জানেন সাহিত্যিকের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় রসের সন্ধানে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সেসব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধতিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।

এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাঁড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাংলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কথা বলতেন কম, আর তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর— একটুখানি রাশভারি বললেও হয়তো বলা ভুল হয় না। চপলতা না করেও যে মানুষ সুরসিক হতে পারে পরিমল রায় ছিলেন তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ; আমাদের নমস্য 'পরশুরাম' এস্থলে পরিমল রায়ের অগ্রজ।

আর যে গুণের জন্য পরিমল রায়কে আমি মনে মনে ধন্য ধন্য বলতুম সেটা তাঁর লেখনী সংযম। এ গুণটি বাংলা দেশে বিরল। ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারিনে। সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা যে কী কঠিন কর্ম সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এ গুণ আয়ত্ত করার জন্য বহু বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। তিন লাইনে যে নন্দলাল একখানা হাসিমুখ এঁকে দিতে পারেন কিম্বা একটি মাত্র 'সা' দিয়ে আরম্ভ করেই যে ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাপ্লুত করতে পারেন তার পশ্চাতে যে কত বৎসরের মেহন্নত আর হয়রানি আছে সে কি দর্শক-শ্রোতা বুঝতে পারে?

তাই আমার শোকের অন্ত নেই যে, বহুদিনের তপস্যার ফলে যখন পরিমল রায়ের আপন সংক্ষিপ্ত নিরলঙ্কার ভাষাটি শান দেওয়া তলওয়ারের মতো তৈরি হল, যখন আমরা সবাই এক গলায় বললুম, 'ওস্তাদ, এইবারে খেল দেখাও' ঠিক তখনি তিনি তলওয়ারখানা ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

এই তো সেদিনকার লেখা। একটি মোটা লোক রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁত ঘোঁত করে বেড়াতে বেরোন। আরেকটি রোগাপটকা পনপন করে সেই সময় বেড়াতে বেরোয়। একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোগা হবে, আরেকজনের বাসনা পনপনিয়ে সে মোটা হবে। ফলংঃ যথা পূর্বম তথা পরম্।

এ জিনিস চোখের সামনে নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। কিন্তু কই, আমরা তো লক্ষ করিনি। পরিমল রায় এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করে এমনি কায়দায় সামনে তুলে ধরলেন যে, এখন রোগা

www.pathagar.com

মোটা যে কোনও লোককে যখন ঘোঁতঘোঁত কিম্বা পনপন করতে দেখি তখন আর হাসি সামলাতে পারিনে।

আমার বড় আশা ছিল পরিমল রায় দেশে ফিরে এসে মার্কিনদের নিয়ে হাসির হর্‌রা, মজায় বাজার গরম করে তুলবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়, পরশুরাম এঁরা কেউ মার্কিন মুল্লুক যাননি। আশা ছিল পরিমল রায়ের মার্কিন বাস রসের বাজারে আসর জমাবে।

একটি আড়াই ছত্রের টেলিগ্রামে সব আশা চুরমার হল। কাকে সান্ত্বনা দিই? আমিই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিনে।

মপাসাঁ

বাংলায় বলি, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না', পদ্মার ওপারে বলি—

'পির মানে না দেশে-খেশে,
পির মানে না ঘরের বউয়ে',

আর পশ্চিমারা বলেন, 'ঘরকি মুরগি দাল বরাবর' অর্থাৎ ঘরে পোষা মুরগি মানুষ এমনি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যিকার ডাল-ভাত খাচ্ছে।

কিন্তু একবার গাঁয়ের কদর পাওয়ার পর আবার যে মানুষ গেঁয়ো যোগী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মপাসাঁ'র বেলায়।

মাস তিনেক পূর্বে মপাসাঁ'র কয়েকখানা চিঠি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারই সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসি একাডেমির সদস্য— অর্থাৎ তিনি অতিশয় কেষ্ট-বিষ্টু জন— মসিয়ো আঁদ্রে বিইঈ (Billy) মপাসাঁ সম্বন্ধে মিঠে-কড়া দু চারটি কথা বলেছেন।

এক ফরাসি সাহিত্য প্রচারক নাকি বিইঈকে বললেন, 'কেম্ব্রিজের ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে মপাসাঁ পড়ে, সে শুধু অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল নিয়ে।' (অর্থাৎ মপাসাঁ'র যৌন গল্পগুলোই তারা পড়ে বেশি)। উত্তরে বিইঈ বললেন, 'বিদেশিরা, বিশেষত কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের লোক আজকাল আর মপাসাঁ পড়ে না, তারা পড়ে প্রুস্ত, ভালেরি, মালার্মে, র‍্যাঁবো। মপাসাঁ'র কদর এখনও আছে জর্মনি এবং রাশায়। খোদ ফ্রান্সে ছোকরার দল তো মপাসাঁকে একদম পাঁচের বাদ দিয়ে বসে আছে। ভুল করেছে না ঠিক করেছে? কিছুটা ভুল কিছুটা ঠিক— কারণ মপাসাঁ একদিক দিয়ে যেমন অত্যাশ্চর্য কলাসৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে আবার অত্যন্ত যাচ্ছেতাইও লিখেছেন।'

এ সম্পর্কে মপাসাঁ'র চিঠি প্রকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক মেনিয়াল[১] বলেছেন, 'আমেরিকার লোক মপাসাঁ পড়ে উঁচুদরের ক্লাসিক হিসেবে। মপাসাঁ'র সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে সেখানকার ফরাসি পড়ুয়া মাত্রই আদর্শ রূপে মেনে নেয়। তাঁর ভাষায় স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আনতোঁল ফ্রাসেঁর মতো গুণী) আমেরিকাতে মপাসাঁ'র লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।'

১. M. Edouard Mayniai এবং Artine Artinian কর্তৃক প্রকাশিত Correspondance inedite.

www.pathagar.com

উত্তরে বিইঈ সাহেব অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন, 'জানতে ইচ্ছে করে, এখনও কি মার্কিন পাঠক মপাসাঁকে এতটা কদর করে? আর ইংলন্ডের অবস্থা কী? মেনিয়াল তো কিছু বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসাঁ'র লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসি ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।'

চলতে পারে, না-ও চলতে পারে। সেকথা উপস্থিত থাক। এরপর কিন্তু বিইঈ সায়েব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসাঁ ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য— ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছিলেন। বিইঈ বলেছেন, 'ফ্লবের তাঁর প্রিয় শিষ্যের কোনও দোষই দেখতে পেতেন না, কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসাঁ'র অত্যধিক (Surabondant— Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।'

এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে এ সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, 'আজকালকার ছোকরারা বড্ড বেশি বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বুই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন'খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।' মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন'খানা। কিম্বা বলতে পারেন পাঁচ দু গুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রইবে পেন্সিল!

মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার ত্রিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে ত্রিশ ভাগে কি শুধু তাঁর খারাপ লেখাগুলোই— বিইঈ'র বিচারে— পড়ত? কাটা পড়ত দুই-ই। তা হলে অন্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না। ইংরেজিতে বলে 'টবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না।' ফেলা যায় বলেই এ সতর্কবাণী!

ভালো লেখা বারবার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল।

কিন্তু মোদ্দা কথায় আসা যাক।

ইংরেজ, জর্মন, রাশান, স্পেনিশ, এমনকি আরবি, ফারসি, বাংলা, উর্দু নিন এমন কোন সাহিত্য আছে যে মপাসাঁ'র কাছে ঋণী নয়? ছোটগল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোটগল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁ'র কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁ'র কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মপাসাঁ'র কাছে ঋণী— যদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্তস্থলে— মপাসাঁ'র যেখানে ছিল কিঞ্চিৎ অনটন— তাই ছোটগল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নতুন রসবস্তু গড়ে তুললেন কবিতাতে সুর দিয়ে যেরকম ঐন্দ্রজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।

শেষ কথা কার ভাণ্ডার থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে? যে কোনও একখানা হেজিপেজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি মপাসাঁ'র লোপাট চুরি— দেশকালপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্য, মপাসাঁ'র বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সবচেয়ে বেশি কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সবকিছুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

এত চুরির পরও যাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ॥

www.pathagar.com

রামমোহন রায়

ভারত এবং আরব ভূখণ্ডের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা এখনও হয়নি। গোড়ার দিকে যেসব সংস্কৃত বইয়ের আরবি তর্জমা হয়, সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অনুবাদকদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান খুব গভীর ছিল না। পরবর্তী যুগে দেখা দিলেন এক পণ্ডিত, যাঁর সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন পণ্ডিত পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।

সেই দশম-একাদশ শতাব্দীতে যখন 'ম্লেচ্ছে'র পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোনও পন্থাই উন্মুক্ত ছিল না, তখন গজনির মামুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আল-বিরুনি, অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শিখে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গসুন্দর চর্চা করে আরবি ভাষাতে একখানা অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। বইখানি সে যুগের হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

পাঠান যুগে আরবি-ফার্সিতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত চর্চা হয়, কিন্তু আসল চর্চা আরম্ভ হয় আকবরের সময় এবং আল্-বিরুনির পর যদি সত্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান কেউ করে তবে যেতে হয় আকবরের পৌত্রের যুগে শাহ্জাহানের পুত্র দারা-শিকুহ'র কাছে। আরবি-ফার্সি-সংস্কৃত এ তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং ভক্তিমার্গে—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক— হেন সূক্ষ্মতত্ত্ব নেই, যা তাঁর পাণ্ডিত্যের চৌহদ্দির বাইরে পড়ে।

তার পর ভারতবর্ষের যে অবিশ্বাস্য অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসায়, সংস্কৃত এবং আরবি-ফার্সি কোনও গতিকে বেঁচে রইল মাত্র— এর বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

তার পর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এবং আমাদের পরম শ্লাঘার সম্পদ এই বাংলা দেশেই জন্মালেন এক বাঘা পণ্ডিত, এক জবরদস্ত মৌলবি— যিনি কি আল-বিরুনি, কি দারা-শিকুহ যে কারও সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা দ্বন্দ্ব নানা সংঘাতের ঊর্ধ্বে যে সত্যশিবসুন্দর আছেন, যাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যশিবসুন্দরকে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিতর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবি-ফারসি, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হিব্রু, গ্রিক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্ট— এই চার ধর্মজগতে তিনি অনায়াসে অতি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, অন্তরের খাদ্য অন্বেষণ করে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, তাই নয়, সে শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষ যে নব নব অভিযানের পথে বেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অদ্যকার জীবন্মৃত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কী বোঝায়, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনও হয়নি। 'দেশে'র এক পৃষ্ঠা সে কর্মের জন্য প্রশস্ত নয় এবং এ অধম সে শাস্ত্রাধিকার থেকে বঞ্চিত।

www.pathagar.com

নিপীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন, একথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজনমাত্রই নিপীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে সে নিপীড়ন এসেছিল, চাষিদের কাছ থেকে নয়— সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না— তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সর্বধর্মের পণ্ডিতগণ।

আরবি ভূমিকা (মুকদ্দমা) সম্বলিত তিনি যে ফারসি কেতাব রচনা করেন, তার নাম 'তুহফাতুল্ মুওয়াহ্হিদীন্' (একেশ্বরবাদীর উদ্দেশে উপঢৌকন) এবং সে গ্রন্থে তিনি আল্লার সত্যরূপের যে বর্ণনা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে বয়ান করলেন, সে রূপ সে বর্ণনা ক্রিয়াকাণ্ডে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলমান পণ্ডিতজনকে বিন্দুমাত্র উল্লসিত করেনি। পরবর্তী যুগে মৌলবি-মৌলানা, আলি-উলামা তাঁকে জবরদস্ত মৌলবিরূপে স্বীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে 'মুতাজিলা' (স্বাধীনচেতা)— গোঁড়ারা যেরকম ভদ্র ব্রাহ্মকে 'বেহ্মজ্ঞানী' নাম দিয়ে তাচ্ছিল্য করেন— নাম দিয়ে তাঁর সৎ ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছিলেন।

হুবহু সেই বিরুদ্ধাচরণই তো তিনি পেয়েছিলেন 'স্বধর্মী'দের কাছ থেকে। অদ্বৈতের অনুসন্ধান ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় ম্লেচ্ছাচারের মতো বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন— এ ইতিহাস সকলেই জানেন।

আবার হুবহু তৃতীয় দফায় তিনি বিরুদ্ধাচরণ পেলেন খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে। যে খ্রিস্টধর্ম তখন বাংলা দেশে প্রচারিত হচ্ছিল সে ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বা মুসলমান যে কোনও ধর্মের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে আধ্যাত্মিকতায় উৎকৃষ্ট ছিল না। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে রামমোহন যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আগের অনুসন্ধানে তিনি বাইবেলে যে খ্রিস্টকে আবিষ্কার করলেন, যে খ্রিস্ট 'কেরামতি' করেন না, অর্থাৎ তিনি জলকে মদ বানাবার ভেল্কিবাজি দেখান না, সাতখানা রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাও করেন না।

যে খ্রিস্টান মিশনারিরা এতকাল ধরে রামমোহনের কুসংস্কারবর্জিত স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরাই হলেন সবচেয়ে ক্রুদ্ধ। উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র ঘোষণা করলেন, 'রামমোহন মূর্খ, রামমোহন যিশুকে চিনতে পারেনি, অলৌকিক কর্ম (কেরামতি) বাদ দিলে যে যিশু দাঁড়ান, তিনি প্রকৃত যিশু নন।'

হিন্দু-মুসলমান সে যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের বিরুদ্ধ-ব্যবহার রামমোহনকে বিস্মিত কিংবা বিচলিত করেনি। কিন্তু খ্রিস্টানদের এ ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন— আজ ডিন ইনগ্ সেটা বুঝতে পারবেন।

তিন ধর্মের গলা মেলানো একই প্রতিবাদে রামমোহন বিচলিত কিংবা পথভ্রষ্ট হননি—সে আমাদের পরম সৌভাগ্য ॥

বিশ্বভারতী

কবি, শিল্পী— স্রষ্টামাত্রই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এবং সেই কারণেই আর পাঁচজনের তুলনায় এ জীবনে তাঁরা এমন সব বেদনা পান যার সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয় নেই। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়ী হতে হলে গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন— গণ্ডারের চামড়া নিয়ে কোনও কবি আজ পর্যন্ত সার্থক সৃষ্টি করে যেতে পারেননি।

www.pathagar.com

জীবনের বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ পান; তৎসত্ত্বেও বাংলা দেশ বহুদিন ধরে তাঁকে কবি বলে স্বীকার করতে চায়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে বহু গণ্যমান্য লোক এমন সব অন্যায় আক্রমণ এবং আন্দোলন চালান যে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো অল্পবয়সে কিটসের মতো ভগ্নহৃদয় নিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ যে বহু বেদনা পেয়েও কিটসের মতো ভেঙে পড়েননি তার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্মে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল এবং দ্বিতীয়টি মহর্ষি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক মেরুদণ্ডটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু বেদনা পেয়েছেন এবং তার খবর বাঙালিমাত্রই কিছু না কিছু রাখেন। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, বিশ্বভারতীর নবপ্রতিষ্ঠান উপলক্ষে তারই একটি নিবেদন করি।

১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা বলতে পারি যে ইস্কুলটি ('পূর্ব বিভাগ') প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বাংলা বা বাংলার বাইরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে একটি কলেজ ('উত্তর বিভাগ') যোগ দিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা করারও ব্যবস্থা হল।

তাই গুরুদেবের বাসনা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমের গুণীজ্ঞানীরা যেন শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হন।

সেই মর্মে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তো বটেই; তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধ করি তখনকার দিনে পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁর সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।

শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এন্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন, শ্রীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিন্স্, বগ্দানফ-বেনওয়া, ক্রামরিশ, শ্রীযুত মিশ্রজি, শ্রীযুত হিডজিভাই মরিস, শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরও বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।

সঙ্গীতে ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ভিতর ছিলেন শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী।[১]

এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে আপন আশীর্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। বাংলা দেশ তাঁকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে লেভি এঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অনটন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ কপর্দক দিয়ে— এবং এস্থলে ভক্তিভরে একথাও স্মরণ রাখা

১. সিংহলের শ্রমণ পণ্ডিতদ্বয় এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে লজ্জিত আছি।

www.pathagar.com

উচিত যে এইসব বড় বড় পণ্ডিতেরা যে দক্ষিণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন সে দক্ষিণা আজকের দিনে দিতে গেলে অনেক অপণ্ডিতও অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু ছাত্র ছিল না। বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না।

এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল : 'দি সিস্টেম অব এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস, ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বি এনি কন্‌ফারিং অব ডিগ্রিজ।'

এ অবস্থায় বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতে আসবে কে?

তবে এই যে এত অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পৃথিবীবরেণ্য পণ্ডিত লেভিকে আনানো হচ্ছে ইতি বক্তৃতা দেবেন কার সামনে, ইনি গড়ে তুলবেন কোন ছাত্রকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের তখন কোনও যোগসূত্র ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে করে কলকাতার ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে এসে সপ্তাহে অন্তত একটি বক্তৃতা শুনে যেতে পারে। শান্তিনিকেতনে রবিবার অনধ্যায় নয় কাজেই শনিবার বিকেল কিংবা রবিবার সকালের ট্রেন ধরে যে কোনও ছাত্র কলকাতা থেকে এসে লেভির বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেল।

যেদিন প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র! তারও একজন রসায়নের ছাত্র— আর পাঁচজন যেরকম 'বোলপুর দেখতে' আসে এই সুযোগে সে-ও সেইরকম এসেছে!

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন বারো জনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।

এই ছটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) বক্তৃতা দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত লেভি! রবীন্দ্রনাথ বড় মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাসের পুরোভাগে খাতাকলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

লেভির আর কোনও খেদ না থাকারই কথা ॥

নাগা

৩১ আগস্ট সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহর[১] লাল নেহরু বলেন যে, গত ২৪ মে একদল নাগা ভারতীয় নাগা অঞ্চলে হানা দেয় ও ৯৩টি মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যায়।

---

১. বাংলাতে সাধারণ 'জওহর' লেখা হয় এবং এ ভুল সংশোধন করা উচিত। 'জওহর' কথাটি ফারসিতে একবচন এবং অর্থ বাংলাতে যা তাই। 'জওয়াহর' কিংবা 'জওয়াহির' শব্দটি 'জওহর' শব্দের আরবি ব্যাকরণসম্মত বহুবচন। 'পণ্ডিতজি' তাঁর নাম বহুবচনে ব্যবহার করেন এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। এ স্থলে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফারসিতে আসলে শব্দটি 'গওহর'; কিন্তু আরবি বর্ণমালায় 'গ' নেই বলে আরবরা 'জওহর' লেখেন। পরবর্তী যুগে 'গওহর'ও প্রচলিত হয়। তাই মুসলমানি নাম 'গৌহর' ও জওহর, একই।

www.pathagar.com

আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা, কুকি, গারো, লুসাই, খাসী, নাগা ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত অনুন্নত, সভ্য-অসভ্য জাতি আছে। এদের ভিতর খাসী, লুসাই, গারোরা এবং আরও কয়েকটি জাতি বড়ই ঠাণ্ডা মেজাজের এবং সবচেয়ে মারাত্মক নাগারা। এরা এখনও পরমানন্দে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং কে কতটা শৌর্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে তাই দিয়ে।

নাগা পাহাড়ের যে অংশটুকু ইংরেজ দখল করে সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মিশনারি যায় এবং ফলে অনেক নাগা খ্রিস্টান হয়ে যায়। মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও ইংরেজের আইনকানুনের ভয়ে ব্রিটিশ নাগারা বড় অনিচ্ছায় মানুষ কেটে খাওয়া বন্ধ করে; কিন্তু স্বাধীন ও বর্মী নাগারা এসব 'ম্লেচ্ছ-সংস্কারে'র কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ নাগা অঞ্চলে হানা দিয়ে মুণ্ডু কেটে নিয়ে যেতে থাকে।

বিশেষ করে ব্রিটিশ (বর্তমান ভারতীয়) অঞ্চলেই এরা হানা দেয় কেন?

তার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ আইন করে— এবং সে আইন ভারতীয়রাও চালু রেখেছেন— ব্রিটিশ নাগাদের ভিতর এক গ্রাম অন্য গ্রামকে হানা দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এ আইন নাগারা চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নেয়নি— বিস্তর মার খাওয়ার পর অতি অনিচ্ছায় তারা হানাহানি বন্ধ করে। ফলে তারা নির্বীর্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে হানাহানির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো লোপ পেতে থাকে।

ওদিকে স্বাধীন নাগারা দেখল এ বড় উত্তম ব্যবস্থা। আপোসে তারা মাঝে মাঝে হানাহানি করে বটে, কিন্তু সেখানে যেমন অন্যের মুণ্ডুটি কাটবার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি নিজের মুণ্ডুটি কাটা যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও আছে, কারণ উভয় পক্ষই উদয়াস্ত লড়াইয়ের পাঁয়তারা কষে, তীর চোখা রাখে, ধনুকের ছিলে বদলায়। অপিচ ব্রিটিশ নাগারা লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে, তীরধনুক যা আছে তা দিয়ে হানাহানি করা যায় না। এদের হানা দিলে প্রাণ যাবার ভয় নেই, গোলায় মজুদ ধান লুট করা যায় আর শূয়ার ছাগল তো নিতান্তই ফাউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একগাদা মুণ্ডু কপাকপ কেটে নিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। অন্তুতপক্ষে একটা মুণ্ডু না দেখাতে পারলে স্বাধীন নাগা অঞ্চলে বউ জোটে না; কাজেই নাগা সম্বরণদের গত্যন্তর কোথায়?

ভারতীয় নাগারা ফরিয়াদ করে আমাদের বলে, 'হানাহানি বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমাদের নির্বীর্য করে ফেলেছ। তাই সই। কিন্তু তার ঝুঁকিটা কি তোমাদেরই নেওয়া উচিত নয়? স্বাধীন নাগারা যখন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। তোমাদের কি তখন কর্তব্য নয় পুলিশ সেপাই রেখে আমাদের বাঁচানো?'

অতি হক কথা। কিন্তু প্রশ্ন, এ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় কী প্রকারে? আমাদের সেপাইরা যে নাগাদের ডরায় তা নয়, কারণ নাগাদের হাতে বন্দুক থাকে না। গোটা দুত্তিন মেশিনগান দিয়েই একপাল নাগাকে কাবু করা যায়, কিন্তু বেদনাটা তখন সেখানে নয়। মুশকিল হচ্ছে এই, স্বাধীন নাগারা হানা দেবার পূর্বে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়ে শুভাগমন করে না এবং আমাদের পক্ষেও প্রতি পাহাড়ের চূড়োয় সেপাই মোতায়েন করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

নাগারা দল বেঁধে গাঁ বানিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করে না। তারা থাকে পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় এবং সে চুড়োগুলোর উচ্চতা তিন থেকে ছ হাজার ফুট। কাজেই এক পাহাড়ের চুড়ো থেকে যদি দেখাও যায় যে অন্য চুড়ো আক্রান্ত হয়েছে তবু সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই সব কেচ্ছা খতম হয়ে যায়।

তবে কি নাগাদের আপন হাতে কিছু কিছু বন্দুক-টন্দুক দেওয়া যায় না? সেখানে মুশকিল হচ্ছে, নাগাদের ঠিক অতটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বন্দুক পেলে তারা সোল্লাসে অবিচারে অন্য নাগাদের আক্রমণ করবে। তা হলে সে একই কথাই গিয়ে দাঁড়াল।

নাগারা এই ব্যবস্থাটাই চায়। তারা বলে, তোমরা যখন আমাদের বাঁচাতে পারছ না তখন আমরাই আপন প্রাণ বাঁচাই। এটাতেও আমাদের মন সাড়া দেয় না।

আচ্ছা, তবে কি আমাদের সৈন্যরা স্বাধীন নাগা অঞ্চল আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু ডাণ্ডা বুলিয়ে দিতে পারে না?

পারে। তবে তাতেও ঝামেলা বিস্তর ॥

হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল

শাস্ত্রে সব পাওয়া যায়— কোনওকিছুর অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান, না বিলিয়ে দিতে চান; বিয়ে করতে চান, না করতে চান— একখানা কিংবা বিশখানা; পুজো-পাজা করতে চান কিংবা ব্যোম ভোলানাথ বলে বুঁদ হয়ে থাকতে চান, এমনকি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দু দণ্ড রসালাপ করতে চান কিংবা রবিঠাকুরী 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই' হয়ে গিয়ে নির্গুণ নির্বাণানন্দ লাভ করতে চান, তাবৎ মালই পাবেন।

তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয়পক্ষই শাস্ত্র কপচালেন কেন? বিধবা-বিবাহ আইন পাস করার সময় শারদা বিলের হাঙ্গামহুজ্জুতের সময় উভয়পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছিলেন, একথা তো আর কেউ ভুলে যায়নি।

শুধু হিন্দু শাস্ত্র না, ইহুদি খ্রিস্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ওই গতি। শুধু হিন্দু শাস্ত্র এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদি বলে এঁর বাড়িতে দালানকোঠার গোলকধাঁধা ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মতো কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট নাকি বলেছেন, যেহোভার আপন বাড়িতে দালান-কোঠা বিস্তর।

তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাতে ফয়দাও এন্তার। মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ চর্চা করেছি বলেই মোল্লা-মৌলবিকে আমি বড্ড বেশি ডরাইনে। কুঁড়েমি করে জুম্মার নমাজে যাইনি, মোল্লাজি রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন, যাইনি কেন? চট করে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জায়গায় আছি সেটাকে ঠিক শহর (মিস্‌র্) বলা চলে না অতএব জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ। ব্যস, হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাইনি, তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই

www.pathagar.com

পেড়েছি আবার ওজীর সাহেব ফজলু ভায়া যখন পরিপক্ব বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্রহণ করলেন, তখন তিনিও হদীস (স্মৃতি) কপচালেন।

গ্রামাঞ্চলে থাকতে হলে কুইনিনের মতো শাস্ত্র নিত্য সেব্য।

সে কথা থাক।

হিন্দু রমণী তালাক (লগ্নচ্ছেদ) দিয়ে নবীন পতি বরণ করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কী বলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে। আমার শিরঃপীড়া, আমার গৃহিণী বেঁকে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলবেন না তো! এ প্রশ্ন মনে উঠত না, কিন্তু হিন্দু কোড বিল আসর গরম করে তোলাতে মুসলমান ভায়াদের টনক নড়েছে। খুলে কই।

হঠাৎ এক গুণী খবরের কাগজে পত্রাঘাত করলেন— তিনি হিন্দু না মুসলমান মনে নেই— হিন্দু রমণী যদি লগ্নচ্ছেদ করবার অধিকার পায় তবে মুসলমান রমণীতেও সে অধিকার বর্তাবে না কেন? ঠিকই তো! কিন্তু উত্তরে আর পাঁচজন মুসলমান বললেন— কেউ খেঁকিয়ে, কেউ মুরুব্বির চালে, কেউ-বা হিন্দু ভায়াদের পিঠে আদরের থাবড়া দিয়ে—মুসলমান শাস্ত্র নতুন কোড দিয়ে রদবদল করার কোনও প্রয়োজন নেই। মুসলমান রমণীর যে অধিকার আছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট— ওসব মালের প্রয়োজন হিন্দুদের।

লক্ষ করলুম, কোনও মুসলমান রমণী খবরের কাগজে এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না।

তাই প্রশ্ন, লগ্নচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান পুরুষ-রমণীর কতটুকু অধিকার? এ আলোচনায় মুসলমানদের কিছুটা লাভ হবে, হিন্দুদের কোনও ক্ষতি হবে না!

মৌলা বখ্‌শ্ মিঞা যে কোনও মুহূর্তে বেগম মৌলাকে তিনবার 'তালাক, তালাক, তালাক' বললেই তালাক হয়ে গেল— স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই তিনি তখন সে তালাক ঠেকান, এস্থলে 'শিব' বলতে অবশ্য মোল্লা-মৌলবি বোঝায়।

বেগম মৌলা সতীসাধ্বী। আজীবন স্বামীর সেবা করেছেন। তাঁর তিনটি পুত্রকন্যা, সবচেয়ে ছোটটির বয়স দশ কিংবা বারো। তাঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই। তিনি বিগতযৌবনা— বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চাইলেও নতুন বর পাবেন না।

বেগম মৌলাকে তদ্দণ্ডেই পতিগৃহ ত্যাগ করতে হবে। কাচ্চাবাচ্চাদের ওপরও তাঁর কোনও অধিকার নেই— নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য হলে অবশ্য আলাদা কথা।

'তালাক, তালাক, তালাক' বলার জন্য মৌলা সাহেবকে কোনও কারণ দর্শাতে হবে না, কেন তিনি গৃহিণীকে বর্জন করেছেন; তাঁর কোনও অপরাধ আছে কি না, তিনি অসতী কিংবা চিররুগ্ণা, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ— এর কোনও কারণই দেখাবার জন্য কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না। এস্থলে নিরঙ্কুশ, চৌকশ 'কর্তা'র ইচ্ছায় কর্ম।

(জানি মৌলা সাহেব হেড আপিসের বড়বাবুর মতো বড় শান্ত স্বভাব ধরেন। হঠাৎ তিনি ক্ষেপে গিয়ে এরকম ধারা কিছু একটা করবেন না, কিন্তু সে কথা অবান্তর। এখানে প্রশ্ন, মৌলার হক কতটুকু, বেগম মৌলারই-বা কতটুকু? তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ভদ্র হিন্দু সচরাচর বিনা কুসুরে একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কস্মিনকালেও করেন না একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।)

www.pathagar.com

যাঁরা তালাক আইনের কোনও পরিবর্তন চান না, তাঁরা উত্তরে বলবেন, আরে বাপু, তালাক দেওয়া কি এতই সোজা কর্ম? 'মহরে'র কথাটি কি বেবাক ভুলে গেলে? মৌলার মাইনে তিনশ টাকা 'মহরে'র টাকা পাঁচ হাজার। অত টাকা পাবে কোথায় মৌলা সাহেব?

হিন্দু পাঠককে এই বেলা 'মহর' জিনিসটি কী সেটি বুঝিয়ে বলতে হয়। 'মহর' অর্থ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে স্ত্রীধন। বিয়ের সময় মৌলাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তাঁর বেগমকে তিনি কতটা স্ত্রীধন দেবেন। মৌলা বলেছিলেন, পাঁচ হাজার (অবস্থাভেদে পঞ্চাশ, একশ, এক হাজার বা পাঁচ লক্ষও হতে পারে) এবং এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন এবং বাকি আড়াই হাজার কিস্তিবন্দিতে শোধ দেবেন।

এসব শুধু মুখের কথা নয়। এ সমস্ত জিনিস বিয়ের রাতে দলিল লিখে তৈরি করা হয় ও পরে 'মেরেজ রেজিস্ট্রারে'র আপিসে পাকাপোক্ত রেজিস্ট্রি করা হয়। মৌলা এ টাকাটা ফাঁকি দিতে পারবেন না, সেকথা সুনিশ্চিত।

উত্তরে নিবেদন :

মৌলার গাঁঠে পাঁচ হাজার টাকা থাক আর নাই থাক, তিনি যে স্ত্রীকে তালাক দিলেন, সেটা কিন্তু অসিদ্ধ নয়। টাকা না দিতে পারার জন্য শেষ-তক্ মৌলার সিভিল জেল হতে পারে, কিন্তু তালাক তালাকই থেকে গেল। অর্থাৎ একথা কেউ মৌলাকে বলতে পারবে না, তোমার যখন পাঁচ হাজার টাকা রেস্ত নেই, তাই তালাক বাতিল, বেগম মৌলা তোমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অধিকার তিনি উপভোগ করবেন।

মোদ্দা কথা, তালাক হয়ে গেল, টাকা থাক আর নাই থাক।

* * *

পুনরায় নিবেদন করি, শাস্ত্র কী বলেন সেকথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কুরানশরিফ যা বলেছেন, তার যেসব টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে, তার ওপর যে বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে দেশাচার-লোকাচার মিলে গিয়ে উপস্থিত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একে অন্যের ওপর কতখানি অধিকার বিশেষ করে একে অন্যকে বর্জন করার অধিকার কার কতটুকু সেই নিয়ে আলোচনা।

পূর্বেই নিবেদন করেছি স্বামী যে কোনও মুহূর্তে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারেন। তাঁকে তখন কোনও কারণ কিংবা অজুহাত দর্শাতে হয় না। তবে তিনি যে 'মহর' বা স্ত্রীধন দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে অর্থ তাঁকে দিতে হবে। অবশ্য না দিতে পারলে যে তালাক মকুব হবে তা-ও নয়। স্ত্রী তার ভূতপূর্ব স্বামীর মাইনে 'অ্যাটাচ' করতে পারেন, আদালতের ডিক্রি নিয়ে সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন; এককথায় উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যতখানি নাস্তানাবুদ করতে পারেন ততখানি তিনিও করতে পারেন।

উত্তম প্রস্তাব! এখন প্রশ্ন স্ত্রী যদি স্বামীকে বর্জন করতে চান তবে তিনি পারেন কি না? যদি মনে করুন, স্ত্রী বলেন, 'এই রইল তোমার স্ত্রীধন, আমাকে খালাস দাও, কিংবা যদি বলেন, 'তুমি আমাকে যে স্ত্রীধন দেবে বলেছিলে সে স্ত্রীধনে আমার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে বর্জন করতে চাই, তবু স্বামী সাফ 'না' বলতে পারেন। অবশ্য স্ত্রী স্বামীকে জ্বালাতন করার জন্য তার স্ত্রীধন তদ্দণ্ডেই চাইতে পারেন— কারণ স্ত্রীধন তলব করার হক স্ত্রীর

www.pathagar.com

সবসময়ই আছে, স্বামী তালাক দিতে চাওয়া না-চাওয়ার ওপর সেটা নির্ভর করে না। স্বামী যদি সে ধন দিতে অক্ষম হন তা হলেও স্ত্রী তালাক পেলেন না। অর্থাৎ তিনি যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে ভিন্ন বিবাহ্ করতে চান তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ; শুধু তাই নয়, পুলিশ স্ত্রী এবং নবীন স্বামী দু জনের বিরুদ্ধে 'বিগেমি'র মোকদ্দমা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে আবার কোনও স্ত্রী যদি স্ত্রীধনটি ভ্যানটি-ব্যাগস্থ্ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন তবে স্বামীও তাঁকে জোর করে আপন বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন না। আইন স্বামীকে সে অধিকার দেয়, কিন্তু আনবার জন্য পুলিশের সাহায্য দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আপনি যদি জোর করে আনতে যান তবে শালী-শালাদের হস্তে উত্তমমধ্যমের সমূহ সম্ভাবনা।

তখন আপনি আর কী করতে পারেন? তাঁকে তালাক দিয়ে হৃদয় থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারেন আর আপনি যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন তবে আপনি তালাক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তাতে করে আর কিছু না হোক স্ত্রী অন্তত আরেকটা লোককে বিয়ে করতে পারবেন না।

খুব বেশি না হলেও কোনও কোনও সময় এরকম হয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা দু রকমের হয়।

হয় স্বামী বদরাগী, কিংবা দুশ্চরিত্র। স্ত্রীকে খেতে-পরতে দেয় না, মারধোর করে। সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী বাপ কিংবা ভাইয়ের বাড়িতে পালাল (বাপ বেঁচে না থাকলে ভাইও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়, কারণ ভাই যে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তাতে বোনেরও অংশ আছে)। সেখান থেকে সে স্ত্রীধনের তলব করে মোকদ্দমা লাগাল। স্বামীর কণ্ঠশ্বাস— অত টাকা যোগাড় করবে কোথা থেকে?

তখন সাধারণত মুরব্বিরা মধ্যিখানে পড়েন— বিশেষত সেইসব মুরব্বিরা যাঁরা বিয়েটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'তোমাতে-ওতে যখন মনের মিল হয়নি তখন কেন বাপু মেয়েটাকে ভোগাচ্ছ। তালাক দিয়ে ওকে নিষ্কৃতি দাও, ও বেচারি অন্য কোথাও বিয়ে করুক।'

বেয়াড়া বদমায়েশ স্বামী হলে বলে, 'না, মরুকগে বেটি। আমি ওকে তালাক দেব না।'

মুরব্বিরা বলেন, 'তবে ঢালো "মহরে"র টাকা! না হলে বসতবাড়ি বিক্রি হবে, কিংবা মাইনে অ্যাটাচড্ হবে। তখন বুঝবে ঠ্যালাটা।'

বিশ্বাস করবেন না, এরকম দুশমন ধরনের স্বামীও আছে যে বাড়ি বিক্রয় করে মহরের শেষ কপর্দক দেয় কিন্তু তালাক দিতে রাজি হয় না।

কিংবা সে শেষ পর্যন্ত রাজি হয় যে বিবি তাঁর স্ত্রীধন তলব করবেন না। আর সে-ও তাকে তালাক দিয়ে দেবে।

কিন্তু এটা হল আপোসে ফৈসালা। আইনের হক স্ত্রীলোকের নেই যে সে পতিকে বর্জন করতে পারে। তবু এস্থলে পুনরায় বলে রাখা ভালো, 'মহরে'র টাকা দেবার ভয়ে অনেক স্বামী স্ত্রীর ওপর চোট-পাট করা থেকে নিরস্ত থাকেন।

এখন প্রশ্ন, স্বামীর যদি গলিত কুষ্ঠ হয়, কিংবা সে যদি বদ্ধ উন্মাদ বর্তায়, যদি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, যদি সে বারবার কুৎসিত রোগ আহরণ করে স্ত্রীতে সংক্রামিত করে, যদি সে লম্পট বেশ্যাসক্ত হয় তবে কি স্ত্রী তাকে আইনত তালাক দিতে পারেন না?

www.pathagar.com

শুনেছি, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'তুমি আমার মায়ের মতো' অর্থাৎ এই উক্তি দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা করে যে স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তবে নাকি সে স্ত্রী মোকদ্দমা করে আদালতের পক্ষ থেকে তালাক পেতে পারে ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স! বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু ঘণ্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন?

সত্যই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা— কী করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ কী বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, টাইকানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ, ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিত কুমারের শিষ্যত্ব, আরও কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্রনাথ কথা বলেননি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের যত রং থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এরপর আর নতুন নতুন রং বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

আর কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর সুখদুঃখ, তাঁর পতন-অভ্যুদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোঁটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা। বুঝলুম তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' প্রদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্রদীপ।

* * *

তার পর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নেই। রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তিনিকেতনের আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সেরকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনও শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেইদিনই তিনি প্রথম গদ্য কবিতা আরম্ভ করলেন। দেশবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনিনি— আমার মনে হয়, দেবদূতরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন— সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।

* * *

www.pathagar.com

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি— অবনীন্দ্রনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, 'জান, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক— আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখ না, আজ সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো মেঘ এসে বাসা বাঁধছে ভুবনডাঙার ওপারে, ডাকবাংলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যেকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রথী শুনে বলেন, 'মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!'

এক লহমায় আমার সব রঙিন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম, বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।[১]

সে যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি, একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।

*   *   *

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন অটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম আমার অটোগ্রাফে কিছু এঁকে দিতে। তাঁর কাছে রঙ তুলি তৈরি ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটিকয়েক পাখি এঁকে দিলেন।

এর কয়েকদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে 'বর্ষামঙ্গল' করে গিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, 'পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।'

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, 'তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন?'

আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।'

বললেন, 'দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু-একটা লিখে দিচ্ছি, আর যেদিন তুমি তোমার প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।'

বলে লিখলেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসাব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ' ॥[১]

'জিদ-ওয়াইল্‌ড্‌'

আঁদ্রে জিদের বই এবং বিশেষ করে তাঁর 'জুর্নাল'গুলো (ডায়েরি) বিশ্ববিখ্যাত। আর পাঁচজনের মতো আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্সদেশে তাঁর সম্বন্ধে

---

১. পাঠক, অবনীন্দ্র যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।

www.pathagar.com

যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি, কিন্তু তবু মেনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হদিসটি পেলুম না— জিদকে ফেলি কোন পর্যায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন রঙের? অথচ গুরুর আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে— উপায় কী?

একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা। এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইল্ড্। জিদ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইলডও তাঁকে স্নেহ করতেন। ওয়াইল্ড্ তখন খ্যাতনামা পুরুষ, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত : তার ওপর ওয়াইল্ড্ বলতে পারতেন খাসা ফরাসি। জিদই তাঁর চটিবই 'অস্কার ওয়াইলডে'র স্মরণেতে লিখেছেন, 'ওয়াইল্ড্ অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসি জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না— অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত ওই কথাগুলোর ওপর বিশেষ করে জোর দেবার। উচ্চারণে তাঁর প্রায় কোনও ভুলই ছিল না—শুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারি নতুন ধরনের চমক দিয়ে দিত। প্রথম যে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া, আর সে সন্ধ্যার গল্পগুলো তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না। হয়তো ওয়াইল্ড্ আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা পরখ করে নিচ্ছিলেন। ওই ছিল তাঁর স্বভাব— তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক— যে লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না তাকে তিনি সে জিনিস কখনওই পরিবেশন করতেন না। যার যেরকম রুচি তাকে ঠিক সেইরকমেরই মাল দিতেন তিনি। যারা তাঁর কাছ থেকে কোনও জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু— কিংবা হয়তো পেত সামান্য একটুখানি গেঁজলা। আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ্ করে রাখতে, তাই অনেকেই যাঁরা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইল্ড্কে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা শুধু তাঁকে চিনেছেন খুশি দেনেওয়ালা হিসেবে (amuseur = amuser)।'

জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশির ভাগ লোকই ওয়াইল্ড্কে চিনেছে কেমন যেন একটু 'ভাঁড়' 'ভাঁড়' রূপে এবং সেইটিই তাঁর আসল রূপ ছিল না।

মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, 'ওই ছিল তাঁর স্বভাব— তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক— সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করার।' তাই বোধ করি, জিদ সেই প্রথমযৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকারই কর্ম, আর তিনি অন্য কারওর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে টক-টক হককথা বলে যাবেন।

সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়— আমরা সবাই জানা-অজানাতে হরদম করে থাকি— কিন্তু প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ পারতেন কি না?

ওয়াইল্ড্ কোন অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইল্ড্ দেখেন লন্ডন-সমাজ তার তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে এ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে। খবর পেয়ে জিদ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমি ওয়াইল্ডের বিস্তর তত্ত্বতাবাশ করলেন। জিদ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা

www.pathagar.com

দিয়েছেন উপর্যুক্ত চটিবইয়ে। পাঁচজনে কী বলবে না-বলবে তার তোয়াক্কা জিদ তখন করেননি ; সেকথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তার পর ওয়াইল্‌ড্ ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দু চারবার দেখা-সাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্যারিসও যে শুধু ওয়াইল্‌ডের হুঁকো-নাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাঁকে কুষ্ঠরোগীর মতো বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন, 'ওয়াইল্‌ড্ যখন দেখতে পেলেন দু চারখানা দরজা তাঁর জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনও দরজাতেই কড়া নাড়লেন না— ছন্নের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।'

এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইল্‌ড এক কাফের বারান্দায় বসে আছেন। 'স্বীকার করি, ওরকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকাত হয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি অস্বস্তি অনুভব করলুম— চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু 'জি—' ও আমার জন্য ওয়াইল্‌ড্ দুটো কক্‌টেল অর্ডার দিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিকে পিঠ ফেরানো থাকে কিন্তু ওয়াইল্‌ড্ ভাবলেন আমি পাশে বসতে বোকার মতো নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইল্‌ড্ সম্পূর্ণ ভুল করেননি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন, 'আহ্, আমার পাশে এসে বসো না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।'

তার পর দু জনাতে কী কথাবার্তা হল সেকথা আরেকদিন হবে। উপস্থিত লক্ষ করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে স্নব, ক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাংলা কথায় একদম ছোটলোকোমি করলেন।

একদিন জিদ নির্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইল্‌ডের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেননি এবং আজো যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলেন না। শুধু তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তাঁর মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনওপ্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন না।

কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জুর্নাল, সর্বত্রই জিদ এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন ॥[১]

এযাস্য পরমাগতি

প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নতুন নতুন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে একদিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্যদিকে তুর্কি ইস্তক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব— এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?— তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

১. Andre Gide : *Oscar Wilde. In memoriam*, Paris, Mercure de France.

www.pathagar.com

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কিকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসাবে নিলে আলোচনাটা একদম কব্জার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে; সংস্কৃতির বাজারে দেশি-বিদেশি দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন— এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোটগল্প। এ দুই জিনিসই প্রাচ্যদেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই— সেজান, রেনওয়া, রদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলিকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ভারত— কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ এবং বাইরুত। একমাত্র ওস্তাদি সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর ওপর কোনও চাপই দিতে পারেনি।

কিন্তু এরকম পদ গুনে গুনে ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বিদগ্ধ সংস্কৃতি নির্মিত হয় বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, বিদগ্ধ সংস্কৃতি চলছে কোন পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে 'ছুঁৎবাই', 'বিশুদ্ধীকরণ' বা 'সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন' নাম দেওয়া যেতে পারে এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোনও প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুন করে চাঙ্গা করে তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ-বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ), কেউ বা ভক্তিযুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবারের জুতো পরে কাঁচা শাকসবজি খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেশামিশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন 'ইসলামি রাষ্ট্রে'র নামে শক্তিসঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উল-ইসলাম সম্প্রদায়। ইবন-ই-সউদ গোষ্ঠীর ওয়াহহাবি আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারব না কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোনও দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি হচ্ছে না।

দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, 'প্রাচ্য প্রাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসি ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্রাচ্য ঐতিহ্য সবপ্রকার প্রগতির 'এনিমি নাম্বার ওয়ান'। আমাদের সর্বপ্রকার বিদগ্ধ-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তার কোনও প্রকারেরই ভবিষ্যৎ নেই।' এ আন্দোলনের বড়কর্তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের রংঢং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বন্টন পদ্ধতির ওপর এবং যেহেতু প্রাচ্যভূমিও

www.pathagar.com

একদিন মার্কসের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেইহেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণনৃত্য, গণনাট্য, গণসাহিত্যের ওপর। তারই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বিদগ্ধ-সংস্কৃতি 'বুর্জুয়া'— সুতরাং বর্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কিতে এবং কিছুটা কাইরো-বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবক-যুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিক্স্ পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরান-হাদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়— তাতে বায়ানাক্কা বিস্তর। এত হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।

এ দুই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন ট্রুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালি পাঠককে নতুন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ তাঁদের স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরোয় তাহা হোসেন, বাইরুতের খলিল গিবরানি, ঢাকার বাঙালি সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরির এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরিরের নাম ভক্তিভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালির অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতা-বিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ায় এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারেনি সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরির চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিয়ে নতুন সভ্যতাসংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শহরিরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অন্বেষণে নিজেকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়— গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্রত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরির এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এযাস্য পরমাগতি ॥

দিস্ ইয়োরোপ!

গিরিজা মুখুজ্জে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান— সে কিছু না, নস্যি। (কেন বলছি, বাকিটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন) তার পর ছিটকে গিয়ে লন্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্য আছেন সরবন্ যান, ফরাসি গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জর্মনরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুজ্জে গুটিকয়েক

www.pathagar.com

ফরাসি আত্মজনের সঙ্গে আরও সব লক্ষ লক্ষ ফরাসিদের মতো দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে মালবোঝাই বাইসিকেল কিংবা হাতগাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন জর্মনদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন) তখন হঠাৎ মালুম হল, জর্মন বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান; ফিরে এলেন প্যারিস।

মুখুজ্জে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দুশমন। কিন্তু তা হলে কী হয়— পাসপোর্টে যে পাকাপোক্ত ইস্টাম্পো মারা রয়েছে, মুখুজ্জে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জর্মনির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছামি করে আপন কুঠুরিতে সুবো-শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন, তবু।

একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়
পড়িলেন ধরা, আহা, দূরদৃষ্ট অতিশয়।[১]

জর্মন পুলিশের তদারকিতে ফরাসি জেলখানায় মুখুজ্জে তখন ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে লাগলেন। সে জেলে ইংরেজের শত্রু-মিত্র বিস্তর 'ব্রিটিশ' প্রজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।

কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

তখন নাম্বিয়ার তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেকরকম তরিবত-তত্ত্বতাবাশ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মুখুজ্জেকে 'আজাদ হিন্দ' বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানাপ্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যান্ড মুফতির সঙ্গেও বিস্তর দহরম-মহরম হল।

সুভাষ সম্বন্ধে মুখুজ্জে অনেক কিছু লিখেছেন। উপাদেয়।

তার পর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে শিঙে ফুঁকেছে। জাপানিরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে 'আজাদ হিন্দ' বেতার দড়কচ্চা মেরে গেল। মুখুজ্জেরা কিন্তু ক্ষান্ত দেননি।

তার পর জর্মনির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যান্ডে; সেখান থেকে আজাদ হিন্দের বেতারকর্ম চালু থাকল বটে, কিন্তু মুখুজ্জেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার পর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মুখুজ্জে গেলেন দক্ষিণ জর্মনিতে। ইতোমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।

এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি বিস্তর বেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো'র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হল 'নিরপেক্ষ' সুইটজারল্যান্ডে। এক দরদী জর্মন সীমান্ত পুলিশই তাঁকে বাতলে দিলে কী করে নিষুতি রাতে রাইন নদী সাঁতরে ওপারে যাওয়া যায়।

আমরা ভাবি সুইসরা বড্ডই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মুখুজ্জে সেখানে যে বেইজ্জতি আর লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।

সুইসরা মুখুজ্জেকে আত্মহত্যার দরজায় পৌঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় 'কানে ধরে' ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল জর্মনিতে। জর্মনির যে অঞ্চলে তাঁকে ফেরত-ডাকে পাঠানো হল, সেটি

১. সুকুমার রায়ের অচলিত কবিতা।

www.pathagar.com

ফরাসির তাঁবেতে। কাজেই তাঁকে পত্রপাঠ গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু মুখুজ্জে যখন কমান্ডান্টকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জর্মনিতে যা কিছু করেছেন সে শুধু 'পাত্রি'র (দেশের) জন্য, তখন ফরাসিরা— আর এ শুধু ফরাসিরাই পারে— মুখুজ্জের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে-পরতে দিল। বলল, 'তুমি যখন দিব্য ফরাসি-জর্মন জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ কর-না কেন?' তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জর্মনদেরও মনঃপূত হল— অবিশ্যি বিজয়ী ফরাসিরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করত— কারণ মুখুজ্জে তাদের সামনে 'দম্ভী বীরে'র মূর্তিতে দেখা দেননি।

তার পর সেই ফরাসি রেজিমেন্ট দেশে চলে গেল। মুখুজ্জের আবার জেল। ইংরেজ তখন আমেরি হো হো'র মতো মুখুজ্জেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায়।

কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায়নি। ফরাসিরা মুখুজ্জেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয়নি।

তার পর স্বরাজ হয়ে গেল। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল।

* * *

কিন্তু বইখানা মুখুজ্জের আত্মজীবনী নয়। বইটিতে মুখুজ্জে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে। উত্তম বই।[২]

শমীম

আমার বন্ধু শমীম মারা গিয়েছে। শমীম এ সংসারে কোনও কীর্তি রেখে যেতে পারেনি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে। তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশিদিন স্মরণ করবে না।

তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শমীম কোনও কীর্তি রেখে যেতে পারেনি। তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সহৃদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে স্নেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখবার পর বলছি, ওরকম সচ্চরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখিনি।

শমীম আমার ছেলের বয়সী। তার জন্মের প্রায় প্রথমদিন থেকেই আমি তাকে চিনি। আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে, বাড়িতে যে আসত, সে-ই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয় ভগবান তাকে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে-বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের ওপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ করেছে।

কিন্তু তবু বলব, শমীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।

ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে। সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কি না জানিনে, কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজপ্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে

---

২. Girija Mukherjee, *This Europe*, Saraswaty Library, Calcutta.

www.pathagar.com

বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোনও ক্রটি করিনি। আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সেকথা কী বলব? সর্বকনিষ্ঠ চিররুগ্ণ কোন ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-শুশ্রূষা করে না?

ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না— তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েড জ্বর। আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জ্বর যাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি, সহজে কাতর হইনে, কিন্তু শমীমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যে আঘাত পেয়েছিলুম সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন।

শমীমের বাপ খুড়ো ঠাকুর্দা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির— শমীমও ছেলেবেলা থেকে শান্ত স্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হতে লাগল। পড়াশোনা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনও যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল। হয়তো তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত— আশ্চর্য কী, যে ছেলে অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মর্মন্তুদ ব্যাপার কী হতে পারে?

বিশ্বাস করবেন না, ওই গাম্ভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ। আমাকে খুশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি— নং পার্ল রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে। তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরনের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলায় তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচ্। দাদামশায় আসলে কুষ্টিয়ার লোক, 'এটা' 'সেটা' না বলে বলেন 'ইডা', 'সিডা', আর বুড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির এঘর ওঘর করে বেড়ান। তার বর্ণনা শমীম দিল এক লাইনে— 'আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন "ইডা" "সিডা" নিয়ে আছেন।'

শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম হাসি। খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটা চড়ুই-ভাত করলে হয় না? শহীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে— আমি শুধালুম, 'তুমি আসছ তো?' শহীদ বলল, 'না।'

শমীম বলল, 'ও আসবে কেন? আমরা তো "হাসি" না।'

অর্থাৎ তার ডার্লিং 'হাসি' তো আমাদের সঙ্গে চড়ুই-ভাতে আসবে না এবং আহা, শহীদ কতই-না Jolly chap— আমরাই শুধু গম্ভীর।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করত তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা। '৪৭-এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় সত্তর জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন— আমি তখন দক্ষিণে— ফিরে এসে শুনি গুণ্ডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল, শমীম নির্ভয়ে এদের সেবা করেছে; আমি আশ্চর্য হইনি।

তার পর ৫০ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিস্তর মুসলমান নর-নারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শমীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ওষুধ তৈরি করাতে, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করল। পৃথিবীর সবাই শমীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু একটি আর্ত হয়তো এই সুহাস, সুভাষ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাঁই দেবে।

www.pathagar.com

সেই সময়ে দিল্লির এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন। আমরা স্থির করলুম, দিল্লির লোক, এঁকে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা-পোলাও খাওয়াতে হবে। সব ঠিক, এমন সময় শমীম তার মাকে গিয়ে বলল, 'এই দুর্দিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ কোর্মা-পোলাও! আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।'

আমরা মামুলি খানাই পরিবেশন করেছিলুম।

খবর পেলুম, শমীম ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছিনে। এত সহৃদয়, পরোপকারী ছেলে বুঝতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে, তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে?

দিনেন্দ্রনাথ

'দেশে'র ৪১শ সংখ্যা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিনেন্দ্রভক্ত, দিনেন্দ্রসখাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গুপ্ত মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য, দিনেন্দ্রনাথের মধুর, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল হৃদয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার মনে দিনেন্দ্রনাথের যে ছবি আছে সেটি হুবহু মিলে গেল। একাধিকবার ভেবেছি, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত অল্প লোকই লিখেছেন যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তাই লিখে ফেলি কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। গুপ্ত মহাশয় এখন আমার কর্তব্যটি সরল করে দিলেন। আমার বক্তব্যের কোনও কথা যদি গুপ্ত মহাশয়ের কাজে লেগে যায়, তবে আমি শ্রমসাফল্যের আনন্দ পাব।

স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গম্ভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়মন ভরে দিত, তার পর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ভাঙা-খোয়াই পেরিয়ে যেন কোথা থেকে কোথা চলে যেত। তাই আমার সবসময় মনে হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ একজনকে শোনাবার জন্য, এমনকি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনাবার জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনাবার জন্য। তাই বোধহয় তাঁর কণ্ঠে যেরকম 'জনগণমন অধিনায়ক' গান শুনেছি আজ পর্যন্ত কারও কণ্ঠে সেরকমধারা শুনলাম না।

এরকম গলা এ দেশে হয় না— এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।

www.pathagar.com

হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম ব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।

একথা সবাই জানেন, দিনেন্দ্রনাথ যে শুধু গায়কই ছিলেন তাই নয়, তিনি অতিশয় উচ্চদরের সঙ্গীতরসজ্ঞও ছিলেন। কি উত্তর কি দক্ষিণ কি ইয়োরোপীয় সর্বসঙ্গীতে সর্ববাদ্যের খবর তিনি তো রাখতেনই— তার ওপর তিনি জানতেন কী করে গায়ক এবং যন্ত্রীকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যে টেনে বের করে আনতে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাই আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধহয় সে গুণীর নাম ছিল সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, পিঠাপুরম্ মহারাজের বীণকার— তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে বীণা শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছেন; তার পর আরম্ভ হল বীণাবাদন।

আমার সন্দেহ হয়েছিল দক্ষিণের গুণীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, উত্তর ভারতের শান্তিনিকেতন তাঁর সঙ্গীত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি না। দশ মিনিট যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ যেমন যেমন তাঁদের সূক্ষ্ম রসানুভূতি ঘাড় নেড়ে, মৃদু হাস্য করে বা বাহবা বলে প্রকাশ করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গমেশ্বর বুঝতে পারলেন তিনি যে সমঝদার শ্রোতার সামনেই বাজাচ্ছেন তাই নয়, এরকম শ্রোতা তিনি জীবনে পেয়েছেন কমই। সে রাত্রে কটা অবধি মজলিস্ চলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনের 'খাবার ঘণ্টা'র অনেক পর অবধি— বারটা হতে পারে, দুটোও হতে পারে।

সে যুগে ইয়োরোপ থেকেও বহু কলাবিৎ আসতেন রবীন্দ্রনাথকে গান কিংবা বাজনা শোনাতে। দু জনকে স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু নাম ভুলে গেছি। একজন ডাচ মহিলা-গাইয়ে (বিনায়ক রাও এঁর নাম স্মরণ করতে পারবেন) এবং অন্যজন বেলজিয়ান বেহালা বাজিয়ে। ডাচ মহিলাটি খুব বেশিদিন আশ্রমে থাকেননি, কিন্তু বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদম জমে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বাজিয়ে যেতেন— ভদ্রলোক দিনে অন্তত বারো ঘণ্টা আপন মনে, একা একা, বেহালা বাজাতেন— আর দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্মতম কারুকার্যের সময় মাথা নেড়ে নেড়ে রসবোধের পরিচয় দিয়ে তাঁর উৎসাহ বাড়াতেন।

বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন— তার অন্যতম, সিগার বর্জন করে গড়গড়া পান। আশ্রম ছাড়ার দিন ভদ্রলোক দুঃখ করে আমাকে বলেছিলেন, 'দেশে যেতে মন চাইছে না, সেখানে তামাক পাব কোথায়?' যদিস্যাৎ পেয়ে যান সেই আশায় ভদ্রলোক তাঁর আলবোলাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ছিলেন। প্রাপ্তবয়সে তিনি ফরাসিও শিখেছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে ফরাসি উপন্যাস পড়তে পারতেন। ওদিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাই, কি লেভি, কি উইন্টার নিৎস্ সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। বিদেশিকে কী করে খানা খাইয়ে, আড্ডা জমিয়ে সঙ্গীতের চর্চা করে সৌজন্য ভদ্রতা দেখিয়ে— আমি একমাত্র দিনেন্দ্রনাথকেই চিনি যিনি পৃথিবীর সকল জাতের লোকেরই ম্যানারস এটিকেট জানতেন— তার দেশের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায় এ কৌশল তাঁর যা রপ্ত ছিল এর সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না। তাই তাঁর বাড়ি ছিল বিদেশিদের কাশীবৃন্দাবন।

দিনেন্দ্রনাথ গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন, অন্যের গানবাজনার রস চাখতে পারতেন এ কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি; তদুপরি তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। এ বড় অদ্ভুত

www.pathagar.com

সমন্বয়। শাস্ত্রজ্ঞের রসবোধ কম, আবার রসিকজন শাস্ত্রের অবহেলা করে— দিনেন্দ্রনাথ এ নীতির ব্যত্যয়—শাস্ত্রের কচকচানি তিনি ভালোবাসতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার জন্য যেখানেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হত, তিনি সেখানেই সত্য শাস্ত্র আহরণ করে ছাত্রের সঙ্গীতচর্চা সহজ-সরল করে দিতে জানতেন।

আমাদের ঐতিহ্যগত রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন-অর্বাচীন বহু শাস্ত্র আছে, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে নতুন ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোনও প্রামাণিক শাস্ত্র নেই। এ শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই ছিল। বহু অনুনয়-আবেদন করার পর তিনি সে শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।

কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগুলো অপূর্ব। শুধু যে সেগুলোতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত 'দর্শনে'র সন্ধান মেলে তাই নয়, সেগুলোতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য, অমিত ঝঙ্কার— সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারে একমাত্র 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র ভাষা।

এ শাস্ত্র তিনি কখনও সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কি না জানিনে। হয়তো আমার ভুল, কিন্তু প্রথম অধ্যায়গুলো শুনেই আমার মনে হয়েছিল এ ছন্দে শেষরক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। এর জন্য যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, দিনেন্দ্রনাথের হয়তো ততখানি নেই।

আমি দিনেন্দ্রনাথের নিন্দে করছিনে। কিন্তু আমি জানি তিনি গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, গানবাজনা শুনতে, সাহিত্যরস উপভোগ করতে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, আড্ডা জমাতে, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে, বিদেশিদের আদর-আপ্যায়ন করাতে এত আনন্দ পেতেন যে কোনওপ্রকারের কীর্তি নির্মাণ করাতে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ, নিরঙ্কুশ বীতরাগ।

নাই-বা হল সে শাস্ত্র সে কীর্তি গড়া! আজ যদি দিনেন্দ্র-শিষ্যেরা আপন আপন নৈবেদ্য তুলে ধরেন, তবে তার থেকেই নতুন শাস্ত্র গড়া যাবে।

ভারতীয় নৃত্য

নৃত্য জীবনীশক্তির চরম বিকাশ। যেসব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণ সঞ্চয় করে। অন্যান্য কলা সৃষ্ট হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে— অপরের হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয়ও ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতি নির্মাণের যন্ত্রপাতি তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ ভয় ঘৃণা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল— নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।

www.pathagar.com

সলিল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে সপ্রকাশ করিয়া তোলে তখনই তাহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ পায়। তাই শুদ্ধ, অকৃত্রিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ কিছুই নয়— তাহার অফুরন্ত জীবন—উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফূর্ত বাধাবন্ধহীন আনন্দের নৃত্যছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নটনটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীর্ণ, বিষাক্ত বিলাসব্যসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ তাহার চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুস্থবুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যেসব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্যযোগে প্রয়োজনমতো কখনও প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনও তাহার দক্ষিণ মুখের কামনা করিয়াছে। ডমরু ঢোলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য অমার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাহাতে হিল্লোলের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, অন্যরা গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ণ চিৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনও মূল নর্তকরূপে অপ্রসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তিও অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।

আমাদের দেশের জনপদনৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকট্টকলি, উত্তর ভারতের কাজরী ও মণিপুরের রাসলীলাই বোঝায়। ইহাদের মূলে ধর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভঙ্গিতে ইহারা সুমার্জিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তিবহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারের কৈকট্টকলিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপদ নৃত্যেই স্ত্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে

www.pathagar.com

সুগঠিত পিত্তল কলসি ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভঙ্গিতে চক্রাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রাসগীত গায়, করতালি দিয়া তাল-লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বাজায়; অজন্তা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ওই কাষ্ঠখণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গতি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে শুদ্ধ স্বাধীন নৃত্য আরম্ভ হয়; অঙ্গভঙ্গি তখন সবল হইয়া উঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।

জনপদনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাসলীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপুরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ— গোপ ও গোপীগণের আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়িতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণ রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলার তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাধার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্যবহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গের জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।

উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান— উত্তর ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম্ ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আটাম্। পরিতাপের বিষয় এই সবকয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশালীদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ও চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দুষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এইসব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎ কলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল-লয়ের সৃষ্টি করে, সে তাল প্রকাশ করিলে তবলার বোল পদধ্বনিতে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, হাবভাব নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শুদ্ধমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দদানের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এইসব নৃত্যে বিকাশপ্রাপ্ত আঙ্গিকের সন্ধান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশ্লীল।

দক্ষিণে প্রচলিত ভরত নাট্যম্ শুদ্ধ হিন্দুকলা। ভরত নাট্যে যেসব 'মুদ্রা' দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেইগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তরের কথক নৃত্যের তুলনায় ভরত নৃত্যে পদসঞ্চালনের কারুকার্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালনও অপেক্ষাকৃত কর্তিত ও সংযত। মালাবারের মোহিনী আট্যম্ অনেকটা ভরত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ— সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সবকয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে— অতি অল্পবয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহু বৎসরব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমতো পালন করিয়া নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র শুষ্ক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শুদ্ধ কলার চিহ্নমাত্র নাই। যে নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী!

www.pathagar.com

আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ সম্বন্ধে প্রচুর বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী গায়ক-গায়িকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে *রামায়ণ মহাভারতের* উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালাবারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত— 'কথা' অর্থ 'গল্প' ও 'কলি' অর্থ 'নাট্য'। কথাকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নট-নটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না; তাহারা মূক অভিনয় করে তবলা ও মন্দিরাসহযোগে নাচে ও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুলি গান গাহিয়া শুনায়। মুক্ত আকাশের নিচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা একপ্রকার অভিনব মুখোশ নির্মাণ করে কথাকলি নৃত্যের কটাক্ষ, মুখের মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার 'মুদ্রা'র ব্যবহার ও বিশেষ পদদ্বয়ের সম্প্রসারণ দ্বারা নৃত্যকে প্রাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহু বৎসরব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয়-দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।

কথাকলি ঠিক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোশপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধিক; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফুরিত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই-একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তার পর প্রত্যেক শ্লোক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতারা চক্রাকারে 'কলসম' নৃত্য করে। তার পর স্ত্রী চরিত্রের 'সরি' নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।

কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পদসঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিছন্দের বৈচিত্র্য রক্ষিত হয় ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রীদিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রূঢ় ও অপক্বরূপে প্রকাশ পায় তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গণ্ডিবদ্ধ বলিয়া পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।

মাত্র কুড়ি-বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিষাক্ত পরিবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সঙ্গীত চিত্রাঙ্কনের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সঙ্গীতের মজলিসে স্কুল-কলেজের আমোদ-অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক ও উৎসব-আনন্দে নৃত্যচর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে মিলাইয়া কেবলমাত্র তাল-সংযুক্ত পদসঞ্চালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত হয়। সেই নৃত্যকলা এখন 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে— কোনওরকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলিফ ফান্ডের অজুহাতে যত্রতত্র নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তত্ত্বটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে নৃত্য অর্থহীন

www.pathagar.com

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে? এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনাসাপেক্ষ কলা বিশেষ? অতি অল্পসংখ্যক নর্তকনর্তকীই এযাবৎ অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন এবং ইহাদের ভিতরেই-বা কয়জন সত্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশির ভাগই তো দেখিতে পাই দুই-একদিনের ছন্নছাড়া শিক্ষায় দুই-একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শুধু লোক ভুলানো চলে— সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্যকলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন তাঁহারা সত্যই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহসের ভরে লোকচক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আঙ্গিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদের নৃত্যে তাহা বারবার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। তাঁহারা যে শুধু গভীর সাধনার দ্বারা নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহারা যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী তাঁহারা নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নতুন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য তো ইহাও হইতে পারে না; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে— জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিড়ম্বিত হইবেন? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনিতে ধমনিতে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি সুকুমার কলা সেই জীবনের, সেই জীবনীশক্তির বাণীই তো প্রকাশ করে। অতি সনাতন ভাবনা-কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণনা নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কোথায় যোগসূত্র? সুকুমার কলা কি কখনও মৃতদগ্ধ চিন্তা ও অনুভূতির অন্ধকূপে প্রাণধারণ করিতে পারে? নৃত্য তো শুধু তাললয়যোগে অঙ্গসঞ্চালন নয়, নৃত্য তো সুচারু, পদক্ষেপের নামান্তরও নয়; আঙ্গিকের উৎকর্ষ নৃত্য নয় অঙ্গবিন্যাস দ্বারা সুদর্শন আলিম্পন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের দ্বন্দ্বানুভূতি প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি, রাধা-কৃষ্ণ শিবপার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই? এখনও কি ধর্মের আচ্ছাদনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই? এ যুগের মানুষের কি নিজস্ব কোনও অনুভূতি, কোনও দ্বন্দ্ব, কোনও আশা, কোনও আদর্শ নাই? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই— মানবসংসারের চিরন্তন দীপান্বিতা প্রজ্বলিত করিবার কোনও প্রদীপ নাই? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, মোহমুক্ত হইয়া প্রকাশ করুক তাহাদের আশা-অনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শুধু কর্মে নয়— সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে সঙ্গীতে ও নৃত্যে ॥— (শ্রীমতি ঠাকুরের গুজরাতি লিখন হইতে অনূদিত)।

www.pathagar.com

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনও কোনও বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মতো আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলায় পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। 'নির্বাসিতের' বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি, বুঝতে পারলুম কত সূক্ষ্ম অনুভূতি কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, 'নির্বাসিত' যাঁরা পড়েননি, তাঁরা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এই বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

হায়, এরকম একখানা মণির খনির মতো বইয়ের চারটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে! তা হলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

* * *

১৯২১ (দু চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতী পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা।'

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছিনে, এ বই সত্য সত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। 'পৃথিবীর সব ভাষাতেই এরকম বই বিরল; বাংলাতে তো বটেই।'

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন, 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্বাসিতের আত্মকথা" কেউ পড়েছ?' বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান; সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কী করে? বয়স তখন অল্প, ভারি গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কী রকম লাগল?'

আমি বললুম, 'খুব ভালো বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ' "আশ্চর্য" বই হয়েছে! এরকম বই বাংলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল-বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

www.pathagar.com

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরকযন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তাঁর চরিত্রবলের দরুন এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্যশৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনও সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্ত স্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।

বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মতো একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর ভিতর মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোনও আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্যে বাংলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগল। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে সে শুধু যে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ শিকারের ব্যসন তখন বাংলা দেশে চালু হয়নি। তবে সামান্য যে দু একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেশন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, অ্যান্ড্রুজ প্রমুখের লেখা তো ছিলই, তার ওপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিগ্যেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, 'আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!'

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ওই কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তার পর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন—

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

এর ইতিহাস বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন—

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

www.pathagar.com

* * *

ছেলেবেলায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পেতেই চোখে জল আসে আর এ বইয়েতে বেদনার কাহিনী 'অল্পে'র ওপর দিয়ে শেষ হয়নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধহয় বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দস্তয়েফ্স্কির মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তাঁর কারাবাস আর আন্দামানজীবন (জীবন না বলে 'মৃত্যু' বলাই ঠিক) বর্ণনা করতেন তবে আমাদের মনে কোন জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দৈবের বহুতর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন এতে করেই আমাদের কল্পনা তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে কত হৃদয়বিদারক ছবি এঁকে আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। সেটা হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকু ব্যঞ্জনার পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ধৃতি আপন পুস্তকে ব্যবহার করেছেন আমি সেইটে দিয়ে তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশস্তি গাই;

'ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে'

'ধন্য ধন্য পিতঃ হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে; তুমি ধন্য!'[১]

উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্স্কির মতো শক্তিশালী লেখক নন; দস্তয়েফ্স্কির মতো বহুমুখী প্রতিভা তাঁর ছিল না কিন্তু একথা বারবার বলব দস্তয়েফ্স্কির 'সাইবেরিয়া কারাবাস' উপেন্দ্রনাথের 'আত্মকথার' কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।

সবচেয়ে মামুলি জিনিস নিয়েই উপেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় দিই। ভাষার দখল অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এতরকমের ভাষা লিখতে পারে কজন? একশ সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই অথচ তার মাঝখানেই দেখুন সামান্য কয়টি ছত্রে কী অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা :

'গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত— দীনতা, ভয় মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।'[২]

পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি :

'নিঃশেষে নিবেছে তারাদল
মেঘ আসি আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার
গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান

১. *নির্বাসিতের আত্মকথা*, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৬০।

২. *আত্মকথা*, পৃ. ৬৬।

www.pathagar.com

বহির্গত বন্দিশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।'[৩]

উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশি ভাষায়ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। শুধু যে সংস্কৃত শব্দের ওজস্ এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরো-পাক্কা তেতো-কড়া ভাষাতেও তাঁর তেমনি কায়েমি দখল।

'বারীন বলিল— "এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাংলা দেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না, সব ঢুঁঢু। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কষে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেচি"।'[৪]

এ ভাষা হুতোমের ভাষা; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকই করেছেন। এককালে পশ্চিম বাংলার লোকও আরবি-ফারসি শব্দের প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুস বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূর্ববাংলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তাঁরা এ বাবদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশি। উপেন্দ্রনাথ তাগ-মাফিক আরবি-ফারসিও 'এস্তেমাল' করতে জানতেন।

'কোনওরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহস্তে যে খোদাতাল্লা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে।'[৫]

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একদম ন-সিকে বাঙালি। তাই,

'আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্‌গতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই— আমরা বাঙালি।'[৬]

বাঙালির এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনিনি।

কিন্তু এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।

না সংস্কৃত না আরবি-ফারসি, না কলকত্তাই সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাংলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের কজন লেখক?

'শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কীরকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপসীর নাম করিল। পাছে লপসীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল, "লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।" পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি

৩. সত্যেন দত্তের অনুবাদ।
৪. *আত্মকথা*, পৃ. ৩৩।
৫. *আত্মকথা*, পৃ. ১১৯।
৬. *আত্মকথা*, পৃ. ১২১।

www.pathagar.com

জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন— "বাড়িতে ছেলে আমার পোলাওয়ের বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস। ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কী হয় তাহা কখনও ভালো করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়তো এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলো আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।'[৭]

* * *

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ওই বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, 'এ কী এলাহী ব্যাপার!' ফলে শাহজাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরি করেছিলেন, সে কথা বেবাক ভুলে যেতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কী হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিগ্যেস করেন, তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্রা গমন সফল হল— ক্ষুদে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, 'এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা ঊর্ধ্বশ্বাসে না লিখে আরও ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।' 'যোগাযোগ' পড়ে মনে হয় না, এই বইখানাকে বড় কিংবা ছোট করা যেত না, 'গোরা'র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়তো এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরও ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় 'আত্মকথা' সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়তো সেরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই ভালো হত। এ বই যদি 'ওয়র অ্যান্ড পিসের' মতো বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হত তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে কারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসেবে এ বই এর চেয়ে কি বড় কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয় কী অদ্ভুত সাহস আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেলভীতি সাধারণের মন থেকে তো একরকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল, কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার

৭. *আত্মকথা*, পৃ. ৬৯, ৭০।

www.pathagar.com

কল্পনাই করতে পারিনে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল— যেন কাঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাংলা দেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, 'হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাংলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?'

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয়ে এবং জীবনে যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালি হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারংবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মৈঁ ভুখা-হুঁ' তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল—

'কালী তুই করালরূপিণী / আয় মাগো আয় মোর কাছে,"

যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, 'হানো, তোমার খড়্গ হানো', তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্রনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যূষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'আজ আপনি কী বাজলেন বলুন তো! আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেল।' বললেন, 'এর নাম "শঙ্করবরণম্"— সন্ন্যাসী রাগও একে বলা হয় কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনওপ্রকারের রস নেই বলে একে শান্ত রসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।'

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।

অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

তা হলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের জীবন তথা বাংলা দেশের পতনঅভ্যুদয়বন্ধুরপন্থা নিরীক্ষণ করেছেন অনাত্মীয় বৈরাগ্যে— তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস— এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুর্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ দিয়ে এ বড় কঠিন কর্ম— কঠোর সাধনা এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একাধারে না থাকলে এ ভানুমতী অসম্ভব।

আমার প্রিয় চরিত্র ডন কুইক্সট্। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুইজনেই পরের বিপদে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শাণিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দু জনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইন্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন জাদুকরের মন্ত্র-সম্মোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্রনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারারক্ষককে মনে করেন সার্কাসের সং, পুলিস বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্সট্‌কে বারবার নমস্কার ॥

www.pathagar.com

জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা

ম্যাট্রিক পাসের লিস্টে নাম দেখে যেমন 'ইয়া আল্লা' বলে ছেলে-ছোকরারা লম্ফ দিয়ে ওঠে আমাদের অখণ্ড স্বরাজলাভের আনন্দোল্লাস তার সঙ্গে তুলনীয়। এমনকি, ম্যাট্রিকেও যদি পাঠকের মন সন্তুষ্ট না হয় তা হলে বি.এ., এম.এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট. যা খুশি বলতে পারেন তাতেও কোনও আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়— এ স্বাধীনতা পাশের আনন্দ অন্য সব পাশের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ অন্য যে কোনও পরীক্ষায় দু একজনের ইয়ার-বক্সী ফেল মারেনই মারেন— নিতান্ত পরশ্রীকাতর এবং বিঘ্নসন্তোষী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারওরই কোনও পরীক্ষা পাস নিরঙ্কুশ আনন্দদায়ক হয় না— এ পরীক্ষায় কিন্তু সবাই পাস, সবাই রাজা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আজ স্বাধীন হলেন, আপনিও হলেন, আমিও হলুম।

কিন্তু প্রশ্ন অতঃ কিম? অবশ্য বলতে পারেন পরীক্ষা পাস করে জ্ঞানার্জন হল এবং জ্ঞানার্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ, আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। এরপর কিছু না করলেও কোনও আপত্তি নেই। এটা একটা উত্তর বটে কিন্তু কোনও জিনিস একদম কোনও কাজে লাগল না একথাটা ভেবে কেমন যেন সুখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, 'ইট ইজ বেটার টু ব্রেক দি হার্ট ইন লভ দেন ডু নাথিং উইথ ইট'— স্বাধীনতাটা কোনও কাজে লাগাব না, একথা ভেবে মন কেমন যেন সুখ পায় না; বাসনা হয়, দেখাই যাক না, কিন্তু অন্ততপক্ষে এ তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাশের পর লেখাপড়া বন্ধ করে দিলে জ্ঞান যেরকম কর্পূরের মতো বিনা কারণেই উবে যেতে থাকে, স্বাধীনতাটাকেও তেমনি চালু না রাখলে ক্রমে ক্রমে সে-ও তার রূপ বদলাতে থাকে, স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্তেই যদি বেধড়ক ধরপাকড় আরম্ভ করে দেন, মনে মনে ভাবেন পাঁচটা লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই পাঁচশ লোকের স্বাধীনতার বাঁচা তো হয়ে যাবে কিংবা যদি ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে না ঝোলান তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ লাভটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগেভাগে হলফ করে কিছু বলা যায় না।

হিটলারের পূর্বেও জর্মনি স্বাধীন ছিল কিন্তু জর্মনিকে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাধীনতা দিলেন হিটলার। লেনিনের পূর্বে রাশার জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি, লেনিন এক ধাক্কায় গোটা দেশটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন। এখন আবার স্তালিন দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যে এরপর কী হয় না হয় বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনিও হিটলারের গতি লাভ করবেন নাকি?

কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও উপায় নেই— কিছু-একটা করতেই হবে। স্বাধীনতার ঘোড়া চড়ি আর নাই চড়ি সেটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানাপানির খরচা হবেই হবে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেকখানি বিলিতি ছিল বলে আমাদের স্বরাজলাভও অনেকখানি বিলিতি কায়দায় হয়েছে। এখনও আমাদের লাট-বেলাটরা বিলিতি কায়দায় লঞ্চ-ডিনার খাওয়ান, পেরেট দেখেন, সেলুট নেন, এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা, কত বখেড়া। তাই স্বাধীনতা নিয়ে কী করব কথাটা উঠলেই গুণীরা বলেন, 'ইয়োরোপ

www.pathagar.com

কী বলছে, কান পেতে শোনো তো; তার পর বিবেচনা করে ভালো-মন্দ যা হয় একটা কিছু করব।'

ইয়োরোপ কী বলছে সে বিষয়ে কারও মনে কোনও ধোঁকা নেই। ইয়োরোপ বলছে, 'হয় মার্কিন-ইংরেজের ডিমোক্রেসি গ্রহণ করে তাদের দলে যোগ দাও, নয় লালরক্ত মেখে রুশের সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।'

ক্ষীণকণ্ঠে কেউ কেউ বলেন, 'কেন? টিটো?'

উত্তরে শুনি অট্টহাস্য। টিটো-ইংরেজে বন্দুক-কামান কেনা-বেচার সমঝাওতাও নাকি হয়ে গিয়েছে কিংবা হব-হব করছে। টিটো মিয়ার 'তৃতীয় পন্থা' তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার মতো তিন দিনও টিকল না। তাঁকেও আস্তে আস্তে মার্কিন-ইংরেজের আস্তিন পাকড়ে এগোতে হচ্ছে।

এরপর আর কোন সাহসে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের কথা তুলি?

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক, চিত্রকর, কবি, দার্শনিকদের নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যবাদ। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, ইতালি যে কোনও মাসিক খুললেই দেখতে পাবেন ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাথায় হাত দিয়ে বলছেন, 'কোনও পন্থাই তো দেখতে পাচ্ছিনে—মার্কিনের দেখানো পথ মনঃপূত হয় না, রুশের পথই-বা ধরি কী প্রকারে? মার্কিন ইংরেজের 'ডিমোক্রেসি' এমনিতেই শোষণপন্থী, তার ওপর আমরা যদি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কম্যুনিজমকে নির্মূল করে দিই তা হলে এখনও তারা রুশ জুজুর ভয়ে যেটুকু সমঝে চলত, চাষামজুরকে দু মুঠো অন্ন দিত তা-ও আর দেবে না। আর রুশের কলমা পড়ে যদি মার্কিন-ইংরেজকে সাবড়ে দিই তা হলে স্তালিনকে ঠেকাবে কে? যুগযুগসঞ্চিত ইয়োরোপের তাবৎ সভ্যতা তাবৎ সংস্কৃতিকে তো তিনি 'বুর্জোয়া' বলে নাকচ করে দিয়েছেন, এমনকি তার আপনজন ভার্গা, ভাভিলফ, কল্‌ৎসফ হয় 'পেনশনে' নয় নির্বাসনে কিংবা মাটির নিচে। স্তালিন যদি বিশ্বজয় করতে পারেন তবে এ দুনিয়াতে বাইবেল-কুরান, বেদ-পুরাণ তো থাকবেনই না, প্লাতো-শেক্সপিয়র থাকবেন কি না তাই নিয়ে অনায়াসে জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। আণ্ডা-মাখনের ছয়লাপ হয়তো হবে, কিন্তু এই পৃথিবীর লোক প্লাতো-শেক্সপিয়র পড়তে পাবে না শুনে স্তালিনি কলমা পড়তে কিছুতেই মন মানে না।'

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রিস্টধর্মের প্রতি এদের নৈরাশ্যের অনুযোগ। একমাত্র পেশাদারি পাদ্রি-পুরোত ছাড়া ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ আর এ বিশ্বাস করেন না যে প্রভু যিশুর সাম্যের বাণী বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে পারবে। একদিন সে বাণী দাসকে মুক্তি দিয়েছিল, অত্যাচারীকে শান্ত করতে পেরেছিল, জড়লোক থেকে অধ্যাত্মলোকের অনির্বাণ দীপশিখার চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে বাণী ভাটিকানের আপন দেশেই লুণ্ঠন অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করতে পারছে না।

ইয়োরোপ মরা ঘোড়ার মতো পড়ে আছে। ধর্মের চাবুকে সে আর খাড়া হবে না।

অতএব? অতএব কোনও দিকেই যখন আর কোনও ভরসা নেই তখন যা খুশি একটা বেছে নাও। আর দয়া করে আমাদের শান্তিতে মরতে দাও আর তা-ও যদি না করতে দাও

www.pathagar.com

তবে আত্মহত্যা করতে দাও। রুশিয়া এবং পশ্চিম ইয়োরোপে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতরই আজ বেশি।

* * *

আমরা যদি হটেনটট হতুম তা হলে আমাদের কোনও দুর্ভাবনা থাকত না। আত্মহত্যা ছাড়া— অসভ্যদের ভিতর আত্মহত্যার সংখ্যা অতি নগণ্যও বটে— অন্য যে কোনও দুটো পন্থার ভিতরে একটা বেছে নিয়ে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়তুম। তার পর যা-হবার হত। (কিছুটা যে হয়েছে সেকথাও অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিস্টরা তো আছেনই, আরেক দল যে রুশের বিরুদ্ধে ঝটপট শত্রুতা জানিয়ে মার্কিন কলকব্জা হাতিয়ে এ দেশটা শোষণ করতে চান সে তত্ত্বটাও আমাদের অজানা নয়।)

'ধন্য সেই জাত, যার কোনও ইতিহাস সেই।' সে নির্ভয়ে যা কিছু একটা বেছে নিতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহ্যে আমরা শ্রদ্ধা হারাইনি—হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশি শাসনের ফলে আমরা সে ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবার সুযোগ এ যাবত পাইনি।

কিন্তু যতদিন সে শ্রদ্ধা আমাদের মনে রয়েছে ততদিন তো আমরা বিগত-যৌবনা অরক্ষণীয়ার মতো নিরাশ হয়ে গিয়ে মার্কিন কিংবা রুশের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারিনে। স্বরাজের জন্য যারা জেল খাটল, প্রাণ দিল তাদের অনেকেই তো মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে তারই আলোকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে, এমনকি গোপনে গোপনে হয়তো এ দম্ভও পোষণ করেছিল যে বিশ্বজনকেও সেই 'আলোক-মাতার স্বর্গ সভার মহাঙ্গনে' নিমন্ত্রণ করতে পারবে। কৃষ্ণের দেশ, বুদ্ধের দেশ, চৈতন্যের দেশ আজ কপর্দকহীন, দেউলে, একথা মন তো সহজে মেনে নিতে চায় না।

কিন্তু সেখানে আরেক বিপদ। ঐতিহ্যের কথা তুললেই আরেক দল উল্লসিত হয়ে বলেন, 'ঠিক বলছ, চল, আমরা বেদ-উপনিষদের সত্যযুগে ফিরে যাই।'

কোনও বিশেষ 'সত্যযুগে' ফিরে যাওয়ার অর্থই মেনে নেওয়া যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কোনও জিনিস নেই, সেই যুগকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরার অর্থই হল একথা মেনে নেওয়া যে আমরা যুগ যুগ ধরে শুধু অবনতির পথেই চলে আসছি এবং নতুন জীবন, নবীন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার মতো কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই এঁরা তখন সেই বিশেষ 'সত্যযুগে'র আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম (এমনকি কুসংস্কার পর্যন্ত, কারণ আমরা বিশেষ কোনও সর্বাঙ্গসুন্দর 'সত্যযুগে' বিশ্বাস করিনে বলে সব যুগেই কিছু না কিছু কুসংস্কার মূঢ়তা ছিল বলে ধরে নিই) পদে পদে অনুসরণ অনুকরণ করতে লেগে যান, তখন জিগির ওঠে, ইয়োরোপীয় সবকিছু বর্জন কর, মার্কিন-রুশের গা ছুঁয়েছ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছড়াও চতুর্দিকে গোবরের জল, ঠেকাও তাই দিয়ে শুদ্ধ 'ভারতীয় সংস্কৃতি'-কে 'অস্পৃশ্যের পাপ-স্পর্শ থেকে'।

এঁরা গড়ে তুলতে চান আবার সেই 'অচলায়তন' যার অন্ধ প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য কবিগুরু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নবযুগের প্রতীক নতুন 'ডাকঘর' যার ভিতর দিয়ে রুগ্ণ অমলকে বাণী পাঠাবেন প্রাচীন রাজা, যিনি জনগণের অধিনায়ক, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

www.pathagar.com

মার্কিন না, রুশ না, এমনকি ভারতীয় কোনও বিশেষ 'সত্যযুগ'ও না— এসব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের চলিষ্ণু সদাজাগ্রত শাশ্বত সত্যধর্মের পথে আমাদের চালাবেন কে? সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সংগ্রাম, এর মাঝখানে শান্তসমাহিত হয়ে ধ্রুব সত্যের সন্ধান দেবেন কে?

তিনি এলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব তো? আমার মনে হয় পারব। কারণ তিনি কোন ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সন্ধান আমরা পেয়ে গিয়েছি— তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে, তাঁর উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রিস্টান, তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাব সেই চির-সারথির রথচক্রঘর্ঘর, যিনি পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার ওপর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদিগকে এই নবযুগের অরুণোদয়ের সামনে।

শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম— জাতীয়-সঙ্গীত নির্বাচনে পথভ্রান্ত হইনি— এ বড় কম আশার কথা নয়।

ইন্দ্রলুপ্ত

(আবু-সঈদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেও ক্লান্তি নেই।
সবুজ ঘাস হল হলদে, তার পর ফিকে।
দস্যি কাল-বোশেখী বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমে বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।
লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুভ্র, উষ্ণ, নগ্ন মৃত্তিকা।
মাঠের টাক—
আমার টাকের মতো।

কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে
— আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল
কালোতে নীলেতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল?—

www.pathagar.com

রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,
অন্ধ ভিখারির ছবি দেয়ালেতে ডাইনে,
একচোখা রেডিয়োটা করে কটমট
ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ফ্রলান, Gruess Gott!
বেতারের সুরটা ট্যাঙো না ফক্‌স্‌-ট্রট?'
চট করে চটে যাও পাছে।
তুমি রূপসিনী বন্দিনী
নরদিশী নন্দিনী।
তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে
চারিদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যবনিকা।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পর্শ—

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধুয়া আমার
পড়িল মন্ত্র কাল
দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল
পাতিয়া দেহের জাল।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
পরশে পরশ রাখি
বাহু বাহুপাশে ঘন ঘন শ্বাসে
দেহে দেহ দিল ঢাকি।

হঠাৎ দামিনী ধমকালো
বিদ্যুৎ চমকালো
দেখি, নীল চোখ
কাতরে শুধাই একী
তোমার নয়নে দেখি,
তোমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি?
তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে?
রাত পোহাল। বর্ষণ থেমেছে।
কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা?

www.pathagar.com

ঋতুচক্র গেল উলটে—
যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল।—
কোন্ ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে
কোন্ ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে?
বেরিয়ে এল মাঠের টাক,
আমার টাক।
আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত
আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত ৷৷

নয়রাট

দেশভ্রমণের সময় যারা ছন্নের মতো ছুটোছুটি করে— অর্থাৎ সকালে মিউজিয়ম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জেদর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাতদুপুরে কাবারে, আমি তাদের দলে নেই। দেশে ফেরার পর কোনও পাক্কা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কী হে? তুমি প্রাগে তিন দিন কাটালে অথচ বলছ রাজা কার্লের বর্মাভরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়ম দেখনি— এ তো অবিশ্বাস্য', আমি তা হলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করিনে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশভ্রমণে বেরুইনি। ছয় পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়— আমি নামব হেদোয়— তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে পায়ে হেঁটে ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে হেদোয় এসে বেঞ্চিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি? আট নম্বরের জুতো ছ টাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ নম্বরি পা-কে আট-নম্বরি পরাতে যাব নাকি?

তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যেরকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিংবা যদি বাগানে বসবার মতো আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছু একটা অর্ডার দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।

এই হল জাবরকাটার মোকা। এ কদিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে কটি মনে ঢেউ তুলেছিল সেই ঢেউগুলো গুনবেন। কিংবা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভালাপ প্রিন্টিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন আর মনের ঘাড় নাড়িয়ে বলবেন, উত্তম হয়েছে, খাসা হয়েছে।

আমার পাশের টেবিলে দুই পাঁড় দাবাখেলনেওলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে— উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ অ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরও জন তিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালিকে রঙ ফলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরৎচন্দ্র এঁকে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাংলা দেশে বহুকাল ধরে হবে না।

www.pathagar.com

খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধ ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হবু হবু, তখন ঘাড়গর্দানে 'শ্রাগ' করে বললেন, 'স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম', অর্থাৎ আমার খেলা গয়াগঙ্গা-গদাধরহরি।

দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন? ওই বড়েটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না?'

খাসা চাল তো! ওদিকে কারও নজরই যায়নি। এ চালে আরও খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে দর্শককে বললেন, 'আপনি তা হলে বসুন।' দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন আপন ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে চাপ। পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাঙ্গের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায় তাই হল। পয়লা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন— 'যা বললেন— তার অর্থ "হরিবোল বল হরি !" '

আমরা লক্ষ করিনি— কে-ই বা এরূপ স্থলে করে— আরও জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন গজটা পেছিয়ে নিলে হয় না?'

এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম ধরতে পেরেছেন। শুধু বললেন, 'হুঁ।' তখন পয়লা বারের কসাই, দুসরা বারের বকরি উঠে বললেন, 'আপনি তা হলে বসুন।'

অর্থাৎ খোল-নলচে দুই-ই তখন বদলে গিয়েছে।

এবারে সত্যি সত্যি লাগল মোষের লড়াই।

শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।

* * *

ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।

খেলোয়াড়দের একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চণ্ডু-খানায় যখন এতক্ষণ একসঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই কি— একটা ছোট নড্ করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।'

আমি বললুম, 'বসুন, বসুন।'

ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, ' "বসুন", হুঁহ্, "বসুন"। ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি।'

আমি শুধালুম, 'কেন, কী হয়েছে?' বুঝলুম লোকটি দিলখোলা।

বললেন, 'জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে আমাকে— বউ। বলেছিলুম, এই এলুম বলে। কী করে জানব বলুন, দাবার চক্করে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদ্‌ঘুটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কী করে?'

'শুনেছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, তার পর ক্রুসেডের লড়াইয়ের বন্দি ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে—'

www.pathagar.com

'আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কী? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কী করেন?'

'চাঁদ-পানা মুখ করে গাল সই।'

'ব্যস্! ব্যামোটা বাধিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেননি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লঞ্চ খাবেন।'

'আর গালও খাব? না?'

'না, না, আপনাকে বকবে কেন? আমি বলব, এঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে কী করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারিনি। চলুন চলুন, আর দেরি করা নয়।'

চললুম।

ভদ্রলোকের বয়স— এই ধরুন ৪৫-৪৬, স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোট-পাতলুন-টাই। সবকিছু পরিপাটি। তাই অনুমান করলুম তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে বকুন-ঝকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।

বললেন, 'যা খুশি তাই বউকে বলে যাবেন, কিচ্ছু ভয় করবেন না। তাঁকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাতেও আমি কোনও আপত্তি করব না, কিন্তু স্যর, দয়া করে ওই দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা— ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা নয়রাট্।' আমি বললুম, 'আমার নাম আলী।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইটজারল্যান্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃত্বের-মাধুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নির্ভয়ে উপভোগ করতে পারে— স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যই বড় মধুর হয়; কখনও তারা তরুণীর মতো ভাবে বিহ্বল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনও আবার মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়, বিয়ে-থা করে ঘরসংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুনয়-বিনয় করে।

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার নয়রাট্ বকে যেতে লাগলেন, 'বুঝলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুম কিন্তু এই হ্যার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক— শুনেছ তো ভারতবর্ষের লোক কিরকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদের একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসতে আসতে তাঁকে জিগ্যেস করে জানতে পেলুম, সাতদিন ধরে এসেছেন জিনিভায়, এখনও লিগ অব নেশনসের 'চিড়িয়াখানা' দেখতে যাননি, শামুনিক্‌স্ চড়েননি, অপেরা-থিয়েটার কিছুই দেখেননি। আর সব টুরিস্টদের মতো সুইটজারল্যান্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেননি। আমার তো মনে হয়, এ দেশের উচিত এঁকে এঁর খরচার পয়সা কিছু ফেরত দেওয়া। কী বল?'

www.pathagar.com

পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তাঁর দেশের কুতুব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে সবকিছুই দেখে নেব।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেই ভালো। শামুনিক্‌স্‌ পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দু দিনে গলে যাবে, সুইটজারল্যান্ডে ভ্রমণ তো আর দাবা খেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দুটি কিস্তি না দিলে—'

বাকিটা আমি আর শুনতে পাইনি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে পিছুপা হতে আরম্ভ করেছি।

শুনি, হ্যার নয়রাট্‌ ব্যথাভরা সুরে বলছেন, 'গিন্নি, ছিঃ।'

আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাত মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।

নাহ্‌। ভুল করেছি। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ ঘেউটাই বেশি। বলল, 'আহ্‌, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু একটা কথা সবসময়েই কয়ে থাকেন— ওসব কি গায়ে মাখতে আছে? তুমি দাবা খেলায় দু একটা আজেবাজে চাল মাঝে মাঝে দাও না— দুশমন কী করে তাই দেখবার জন্য?'

আবার দাবা! খেয়েছে।

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা স্বামীকে বললেন, 'আজ তো লাঞ্চের ব্যবস্থা বড় মামুলি। সুপ্‌ ফিশ্‌ আ লা রুস্যস (রাশান কায়দায়) আর অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্‌ ক্রিম। তার চেয়ে বরঞ্চ চল রেস্তোরাঁয়— জিনিভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না— ভালোমন্দ এটা-সেটা।' তার পর আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন, 'আপনি কী খেতে ভালোবাসেন?'

আমি নির্ভয়ে বললুম, 'সুপ, ফিশ্‌ আ লা রুস্যস, অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্‌ ক্রিম।'

হ্যার নয়রাট্‌ তো আনন্দে গদগদ। বললেন, 'দেখলে গিন্নি, কীরকম অদ্ভুত আদব-কায়দা। তুমি যদি বলতে আজ রেঁধেছি, স্ট্রিকনিন-সুপ, পটাসিয়াম সায়ানাইড ফ্রাইড, আর্সেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন, "দি আইডিয়া, আমি দু বেলা ওই জিনিসই খাই"।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপ না। তোমার মতো ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারি জাহাজ নয়।'

পেটার বললেন, 'সব দাবা খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যেরকম হনিমুন, দাবা খেলার পরই সেইরকম অজুহাত অন্বেষণ!'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি তো দাবা খেলিনে।'

কথা শুনে দু জনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটায় পেটার বললেন, 'দেখলে গিন্নি, অজুহাতের রাজা কারে কয়? একদম কবুল জবাব, উনি দাবা খেলেন না! বাপ্‌স্‌! মারি তো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একখানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকটি পাবে না। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অম্লান বদনে বলছেন উনি দাবা খেলেন না।'

www.pathagar.com

আমি সবিনয়ে শুধালুম, 'আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পাকি সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, ব্যালা, চেল্লো কত্তাল বাজান?'

ওদিকে দেখি, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না; শুধু বললেন, 'তাই বল, দাবা খেলা হচ্ছিল।'

চাণক্য বান্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব।' আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনও বিয়ে করেনি। তা না হলে তিনি 'রাজদ্বারে' না বলে 'জায়াদ্বারে' বলতেন।

জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল— তবু বললুম, 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতবি করাতে পারলুম— এই বা কী কম সান্ত্বনা!

* * *

আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যেরকম হাপুসহুপুস শব্দ করে আহারাদি সমাপন করি, নেমন্তন্ন, খেতে গিয়েও প্রায় সেইরকমই করে থাকি। তফাত মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিৎকার করে বলি, 'আরও দু খানা মাছভাজা দাও' নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি, 'চৌধুরী মশাইকে আরও দু খানা মাছভাজা দাও।'

সায়েব-সুবোদের কিন্তু বাড়ির খাওয়াতে, রেস্তোরাঁয় আহারে এবং নেমন্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতায় খাওয়াদাওয়া করতে হয়। সায়েবরা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গেলে আর পোশাকি ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরকম না খেয়েই বাড়ি ফেরে। ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন দেড় চামচ। ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট ব্লট করবেন, কিন্তু ড্যুক অব উইন্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট ব্লট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে আপনার ঠোঁট পর্যন্ত ভেজেনি। তার পর পদের পর পদ উত্তম উত্তম খাদ্য আসবে— আপনি আপন প্লেটে তুলে নেবেন কখনও আড়াই আউন্স, কখনও দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম। মুরগির হাড্ডি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাঁচবেন তার উপায় নেই এবং গ্রেভিটুকুর মোহ করছেন কী মরেছেন। সাইড প্লেটে যে এক স্লাইস টোস্ট দিয়েছিল তার এক-দশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসিমার দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত 'পারিয়া' কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-খেকো হটেনটট্।

বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানি ক্লাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কী করে খেতে হয়। সমস্যাটা এইরূপ : (ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলুম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম। এর থেকেই বুঝতে পারছেন, আমি খানদানি খানা খেতে শিখিনি— ব্যানকুয়েটে আমার নাভিশ্বাস ওঠে।

বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, প্লেটে যে গ্রেভি পড়ে থাকে, তার উপর রুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রেভি চেটেপুটে নেওয়া (জর্মন শব্দ (tunken) ব্যাকরণসম্মত— অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত— কি না?

www.pathagar.com

উত্তরে এক 'খানদানি মনিষ্যি' বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ অভ্যাস কি বাড়িতে কি রেস্তোরাঁয়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অতিশয় নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে— আপন ডাইনিং রুমে— কর্মটি ক্ষমার্হ।

মুরগির ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে 'কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়তে' বাড়িতে বেশির ভাগ ইউরোপীয়ই করে, কিন্তু বাইরে নৈব নৈব চ। তবে কোনও কোনও জর্মন এবং সুইস্ রেস্তোরাঁয় রোস্ট সার্ভ করবার সময় মুরগির ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, 'জর্মনরা বর্বর!'

অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ— খেতে হয় হাত দিয়ে।

ইংরেজ যদিস্যাৎ কখনও রাইস কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোট্রো (একরকমের কিমা পোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পুন দিয়ে সে খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসি-ইতালি আঁতকে ওঠে— বলে, কী বর্বরতা! একটা আস্ত চামচ মুখে পুরছে— বাপ্স্। তারা রাইস কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নিয়ে— বিনা ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আস্ত ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে— কী বর্বরতা! তার চেয়ে চপস্টিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।

আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটা পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পুন, এমনকি চপস্টিক পর্যন্ত আমার আপন আঙুলের চেয়ে ঢের নোংরা। সবচেয়ে বঢ়িয়া হোটেলের স্পুন নিয়ে আপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন— দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্লথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে, টেবিলের তলায় পাশের কিংবা সামনের লোকের পায়ে গুত্তা না মেরে আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েন্টের ফর্কে গোলমাল না বাধিয়ে, প্লেট শেষ হওয়ার পূর্বেই ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে সবকিছু রদ্দিবরবাদ না করে, এবং আহারান্তে ঘোঁত ঘোঁত করে ঢেকুর না তুলে আহার করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই যাঁদের হাতসাফাই আছে, যাঁরা চিড়িতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।

এবং সবচেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শুধু গল্প করলে চলবে না— সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ ঠিক রাখা সে-ও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মতো ব্যাক-বেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সবকিছু শুনে যেতে হবে— তা সে যতই নিরস নিরানন্দ হোক না কেন?

www.pathagar.com

বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমন্তন্ন কি এগজামিনেশন হল?

*　　　　*　　　　*

নয়রাট লোকটি খুশগল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সেকথাটা দু মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিণীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম ইনিও সাদাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারে না। খানা-টেবিলের পাশে পৌঁছেই বললেন, 'এ বাড়িতে পোলিশ গভর্নমেন্ট, (পোলান্ডের ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জর্মন ভাষায়, 'পোলিশ গবর্নমেন্ট' বলতে 'এলো-মেলো' 'ছন্নছাড়া' বোঝায়) যে যেখানে খুশি বসতে পারেন।'

নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কী করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদ্দেশের উপর, তুমি বসবে—।'

ফ্রান্ৎসিস্কা রাগ করে বললেন, 'ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এরই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা! তার ওপর উনি আবার বিদেশি।'

নয়রাট বললেন, 'দেখ প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করছ। প্রথমত, তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিশি-বিদেশিতে কোনও ফারাক দেখতে পাইনে। যার সঙ্গে আমার মনের মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কী বলেন আলি সাহেব?'

আমি বললুম, 'অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, "আমি" "তুমি"তে পার্থক্য করে লঘুচিত্তের লোক, যার চরিত্র উদার তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।'

নয়রাট গুম্ মেরে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে শেষটায় বললেন, 'এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে— ফ্রান্ৎসিস্কার রান্নার মতো।'

ফ্রান্ৎসিস্কা ভয়ঙ্কর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, 'দেখো, পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখ্খুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ ছুড়ে তোমার মাথা ফাটাব।'

পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সুপ গিলে নিয়ে প্রথম গিন্নিকে শুধালেন, আরও সুপ আছে কি না, তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে আত্মজন করা কি কখনও সম্ভব? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রান্ৎসিস্কা বলল, একজোড়া ফেন্সি নতুন জুতো কিনবে— দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮ টাকা)— আমি বললুম আমার অত টাকা নেই, ফ্রান্ৎসিস্কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দু দিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কী আর করি বলুন তো? তদ্দণ্ডেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রান্ৎসিস্কার মা! বাপরে বাপ্! আপনি কখনও ম্যানইটার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রান্ৎসিস্কা আমাকে বললেন, 'দোহাই মা মেরির! এই পেটারটা যে কী মিথ্যাবাদী আপনাকে কী করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্লিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গালিগালাজ অনেক বেশি খারাপ') আমার মা যাতে বড়দিন একা-একা না কাটান তার জন্য নিজে— আমাকে না বলে— লুৎর্সেন গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এল। তার পর বছরের শেষ রাত্রে তাঁর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি— ওঁর সঙ্গে নাচলে অন্তত পঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে।

www.pathagar.com

বুড়িকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিয়ে দিয়ে, যত সব অদ্ভুত পুরনো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনও সে মাটিতে বসে উরু থাবড়ায়— মা তখন তার চতুর্দিকে পাঁই পাঁই করে চক্কর খাচ্ছেন— কখনও বাঁদরের মতো লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠোকে— মা তখন ১৫ ডিগ্রিতে কাত হয়ে স্কার্ট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তার পর তাঁকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরল ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচনে-ওলা-নাচের-ওলীরা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে, একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ, জোর পনের মিনিট— ওই মাৎসুর্কা না কী পাগলা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজালে পাকি এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে, ওদিকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে বুড়ি মিটমিটিয়ে হাসছে— খুশিতে ডগোমগো!'

পেটার বললেন, 'ডার্লিং, কিন্তু সে রাত্রের সবচেয়ে সেরা নাচের জন্য কে প্রাইজ পেল সেটা তো বললে না।'

তার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মা পেলেন ফার্স্ট প্রাইজ, আমি সেকেন্ড। তাই তো আমি শাশুড়িদের বিলকুল পছন্দ করিনে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আচ্ছা আহাম্মুক তো! নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভালরি। তোমাকে কী করে পয়লা প্রাইজ দিত?'

পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গিন্নির রাগ, আমি ওর সঙ্গে নাচলুম না কেন? আচ্ছা মশায়, বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিংবা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না, আপন স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপন স্ত্রী। রসের বাজারে আপন-পর করা যায়?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'তাই তো আমি নিবেদন করলুম, "যাঁর চরিত্র উদার—অর্থাৎ যিনি রসিক জন— তাঁর কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন"।'

পেটার নয়রাট বললেন, 'গিন্নি অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউই এটিকেটের ধার ধারিনে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা 'ট্যুনিস', 'শেলে'র গল্প আছে। 'ট্যুনিস— শেল'কে চেনেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আগাগোড়া একটি প্রতিষ্ঠান' বলতে পারেন। "ট্যুনিস্‌" কথাটি এসেছে লাতিন "আন্তনিয়ুস" থেকে। আন্তনিয়ুস গালভরা, গেরেমভারি, খানদানি ঐতিহাসিক নাম। আর ট্যুনিস্‌ অতিশয় প্লিবিয়ান অপভ্রংশ— নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।'

আমি বললুম, 'আমাদের "পঞ্চানন" নামটাও গেরেমভারি কিন্তু তার গার্হস্থ্য সংস্করণ "পাঁচু"টাতেও ওইরকম রসসৃষ্টি হয়।'

'তাই নাকি? আপনারাও তা হলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর "শেল" কথাটার মানে "ট্যারা"। বুঝতেই পারছেন, পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়াদত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন ওরা দু জন ড্যুক ব্যারন নন— খাঁটি ওয়ার্কিং কেলাস। খায়দায়, ফুর্তিফার্তি করে, ফোকটে দু পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ারখানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।

www.pathagar.com

'একদিন হয়েছে কী, ট্যুনিস্-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে— তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই-বা জমবে কী করে?

'ট্যুনিস্ বলল, "চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারাদি করা যাক।" দু জনা ঢুকল গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় আর অর্ডার দিল দু খানা কটলেটের।

'ওয়েটার এসে ছুরিকাঁটা আর দু খানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আনল একখানা বড় ডিশে করে দুখানা কটলেট।'

নয়রাট বললেন, 'কটলেট তো আর অ্যারোপ্লেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে দিয়ে মেপেজুকে কিংবা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই একখানা কটলেট আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আশ্চর্য কী?'

'ট্যুনিস তাই ঝপ করে বড় কটলেটখানা আপন প্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ করে দেখল। তার পর আস্তে আস্তে ছোট ছোট কটলেটখানা তুলে নিয়ে ট্যুনিসকে বলল, "ট্যুনিস, আদব-কায়দা একদম জানিসনে।"— যেন নিজে সে মহা খানদানি ঘরের ছেলে।

'ট্যুনিস শুধাল, "কেন, কী হয়েছে?"

'শেল বলল, "ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।"

'ট্যুনিস বলল, "অ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতিস তবে তুই কী করতিস?"

শেল দম্ভ করে বলল, "নিশ্চয়ই ছোট কটলেটটা তুলতুম।"

'তখন ট্যুনিস বলল, "সেইটেই তো পেয়েছিস, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস কেন?"

নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।

বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কীরকম লাগল— আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।

নয়রাট বললেন, 'তাই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড্ড বেশি কপচাতে শুরু করে তখনই আমার এই গল্পটাকে মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দু দিন। তার ভিতর কত হাঙ্গামা, কত হুজ্জত। সেইসব সামলাতে গিয়েই প্রাণটা খাবি খায়। তার ওপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ আর নবদ্বার বেঁধে দাও (ফ্রান্ৎসিস্কার আপত্তি শোনা গেল, "পেটার, আবার অশ্লীল কথা!") তবে দম ফেলব কী করে? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট, থুথু ফেলার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট— প্রাণটি যায় আর কী।'

আমি সায় দিলুম।

তখন নয়রাট শুধালেন, 'বলুন তো, কী সে জিনিস যা চাষা অনাদরে, তাচ্ছিল্যে, এমনকি বলতে পারেন, ঘেন্নাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদুরস্ত দামি রুমালে ঢেকে, পকেটে পুরে অতি সন্তর্পণে, বাড়ি নিয়ে আসেন?'

আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'তা তো জানিনে।'

বললেন, 'সিকনি। চাষা ফাঁত করে রাস্তায় নাক ঝেড়ে এদিকে আর তাকায় না, ভদ্রলোক রুমাল খুলে ছিঁক করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে, সেটিকে সযত্নে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাড়ি ফেরেন।'

ফ্রান্ৎসিস্কা হঠাৎ বললেন, 'পেটার, তুমি তো বকবক করে এটিকেটের নিন্দাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছ, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে এটিকেটের অন্ত নেই।

www.pathagar.com

এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, "ওরিয়েন্টাল কার্টসি"। যে আচার ওঁদের, তুমি তাই নিয়ে মশকরার পর মশকরা করে যাচ্ছ।'

পেটার বললেন, 'আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানার্স) নিন্দে করছিনে, আমি করছি এটিকেটের। দুটো তো এক জিনিস নয়।'

তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কী রকম?'

আমি বললুম, 'অনেকটা আপনাদের দেশেরই মতো। অর্থাৎ, ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টা আমরাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনারই মতো টীকাটিপ্পনী কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ— তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লক্ষ্ণৌ। সেখানে কোনও খানদানি বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতে হলে বাড়িতে উত্তমরূপে আহারাদি সেরে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলিসে গল্প উঠবে, কোন মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন সাহেবজাদা দুই তোলা, কোন পিরজাদা এক তোলা আর কোন নওয়াব একদম খেতেনই না। অথচ সংস্কৃত আপ্তবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।'

কর্তা-গিন্নি উভয়েই শুধালেন, 'আপ্তবাক্য কী?'

আমি বললুম—

'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে, মা প্রাণেষু দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে প্রাণাঃ জন্মনি জন্মনি ॥

অর্থাৎ—

ওরে, মূর্খ, নেমন্তন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মায়া করিসনি, কারণ ভেবে দেখ, নেমন্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই-বা কী— প্রাণ তো ভগবান প্রতি জন্মে ফ্রি দেয়, তার জন্য তো আর খরচা হয় না।'

*　　　*　　　*

আমি বললুম, 'চমৎকার রান্না হয়েছে'— রান্না সত্যই মামুলি রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোশাকি রান্না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার পর জিগ্যেস করলুম, 'রুশ কায়দায় মাছ কী করে রাঁধতে হয়?'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'আপনার বুঝি রান্নার শখ?'

আমি বললুম, 'না, তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নতুন নতুন দিশি-বিদেশি পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-বিদেশে ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন বাড়ির সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানারকম গল্প শোনে, মা-ও শোনেন, কিন্তু বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা-একলি শুধান, নতুন রান্না কী কী খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন ওগুলো কী করে রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কষ্ট করে এক্স্পেরিমেন্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরি করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা লিখে নিই; মাকে বলা মাত্র দুই ট্রায়েলের পরই ঠিক জিনিস তৈরি করে দেন।'

ফ্রান্ৎসিস্কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বলেন কী?'

www.pathagar.com

বললুম, 'হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিগ্যেস করেছিলুম, তিনি কোনও পদ না দেখে না চেখে তৈরি করেন কী করে? মা বলেছিলেন— এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে— "আরে বাপু, রান্না মানে তো, হয় সেদ্ধ করা, নয় তেলে-ঘিয়ে ভাজা, কিংবা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এরই একটা, দুটো কিংবা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উতরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনও মশলা জন্মায় না যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস আমি তৈরি করতে পারব না কেন?" '

তার পর বললুম, 'অবশ্য মা আমাকে কখনও এস্‌পেরেগাস্‌ কিংবা আর্টিচোক খাওয়াননি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিয়ে মায়েরও কোনও খেদ নেই— কারণ যেসব শাকসবজি আমাদের দেশে একদম হয় না সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বললেন, 'ও, পাছে তাঁর দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।'

আমি বললুম, 'হাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য উঠেপড়ে লেগে যেতেন তার আরও একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট। আর আমার মা—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'থামলেন কেন?'

আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, 'নিজের মায়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফলিয়ে বলছি।'

নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'ব্যস! হয়েছে। আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আপনাকে বলেনি, এ বাড়িতে এটিকেট বারণ?'

ফ্রান্‌ৎসিসকা তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছি, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, 'আদপেই না। ওঁর ধমক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সবকিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলেছিলুম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক আর্ট ফর আর্টস সেক নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুশির জন্য রেঁধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিংবা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না— তা নয়। তিনি রান্নার নতুন নতুন টেকনিক শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যেরকম নতুন নতুন টেকনিক শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো প্যাস্টেলপেন্টিং করতে পারেন, কিন্তু অয়েলপেন্টিং দেখে কিংবা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না সেই টেকনিক রপ্ত করার? কিংবা আপনি উড্‌কাট করেন— যদি লাইন এনগ্রেভিং, এচিং, মেদজোটিন্ট, আকওয়াটিন্টের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?

'অথচ দেখুন, খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদ্‌গ্রীবই হোক-না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না— নানা রঙের মাটি, শাকসবজি থেকেও নতুন রঙ আহরণ করার চেষ্টা করে।

'ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সবসময় জাফরান পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা "এরজাৎস" সবসময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুঝিয়ে বলছি—

www.pathagar.com

'আমাদের দেশে একরকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। শিউলির বোঁটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ি সাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বোঁটাগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বোঁটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরোয়। মেয়েরা সাধারণত ওই রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ওই রঙে ছুপিয়ে নিয়ে চিনি কিসমিস, বাদাম দিয়ে ভারি সুন্দর "মিঠাখানা" তৈরি করেন।

'এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির জন্য দেশি-বিদেশি কোনও উপকরণ অবহেলা করেন না।'

নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন যেন লজ্জা পেলুম।

* * *

রুশ কবি পুশকিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই—

'হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অন্ত না থাকে, তার গোলাঘর যদি বারো মাস ভর্তি থাকে, তার সদাশয় সচ্চরিত্র ছেলেমেয়ে যদি বাড়ি আলো করে রয়, তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবু তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয় তবে— তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ কর, সে অবস্থায় আমার চিত্তচাঞ্চল্য হয়।'

পুশকিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানি ঘরের ছেলে ছিলেন, কাজেই তাঁর 'চিত্তদৌর্বল্য' কী প্রকারের হতে পারত সেকথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।

আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, ঢাউস মোটরগাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এসবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই।

আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি— অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সর্বপ্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে না, তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসব্যসনের কথা ভাবছিনে, পেটের ভাত,— র[১] কাপড় হলেই হল।

'অবসর' বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছিনে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু শ্রী 'ক' দাশগুপ্ত। বদ্যির ছেলে— পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরি আপিসে কর্ম করে, বড়সাহেবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, মোটা তনখা ভি পায়।

বয়স তার এখনও তিরিশ পেরোয়নি। পার্টিশনের পর মারোয়াড়ি কারবারিরা যখন তার 'বস'কে ঘায়েল করে ব্যবসা কিনবার জন্য উঠেপড়ে লাগল, তখন আমার এই বদ্যির ব্যাটা সায়েবকে এমন সব 'কৌশল' বাতলালে যে উল্টে ওনারা চোখের জলে নাকের জলে।

১. শব্দটা গ্রাম্য; কিন্তু পূজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেননি বলে আমি ড্যাস দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন— তাঁর শাস্ত্রাধিকার আছে।

www.pathagar.com

সায়েবও বড় নেমকহালাল[২] লোক। প্রায়ই 'হ্যালো, ড্যাস-গুপটা', বলে বাড়িতে ঢোকেন, 'লৌচি' (লুচি) খেয়ে যান, ড্যাস-গুপটার ছেলেদের জন্য পুজোর বাজারে দু চারখানা 'ডৌটি (ধুতি)ও রেখে যান। আমি বরাবর সকালটা দাশগুপ্তের বাড়িতে কাটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাত হয়ে যায়। লোকটি এদেশে আসা সাধারণ ইংরেজের মতো গাড়ল নয়, ইংরেজি শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মধুরকণ্ঠে উচ্চস্বরে শেলি-কিটস্ আবৃত্তি করতে পারে।

সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।

আমি জানি দাশগুপ্ত কোনও চেম্বার অব্ কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেয়ার করে।

আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচ শ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইট স্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাত ঘণ্টা কাটায়— নাইট স্কুল খোলবার মোকা পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাস নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দায় বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে— চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি।
করেন শঙ্খ-চক্রধারী ॥
'খ' রে খগ-আসনে খগপতি।
খটন্তি লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥
'গ' রে গরুড়— ইত্যাদি—

(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনও অপরাধ না নেন— যদি নামতাতে কোনও ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।

অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবনমৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। কে ক-লক্ষ মণ পাট কিনল, কে ধাপ্পা এবং ঘুষ দিয়ে ক-খানা ওয়াগন বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনও প্রকারের চিত্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় 'দিল্‌চস্‌পি') নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচ শ' হলে সে দুম করে মোটরখানা বিক্রি করে দিয়ে ট্রামে চড়ে ইস্কুলগুলোর তদারক করবে।

আপনি বিচক্ষণ লোক আপনি শুধাবেন, এ পাগলামি কেন?

এটা পাগলামি নয়।

আসলে দাশগুপ্ত ইস্কুল মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুর্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদাও তাই, তাঁর বাপও তাই, তাঁর উপরের খবর জানিনে।

এবং আমার সুহৃদ যে কী অদ্ভুত ইস্কুল-মেস্টার সে-কথা কী করে বোঝাই? চাকরির ঝামেলার মধ্যিখানেও সে একটা নাইট ইস্কুল চালায়।

---

২. 'নেমকহারাম' অর্থাৎ 'অকৃতজ্ঞ' সমাসটা বাংলায় চলে। 'নেমকহালাল' ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞ'। 'নেমকহালাল' কথাগুলো কিন্তু 'কৃতজ্ঞ' 'অকৃতজ্ঞে'র চেয়ে জোরদার। 'নমক' = 'নুন'— তার 'অপমান' (হারাম) কিম্বা 'সম্মান' (হালাল)।

www.pathagar.com

একদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইস্কুলে ইংরেজি পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'আই গো!'

ছোঁড়ারা তীব্রকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, 'আই গো!'

'উই গো!'

'উই গো!'

'ইউ গো!'

'ইউ গো!'

'হি গোজ!'

'হি গোজ!'

'রাম গোজ!'

'রাম গোজ!'

'শ্যাম গোজ!'

'শ্যাম গোজ!'

দাশগুপ্ত সদ্দার-পোড়োর মতো বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চিৎকার করে দোহার গাইছে।

সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচাল, 'রাম অ্যান্ড শ্যাম গো গো গো!'

দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনও বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনও আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট স্কুলে নাইট স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।

দাশগুপ্তের কথা যাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনীটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।

ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।

নয়রাট মেট্রিক পাস করেন ১৮ বছর বয়সে, সংসারে ঢোকেন ১৯ বছর বয়সে। তার পর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখেন এতখানি পুঁজি জমেছে যে, বাকি জীবন তাঁকে আর সংসারখরচের জন্য ভাবতে হবে না।

নয়রাটের ভাষাতেই বলি,

'টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনও পায়নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল—কিন্তু হিসাব করে দেখলুম, সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসালা পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখ-বিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই দিইনি— ওই শুধু বিয়ের সময় যে সাতদিন হনিমুন কাটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।'

ফ্রান্ৎসিস্‌কা বললেন, 'তা ছুটি নিয়েছিলে কেন? আমি বলিনি, তোমার আপিসঘরে, কিম্বা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গুদোমঘরে পাদ্রি ডেকে মন্ত্র পড়লেই হবে।'

নয়রাট বললেন, "অন্য মতলব ছিল ডার্লিং, তোমাকে তো আর সবকিছু খুলে বলিনি।'

ফ্রান্ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে।'

www.pathagar.com

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে খুলে কই।'

'বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সে গাঁটা খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গাঁ থেকেও আধ মাইল দূরে একটি 'শালে' ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকটিরিক আছে— ব্যস আর কিছু না। জলের কল না, খবরের কাজ না, দুধওয়ালা দুধ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।'

'রাত্তিরে ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

ফ্রান্‌থসিস্‌কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বলল—'

ফ্রান্‌থসিস্‌কা বললেন, 'চোপ্।'

নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্।' তার পর আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে কমিয়ে-সমিয়ে বলছি—বাদবাকিটা পরে আপনাকে একলা-একলি বলব।'

'ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নামলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুঁয়ো গিলে ধরালুম উনুন। তার পর বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুঞ্চাতে সাজিয়ে গেলুম উপরের তলায় ফ্রান্‌থসিস্‌কার বিছানার কাছে। আস্তে আস্তে জাগিয়ে বললুম, "ব্রেকফাস্ট তৈরি।"

ফ্রান্‌থসিস্‌কা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল (আবার 'চোপ' এবং 'আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্' শোনা গেল), "ডার্লিং তুমি আমাকে কত-না ভালোবাসো— এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছু না বলে তুমি এতসব করেছ।"

'আমি বললুম, "ডার্লিং না কচু, ভালোবাসা না হাতি। আমি এসব তৈরি করে আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদবাকি জীবন তোমাকে এইরকমধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাব।'

আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।

দেখি নয়রাটও মিটমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রান্‌থসিস্‌কা বললেন, 'আপনি এই তাড়িখানার বেহুদা প্রলাপটা বিশ্বাস করলেন?'

আমি বললুম, 'কেন করব না? শাদির পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরও মেলা দেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নতুন কিছু নয়। এবারে সুইস সংস্করণটি শেখা হল এই যা।'

দুজনেই জিগ্যেস করলেন, 'সে আবার কী?'

আমাকে বাধ্য হয়ে শাদির পয়লা রাতে বেড়াল-মারার গল্পটা বলতে হল, কিন্তু নয়রাটের মতো জমাতে পারলুম না— রসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

দু জনেই স্বীকার করলেন, ইরানি গল্পটাই ভালো![৩]

তখন ফ্রান্‌থসিস্‌কা বললেন, 'পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না,

৩. পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব, দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, পেটার কক্‌খনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ বক্তব্য যে ব্রেকফাস্টের বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনও কন্‌টিনেন্টাল শূয়ারের মতো ব্রেকফাস্টের সময় এক গাদা বেকন আর আণ্ডা গেলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোনও ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার ওপর দিয়ে।'

পেটার বললেন, 'রেমব্রান্ট একবার এক ভদ্রলোকের মায়ের পর্ট্রেট এঁকেছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রান্ট বললেন, "এক শ বছর পর আপনার মায়ের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না— তারা দেখবে ছবিখানি উতরেছে কি না।"

তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটি ভালো কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর; আপনি কী বলেন?'

আমি বললুম, 'সুন্দর-ই সত্য— না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট বললেন, 'আমার শখ ছিল দাবা খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ আমি কখনও করিনি। দাবা খেলা আমি আরম্ভ করি সাত বছর বয়সে। আমার বাবা-কাকা দুজনেই পাঁড় দাবাড়ে ছিলেন আর কাকা রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাত্রে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল বলে আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হন্যে হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, "তা আমার সঙ্গেই খেল না কেন?" বাবা তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস—বরঞ্চ মদের মাতাল খুনির সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজি হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্রও আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু বাজি জিতলেও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাত এবং তার পর তিনি আর কখনও জেতেননি। তবে তাঁর হল বুড়ো হাড়, এখনও খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাতলে দিতে পারেন।'

আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্জেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ওই কথাই বলেছেন; খুড়ো শেষ বয়সে আটপৌরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তাঁর কাছে যেত। সেকথাটা নয়রাটকে বলতে তিনি বললেন, 'অতিশয় হক্ কথা। পৃথিবীতে মেলা ধর্ম আছে— তাই ক্রিশ্চান, জু এবং দাবাড়ে। দাবা খেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এ ধর্ম মানে তারা সব-ভাই সব-ব্রাদার। দাবাড়েদের "পেনফ্রেন্ড" পৃথিবীর সর্বত্র যেরকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।'

তার পর বললেন, 'সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তার পর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাইনি। একবার এক পাঁড় মাতালকে বলতে শুনেছিলুম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উল্লুকটা বলে কী— উদয়াস্ত যে লোকটা "ট্যানিসে"র উপর থাকে, সে কি না জীবনে কুল্লে একটিবার মদ খেয়েছে! বেহেড মাতাল এরেই কয়। তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই— তার পর থেকে এ অবধি শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'ওমর খৈয়াম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ খায় না, তবু অনেকটা এরই কান ঘেঁষে। খৈয়াম বলেছেন, "রোজার পয়লা রাত্তিরে অ্যায়সা পিনা পিউংগা যে তারই নেশার বেহুঁশিতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো মাসটা। হুঁশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পর্ব (পর্ব par exellence), পর্ব মানতে হয়, না হলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যাব সুরাহি পেয়ালা প্রিয়া নিয়ে।" তার পর খৈয়াম কী করেছিলেন সে হদিস তাঁর রুবাইয়াতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দুসরা রমজান তক্ তিনি তাঁর কায়দা-কানুনে কোনও রদ্‌বদল করেননি।'[৪]

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এখন বললেন, 'আমি তো এ রুবাই ফিটজিরাল্ডে পাইনি। আপনি কি ফার্সিতে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'ফিটজিরাল্ড তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাত্তর না বিরাশিটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ' না এক হাজার, আমি ঠিক জানিনে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিংবা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। এঁরা ওমরের প্রায় কোনও রুবাই[৫]-ই বাদ দেননি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আপনি যে বললেন, "ওমরের নামে প্রচলিত রুবাইয়াৎ" তার অর্থ কী? আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়?'

আমি বললুম, 'গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, "এই বিরাট বিশ্ব-সংসার কোন নিয়মে চলে, কী করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার-আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দু দিন এ সংসারে আছ সে দু দিন ফুর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কী হবে, না হবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।" তার পর থেকে অন্য যে কোনও কবি এই মতবাদ প্রচার করে নতুন রুবাই লিখতেন তিনি তক্ষুনি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল্-মুলুকও ছিলেন তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড। তাই তিনি নির্ভয়ে ইসলামবিরোধী এই চার্বাকি মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সৌভাগ্য তো হয়নি— তাঁরা মোল্লাদের বিলক্ষণ ডরাতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতেন—ওদিকে যা বলবার তা-ও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।

'তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তথাকথিত 'কম্প্লিট ওয়ার্কসে') ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোনগুলো, হাফিজের কোনগুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।'

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর কোনও কম্মের নয়। তার স্বর্গপুরীর বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,

'সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে,

৪. সুফিরা মদ্য 'ভগ্‌বদ-প্রেম' অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

৫. 'রুবাই' একবচন, 'রুবাইয়াৎ' বহুবচন।

www.pathagar.com

ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙি তার কাছেতে
গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর
সেই তো সখি, স্বর্গ আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।'

'অত সব বয়নাক্কার কী প্রয়োজন!

'এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তিমাত হয়?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবি গল্প শোনা যায়— আমার মন সেগুলো মানতে রাজি হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন; খুদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইসলামের মতো কট্টর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন সাহসে? বুঝলুম না হয় রাজা আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়। সে যুগে দেশের পাঁচজন কী ভাবত না-ভাবত তার হয়তো খুব বেশি মূল্য ছিল না কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সমঝে চলতেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজাতে-পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কী হয়? হুকুম চালাবার জন্য রাজারা সৈন্যের ওপর নির্ভর করেন। সৈন্যরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়ামাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজি ; পক্ষান্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায়।

'এ তো হল কমন সেন্স। তাই এস্থলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল?

'ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে— কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়তো হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—'

নয়রাট বললেন, 'ফের এটিকেট? আর এটিকেট হলই-বা— আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টার্মস্ অব চেস্। আপনি এখন ওপনিং গেম্ আরম্ভ করেছেন, তার পর মিড্ গেম আসবে— আমি দেখছি আপনি ঘুঁটিগুলো কী কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন— যা বলছিলেন বলে যান।'

আমি বললুম, 'ইরানের সভ্যতা-সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরের খানদানি। ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে গ্রিসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম সীমান্ত দখল করেছে, মিশরিদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবু করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানিরা যে স্থাপত্য, যে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো কলানিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাস ব্যসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ইরানিরা যেরকম পঞ্চেন্দ্রিয়ের পূর্ণতম আনন্দ গ্রহণ করেছে সেরকমধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনও করতে পারেনি।

'এই ধরুন না, আরব্য উপন্যাস। অথচ বেশিরভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের— আমার ব্যক্তিগত 'ফেন্সি' মত নয়, পণ্ডিতেরা একথাই বলেন।

www.pathagar.com

'মনে পড়ছে সেই গল্প?— যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁকা-মুটেকে নিয়ে চলল হরেকরকমের সওদা করতে। মাছমাংস, ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যেসব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল তার সবকটা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরেজি, কি ফরাসি, কি বাংলা কোনও ভাষাতেই সম্ভব হয়নি— কারণ, এসব জিনিসের বেশিরভাগই আমাদের অজানা। এমনকি আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সেসব বস্তু কী, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পাঁচ শ রকমের সেন্ট বিক্রি হয় সেগুলোর বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এস্‌কিমো ভাষায় সম্ভব?

'ইরানের তুলনায় সে যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত— অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাঁধনে একজোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফুর্তি-ফার্তিতে বে-এক্তেয়ার ইরানিরা লড়াইয়ে হেরে গেল! আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রিস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমার বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে "সুইটজারল্যান্ডে ঘড়ি আনার মতো"।

'ইরানিরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানত দেশে থাকলে অর্থনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হতেই হবে, তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে— সে ইতিহাসও এস্থলে অবান্তর।

'আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাস-ব্যভিচার দেখে স্তম্ভিত— 'শক্‌ট', 'আউট-রেজড'। আবার ইরানিরাও আরবদের বেদুইন ধরন-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং 'শক্‌ট'।

'তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদি গোত্রের সঙ্গে তাদের 'মেলে'), আর ইরানিরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কী হয়? প্যারিসের ক্রিশ্চান আর নিগ্রো ক্রিশ্চান কি একই ব্যক্তি?

'এইবার মোদ্দা কথায় ফিরে যাই; ইরানিরা মুসলমান হল বটে (এবং এদের অনেকেই খাঁটি মুসলিম) কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চ'মকার ছাড়তে পারল না। তাই ইরানের জনসাধারণ, ওমরের মদ্য-দর্শনবাদ খুশিসে বরদাস্ত করে নিল।

'দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায় তখন রাজার আর কী ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক— এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারেমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।

'তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনও মুশকিলে পড়লেন না।'

* * *

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেলও তা।'

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধালুম, 'ট্যুনিস-শেল নিয়ে তো সব রসিকতার গল্প, আর খৈয়াম তো রচেছেন চতুষ্পদী।'

নয়রাট বললেন, 'মিলটা অন্য জায়গায়। আপনিই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বর-বিদ্রোহী, মদ্যোৎসাহী চতুষ্পদী— তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আত্তারের হোক, সবকটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দু জন হয়, আর তার একজন আরেক জনের ওপর টেক্কা মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইক্‌ল্ (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইকল, ট্যুনিস-শেল সাইক্‌ল্ কিম্বা পলডি সাইক্‌ল্। ওমর যেরকম ইরানের, ট্যুনিস-শেল তেমনি জর্মনির কলোন শহরের আবার পলডি সুইটজারল্যান্ডের। আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইকল আছে?'

আমি বললুম, 'এন্তার! হর-পার্বতী সাইকল, গোপালভাঁড় সাইকল, শেখ চিল্লি সাইকল এবং আরও বিস্তর। কিন্তু পলডি সাইক্‌লের বিশেষত্ব কী?'

নয়রাট বললেন, 'পলডি হলেন অতিশয় খানদানি ঘরের ছেলে, উত্তম বেশ ভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার— এ তো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্কেশ্বর, আনাড়ির চূড়ামণি— বেঅকুফের শিরোমণি। দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—'

ফ্রান্‌ৎসিসকা বললেন, 'কিন্তু প্লিজ, অশ্লীলগুলো না।'

নয়রাট বেদনাতুরতার ভান করে বললেন, 'ফ্রানৎসিস্‌কাকে নিয়ে ওই তো বিপদ। এক শ' বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শ্লীল-অশ্লীল— একেবারে স্বতঃসিদ্ধরূপে অর্থাৎ perse— পৃথিবীতে নেই, যেরকম নিজের থেকে 'ডার্ট' বা ময়লা বলে কোনও জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডার্ট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়— একথা কেউ বলে না, 'ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ কর', বলে, 'ডাস্টবিন ভর্তি হয়ে গিয়েছে।' ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডার্ট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার! আবার!'

আমার মনে হল, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুনগুন্ করলুম,

'অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলঢুলু আঁখি'

দুজনেই জিগ্যেস করলেন, 'মানে?'

আমি সালঙ্কার সবিস্তর নন্দকুমার গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বুলরাগের বর্ণনা দিলুম।

নয়রাটকে আর পায় কে? চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'শুনলে, গিন্নি শুনলে? শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান, আমাদের যেরকম যিশুখ্রিস্ট। তিনি যদি রাধা ভিন্ন অন্য রমণীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিংবা ইভনিং শার্টে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন?'

ফ্রানৎসিস্‌কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী চিড়্ মিথ্যেবাদী রে, বাবা! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পুরুষ— হ্যাঁ পুরুষই বটে— শব্দের জন্য পকেট-ডিক্সনারি বের করে তার গালে লিপস্টিক! ডু লিবার হ্যার গট ফন বেনটাইম (বাংলায়— "হে পিণ্ডিদাদন খানের মা কালী।")'

আমি বললুম, 'কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সেকথা থাক, শ্লীল-অশ্লীল সম্বন্ধে আপনি কী যেন বলছিলেন?'

www.pathagar.com

নয়রাট বললেন, 'perse বাই ইটসেলফ যেরকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হক্কে কোনও জিনিস অশ্লীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি,— যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আরম্ভ করা অশ্লীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্কা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল।'

'অর্থাৎ বক্তব্য বস্তু প্রতীয়মান, জাজ্বল্যমান করার জন্য যে কোনও দৃষ্টান্ত, যে কোনও তথ্য, যে কোনও গল্প শ্লীল— তা সে পঁচিশবার দান্তের বয়ানই হোক, গণিকা জীবনকাহিনীই হোক। পক্ষান্তরে ইর্‌রেলেভেন্ট আউট অব প্লেস (বেমক্কা) জিনিস, তা সে ধর্মসঙ্গীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।'

আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশের ভটচাজ মশাই ('পদটীকা' দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মৌলানা মির আসলম ('দেশে-বিদেশে' দ্রষ্টব্য) ওই একই কথা বলেছিলেন।

আমি বললুম, 'খাঁটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরঞ্চ একটা পলডি গল্প বলুন।'

নয়রাট বললেন, 'সেই ভালো।'

'পিয়ন পলডিকে মনিঅর্ডারের টাকা দিল। পলডি দিল জোর টিপস। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, "পলডি, অত বেশি টিপস দিলে কেন?" পলডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে বলল, 'ওই তো! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না; জোর টিপস দিলে ঘন ঘন মনিঅর্ডার নিয়ে আসবে না?" '

আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, 'কিংবা ধরুন পল্‌ডির বুকে ব্যথা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, "ঠিক ডায়গ্‌নোজ করতে পারছিনে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।" '

পল্‌ডি হেসে বললেন, 'তাই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যাননি।'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি-রসিকতাতে শুধু থাকে রস। ওগুলোর ভিতর দিয়ে পল্‌ডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবর পাওয়া যায় না কিন্তু ট্যুনিস-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জর্মনি, কলোনের শ্রমিক-শ্রেণি এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রি সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তারই একটা ট্যুনিস-শেল সাইক্লে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।

'ট্যুনিস আর শেল একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার ওপর কার হক। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল্‌ বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং 'পজেশন ইজ থ্রি-ফোর্থ অব ল'। তার পর এ বলে ও মিথ্যেবাদী, ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বলল, "তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছু সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি পাঁড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পেঁচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।" শেল্‌ বলল, "গাঁজা, ঠিক তার উল্টো।"

www.pathagar.com

'তখন স্থির হল পাল্লা দিয়ে দু জনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সবচেয়ে বেহুদা বেশরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা সে-ই পাবে।

'তখন ট্যুনিস বিস্‌মিল্লা বলে আরম্ভ করল—

'পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লম্ফে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পৌঁছুল এক সমুদ্রপারের 'লিডো'তে। দেখি হাজার হাজার মেয়েমদ্দ সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুঁড়িগুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেকটাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টুম হয়ে যায়। (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার, আবার?' নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, টাপেটোপে বলছি'।) আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। করলুম কী, সবকটা হুলো-মেনিকে ধরে একটা ব্যাগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবার পৌঁছলুম, ফুজি-আমা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল ক্যাঁও ম্যাঁও করছিল বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল। তাই আস্ত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই ঢেকুর তুললুম, তার পর—"

'শেল্ বাধা দিয়ে বলল, "এতে আর মিথ্যে কোনখানটায় হল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলুম, পষ্ট দেখলুম, তুই এসব করছিলি।" '

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা গল্পটা আগে শোনেননি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, 'এ গল্পটা ভারি নতুন ধরনের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিল।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা এখনও শেষ হয়নি।'

আমরা বললুম, 'সে কী কথা?'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা যদিও খাস কলোন শহরের, তবু তার টেকনিকে একটু চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে। এ গল্পে দুটো 'সারপ্রাইজ', কিংবা বলতে পারেন দুটো কিক আছে। খুলে বলছি :

'ট্যুনিস আর শেল্ যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাদ্রি সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিংবা স্বেচ্ছায়ও হতে পারে, ট্যুনিস-শেলের বিকট মিথ্যের বহর তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল। থাকতে না পেরে বলরেন, "ছি, ছি, বাছারা; এরকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বের করছ কী করে? জান না, মিথ্যা কথা মহাপাপ? আমি জীবনে কখনও মিথ্যা বলিনি।" '

'ট্যুনিস পাদ্রির কথা শুনে প্রথম হকচকিয়ে গেল, তার পর থ মেরে গেল। সম্বিতে ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেল্‌কে বলল, "ভাই শেল্, নোটটা ওকেই দে, টাকাটা ওরই পাওনা। তুই এরকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবিনে; আম্মো পারব না।" '

আমি বললুম 'খাসা গল্প; এটা মনে রাখতে হবে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সে-ই পেত।'

আমি নয়রাটকে বললুম, 'গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কী আছে? আমাদের মোল্লা-পুরুত সম্বন্ধেও তো এরকম বদনাম আছে।'

নয়রটি বললেন, 'আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা— আর এর জবাব আপনি দিতে পারবেন না।

www.pathagar.com

'ট্যুনিস-শেল্ আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (ট্যুনিস-শেল্ সাইক্লের ভিতরে হচ্ছে "নোটের সাব-সাইকেল")। এবারে ঝগড়া হয়নি। দু জনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিশ তাদের পৌঁছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশা কেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফাট, ছিমছাম। ট্যুনিস শুধাল, "ওরে শেল্, এ আবার এলুম কোথায়?" শেল্ বলল, "আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।"

'শেল্ গেল ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর ছুটে এসে বলল, "ওরে ট্যুনিস— আমরা ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছি— রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।"

ট্যুনিস তো তাজ্জব। শুধাল, "কী করে জানলি?"

'বললে, করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে "Die Toiletten bifinden sich auf jenseits des Ganges." '

নয়রাট বললেন, অর্থাৎ "করিডরের দু পাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে।" এখন 'করিডর' শব্দ জর্মনে Gang আর Gang-এর দু পাশে— অর্থাৎ ষষ্ঠী তৎ-পুরুষ Ganges, তার মানে বাথরুম গঙ্গার (নদীর) দু পারে।'

'তাই ট্যুনিস-শেল্ রাতারাতি ভারতে পৌঁছে গিয়েছে।'

নয়রাট বললেন, 'দেশভ্রমণের গল্পই যদি উঠল তবে সেই সাবসাইক্লই চলুক।'

আমি বললুম 'উত্তম প্রস্তাব।'

নয়রাট বললেন, 'ট্যুনিস-শেল্ পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জাহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পৌঁছেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে— '

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'না, পেটার, ওটা চলবে না।'

নয়রাট ব্যথাভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা; তার আর কী করা যায়! তবে তাদের নিয়ে যাই নিউইয়র্কে।

'হয়েছে কী, ট্যুনিসের এক মামা নিউইয়র্কে দু পয়সা রেখে মারা গিয়েছে। ট্যুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের শনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে ট্যুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরনের লোক। একা বিদেশ যেতে ডরায়— শেল্‌কে বলল, "ভাই তুই চ।" শেল্ ভাবল— আর আমিও তাই ভাবতুম— মন্দ কী, ফোকটে মার্কিন মুল্লুকটা দেখা হয়ে যাবে।

'তারা নিউইয়র্ক পৌঁছল ঠিক বড়দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ ঝেঁটিয়ে এসে জড় হয়েছে নিউইয়র্কে পরব করার জন্য, সব হোটেল আগাগোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প কট্ পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।

'মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অক্কালাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করল। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু—'

আমি বললুম, 'আলবত মানি। এক শ' বার মানি। কলকাতায় মৌলা আলীর দর্গায় মোমবাতি মানত করলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।'

ফ্রান্ৎসিস্কা শুধালেন, 'ডিভোর্স পাবার দরগা আছে?'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনাটা জানাতে হয়।'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' তার পর গল্পের খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'কলোনের মা মেরি বড় জাগ্রত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটায় একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই আঁতকে উঠলেন।

'ঘর পঞ্চাশ তলায়, আর লিফট্ বিগড়ে গিয়েছে!

'দুইজনাই একসঙ্গে বলল, "হে মা মেরি, এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্টা সারাতে পারলে না মা?"

আমি বললুম, 'আমাদের গোপালভাঁড়ও তাই বলেছিল,—

'এত দয়াই যদি করলি, মা কালী,
তবে আরেকটু দয়া করে,
বনে আছে দেদার ফড়িং
খা না দুটো ধরে।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা কী?'

আমি বললুম, 'আপনাকে একদিন সময়মতো আমাদের "গোপালভাঁড়-সাইক্ল" শোনাব, তবে তার অনেকগুলো ফ্রান্ৎসিস্কার সামনে বলা চলবে না।'

নয়রাট বললেন, 'তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।'

সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রান্ৎসিস্কা ভাঁড়ারঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'অত তাড়া কিসের? ভারত যাবার জাহাজ আরও সপ্তাহখানেক পর ছাড়ে।'

নয়রাট বললেন, 'তখন ট্যুনিস শেল্কে বলল, "ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ, সিঁড়ি ভাঙি আর কি?"

'শেল্ বলল, "একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক-একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগুল হয়ে আমরা পঞ্চাশতলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।"

'ট্যুনিস বলল, "যা বলেছিস, সাধে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন", বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলা।'

নয়রাট বললেন, 'সে কত বাহারে গল্প। আমি গল্প কলেক্ট করিনে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সবকটা জানেন।

'তা সে কথা থাক।'

ট্যুনিস আর শেল এক-এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যুনিস এক-একখানা জান্-তর্-র্-র্ গল্প ছাড়ে। হেসে খেলে বিন্-মেহনত, বিন্-কসরতে তারা পঁচিশতলা এক ঝটকায় মেরে দিল।

'তখন ট্যুনিস বললে, "ভাই শেল, আমার সব গল্প খতম। আর কোনও গল্প মনে পড়ছে না।"

'তখন শেল্ বলল, "ঘাবড়াসনি। আমারো কিছু পুঁজি আছে।"

'বলে তখন শেল্ আরম্ভ করল গল্প বলতে। সে-ও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যুনিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।

www.pathagar.com

'করে করে তারা আরও চব্বিশখানা সিঁড়ি ভাঙল— গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।

'মাত্র একতলা বাকি। শেল্ দুম্ করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটকায় হোক আর উনপঞ্চাশ ঝটকায়ই হোক পাগুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল্ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বলল, "ভাই আমার গুদোমও খতম।"

'তখন ট্যুনিস বলল, "কুছ্ পরোয়া নদারদ। আমার একখানা খাসা গল্প মনে পড়েছে— একদম সত্যি গল্প।— আমরা ফ্ল্যাটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।"

লঞ্চ খেতে এসে তখন প্রায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গালগল্পের কম্বলের ভিতর এমনি ওম জমে গিয়েছে যে সে কম্বল ফুটো করে বেরোতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো— উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গসুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না— তাই এদের কুণ্ডলিতে বহুদিন পরে যেন 'বসন্ত' রেস্টুরেন্টের আনন্দ পেলুম।

শেষটায় একটা হাফ্-মোকা পেয়ে বললুম, 'আমি তা হলে উঠি।'

নয়রাট একটি কথা বললেন, 'কেন?'

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, 'সে কী কথা? এখনই যাবেন কেন?' কিংবা 'বড্ড কাজ পড়ে আছে বুঝি?' অথবা অন্য কিছু। আমার কোনও জবাব যোগাল না।

নয়রাট বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনাকে বলিনি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গেল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাড় দিয়ে কাজকর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ওই একই বেঞ্চের উপর— তা-ও আবার একই পাশে বসে আছেন। শুনেছি, ইংলন্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্য ট্যাক্স দিতে হয়—'

ফ্রান্ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মরে গিয়ে তাকে ডেথ্-ট্যাক্স দিতে হয়।'

নয়রাট বললেন, 'তা হলে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের ওপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলন্ডে জন্মালে হত।'

ফ্রান্সৎসিস্‌কা বললেন, 'আহা, আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখানে প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে, আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।'

আমি বললুম, 'ষাট, ষাট (ইংরেজিতে tut tut), ওরকম অলুক্ষণে কথা কইবেন না।'

সমস্বরে, 'কেন?'

আমি বললুম 'তা হলে আসছে জন্মে, পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলন্ডে আর মাদাম ফ্রান্ৎসিস্‌কা (বলে তাঁর দিকে 'বাও' করে বললুম) আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।'

দু জনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওতরাল তার মোটামুটি জিজ্ঞাসা, 'আসছে জন্মে' কথাটার মানে কী? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বর্গে যাব, কিংবা নরকে, কিংবা কপ্পুর হয়ে যাব, কিন্তু 'আসছে জন্মে' তার অর্থ কী?

আমি বললুম, 'এই যে পেটার শুধালেন, আমি বেঞ্চিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন? সুইট্‌জারল্যান্ড যদি ইংলিশ কায়দায় বেঞ্চিতে

www.pathagar.com

বসতে হত তা হলে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যেতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক অনেক বেশি।'

লাইন কোন দিকে চলেছে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রাতভর হদিস না পেয়ে শুধালেন, 'এর কোনও মানে হয় না। আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন? ইংলন্ডের মতো বর্বর দেশেও ওরকম ট্যাক্স নেই।'

আমি বললুম, 'পরজন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূর্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোনওকিছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি, তবে ভগবান ভাববেন, আমি ওই কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মরি আর কী, জলঝড়ে, বিষ্টিতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পার্শেল বয়ে বয়ে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিনে কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কী করে হয়?'

জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেস্থলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, 'জন্মান্তরবাদ' এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্ষুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না। তাই তো লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারব কী করে?

তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না। যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করত। সেই যুগের একটি আরবি কবিতা এই সুবাদে মনে পড়ল।

কবিতাটির গীতিরস বাংলাতে অনুবাদ করার মতো বাংলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই কিন্তু কল্পনাচতুর পাঠক হয়তো আমার অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তত্ত্বটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলছে,

'প্রিয়ে,
আরবভূমি, মরুভূমি নীরস কর্কশ
তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস
কেউ বুঝতে পারল না।
তাই সর্বদেহমনহৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করি,
তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও—
— আসছে জন্মে—
কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,
যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার
আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।'

এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটুজলের বেশি গভীরতর কোনওপ্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করেছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।

www.pathagar.com

সে দেশ বাংলা দেশ। চেরাপুঞ্জির দেশ, যেখানে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদীনালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।

আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।

*   *   *

আমি বললুম, 'আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন সেইটি তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন আপনার গুটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি একটানা ছাব্বিশ বছর খেটে পয়সা জমিয়ে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কী?'

নয়রাট বললেন, 'এক নম্বর দাবা খেলা আর দু নম্বর— বলতে একটু বাধো বাধো ঠেকছে।'

আমি বললুম, 'এইবার আপনারা ভদ্রতা "আরম্ভ" করলেন।'

নয়রাট বললেন, 'ভদ্রতায় ঠেকছে না, ঠেকছে অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুলে যেতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষ্যাপাত— ছেলেরা এ বিষয়ে যে কীরকম ক্রূর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসাঁয় পড়েছেন। আমি তখনও গল্পটি পড়িনি কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুর্দৈব কাহিনী মোপাসাঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেননি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ-করুণা ইত্যাদি কোনও প্রকারের সদ্‌গুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয় সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর— আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ওই হতভাগ্য ছেলেটার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্রেক হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কী হয়, আমি ছিলুম একে রোগাপটকা, তার ওপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনওপ্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখের আড়ালে ওর হাতে একটা চকলেট গুঁজে দিতুম, রাস্তায় দেখা হলে একটা আইসক্রিম খাইয়ে দিতুম।

'প্রথম যেদিন তাকে চকলেট দিয়েছিলুম সেদিন সে আমার দিকে বদ্ধ ইডিয়টের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল, তার পর দরদর করে তার দু চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটে কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ ধরে এর কল্পনাও যে কখনও তার মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারেনি।'

তাকিয়ে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয় এ কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সত্যই 'সহধর্মিণী' পেয়েছেন। বাইরে বললুম, 'থামলেন কেন?'

বললেন, 'এখনও বাধো বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।'

'ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, "এই ফুল! চোখ মুছে ফেল। আর সবাই দেখে ফেললে তোকে জ্বালাবে আরও বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।"

'চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কীরকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজও দেখতে পাই।

www.pathagar.com

'আপনাকে কী বলব, তার পর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড়নয়নে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁটের দু কোণে গভীর প্রশস্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুশিতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মূর্খটা আবার কী বলতে গিয়ে কী না বলে ফেলে।

'তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল আরেক আজব কেচ্ছা। ছেলেরা রুটিনমাফিক তাকে 'ব্যা—ড' বলল, চুলে ধরে টান দিল, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনও খাঁকতি হল না কিন্তু সে-ও রুটিনমাফিক চিৎকার চেঁচামেচি গালাগাল দিল না— সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে— আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।

'বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, সে নাকি তখন খুশিতে ডগোমগো, তার নাকি ভারি আনন্দ, তার আর কী ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট খাইয়েছে।'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা! ফার্সিতে প্রবাদ আছে—

> 'দুশ্‌মন্ চি কুনদ্, আগর্ মেহেরবান বাশদ্ দোস্ত !'
> 'দুশ্‌মন্ কী করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান্ হয়!'

নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে বললেন, 'বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে ফার্সিতে লিখিয়ে নিজে জর্মনে গথিক হরফে তর্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন ধরে আমি জুতসই একটা প্রবাদের সন্ধানে ছিলুম— আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তার পর বললেন, 'ছোঁড়াটা অদ্ভুত। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামি করত না। একলা-একলি দেখা হলে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করত।

'তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ওই ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হতুম তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমতন্ন করলুম, আর না করলে মা-ই বা কী ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনল, বই, পেন্সিল, ছুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেক্ লেম্‌নেড্ খাচ্ছি, জোর হৈ-হুল্লোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমার কানে কানে বলল, "ছোটবাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় গেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

'আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?'

'গিয়ে দেখি সেই পাগলা। হাতে এক ঢাউস বাক্স। লজ্জায় লাল হয়ে বলল— "তোর জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো 'ইয়ট'।"

'বলে কী? 'ইয়ট' তখন আমাদের স্বপ্নের বাইরে। পুরো বছরের জলখাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডল্‌ফ্ পর্যন্ত 'ইয়ট' কিনতে পারে না— তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।

'লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, "তুই উপরে চ, কেক খাবি।"

'বলল, "না, ভাই, তুই যা, উপরে আরও অনেক সব রয়েছে।"

www.pathagar.com

'আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোত্থেকে সাহস পেলুম আজও জানিনে। বোধহয় ইয়টের কৃতজ্ঞতায়।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'ছিঃ, ও জিনিস নিয়ে ঠাট্টা করবেন না!'

নয়রাট বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। তার পর উপরে কী হল ঠিক বলতে পারব না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তার পর একে একে সক্কলেই পাগলার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মতো ঝরঝর করে জল নেমে এল।

'সেইদিনই আমি মনস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচাব। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতরে আছে।'

নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'এখ্‌খনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজেছেন ॥

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম্‌ কদম্‌ বঢ়ায়ে জা	এগিয়ে যা এগিয়ে যা
খুশিকে গিত্‌ গায়ে জা	খুশির গীত গাইতে যা।
ইয়েহ্‌ জিন্দগি হ্যায় কৌম কি	দেশের তরে জীবন ধন
(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা ॥	দেশের লাগি করবি নে পণ?
তু শেরে হিন্দ্‌ আগে বঢ়	শেরে হিন্দ এগিয়ে যা
মরণেসে ফিরভি তু ন ডর্‌	সামনে মরণ ফিরে না চা ॥
আসমান তক্‌ উঠায়ে-শির্‌	আকাশ বিঁধে তুলবি শির
জোশে ওতন্‌ বঢ়ায়ে জা ॥	দেশের জোশ বাড়বে বীর।
তেরে হিম্মৎ বঢ়তি রহে	বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তেরি সুন্‌তা রহে	খুদা তোরে দেবেন জোর।
জো সামনে তেরে চঢ়ে	সামনে বাধা পরোয়া না কর
(তো) খাক্‌মে মিলায়ে জায় ॥	ধুলায় তারা পাবে যে গোর ॥
চলো দিল্লি পুকারকে	হুঙ্কারিয়া দিল্লি চল
কৌমি নিশান্‌ সম্ভাল্‌কে	কৌমি নিশান জাগিয়ে তোল
লাল কিল্লে গাঢ়কে	লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
লহ রায়ে জা লহ রায়ে জা ॥	এগিয়ে যা, ফুর্তিতে চল ॥
কদম্‌ কদম্‌ বঢ়ায়ে জা ॥	এগিয়ে যা, এগিয়ে যা ॥

শেরে হিন্দ্‌ = হিন্দুস্তানের ব্যাঘ্র, জোশ = শক্তি, কৌমি নিশান = জাতীয় পতাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ধূপছায়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

অগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের

করকমলে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দেশভ্রমণ

ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন। এখনও মনে পড়ছে, তালুর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেত কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেতুম না, গোরু সম্বন্ধে লিখব কী? শেষটায় মনে হত, আমি একটা আস্ত গোরু, না হলে গোরু সম্বন্ধে কিছুই লিখতে পারছিনে কেন— যে গোরু ইস্কুল আসতে-যেতে নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। সেকথা একদিন এক বন্ধুকে বলতে সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।

শেষটায় অনেক ভেবে-চিন্তে লিখতুম, গোরুর চারখানা পা, দুটো শিং আর একটা ন্যাজ আছে। গুরুমশাই তারই উপর চোখ বুলিয়ে যেতেন, পেটের অসুখ থাকলে দিতেন ছ নম্বর, মর্জি ভালো থাকলে দিতেন আট। আমিও খুশি হয়ে ভাবতুম, এই গোরুর ন্যাজ ধরে পরীক্ষা বৈতরণী ঠিক পেরিয়ে যাব।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবতুম, দুটো শিং বলার অর্থ হয়, কারণ গণ্ডারের নাকি একটা শিং। চার পা বলাও অবান্তর নয়, কারণ চার না হয়ে গোরুর দু পা-ও হতে পারত কিন্তু একটা ন্যাজ বলার তো কোনও মানে হয় না— আজ পর্যন্ত তো কোনও জানোয়ারের দুটো ন্যাজের কথা শুনিনি। একদিন মাস্টারমশাইকে প্রশ্নটা শুধালে তিনি বললেন, ইংরেজি ভাষার আইন অনুসারে বলতে হয়, দি কাউ হ্যাজ এ টেল। 'এ'টা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়। তখন বুঝলুম 'এ টেল'টা গোরুর ন্যাজ নয়, ইংরেজি ব্যাকরণের ন্যাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন রয়ে গেল, 'বাংলাতে যখন 'একটা' ব্যবহার না করে দিব্য বলতে পারি 'গোরুর ন্যাজ আছে' তখন ইংরেজের মতো সুসভ্য জাত সৃষ্টির প্রথম পূর্বাহ্নে বৃক্ষাবতরণকালে তার মর্কট রূপটি ত্যাগ করার সময় এই বৈয়াকরণিক কিংবা আলঙ্কারিক পুচ্ছটিও বর্জন করল না কেন?

আমি ইংরেজি লিখতে পারিনে। যাঁরা এই ভাষাতে নাম করেছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, ওই 'এ'র ন্যাজ নাকি এখনও তাঁদের মুখের উপর মাঝে মাঝে ঝাপটা মারে। তাই শুনে বিঘ্নসন্তোষী মন বিমলানন্দ লাভ করে।

সেকথা থাক।

কিন্তু যখন মাস্টারমশাই হুকুম দিতেন, 'দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর', তখন সে বৈতরণীর ও-পার আর চোখে দেখতে পেতুম না। গোরু জানোয়ারটা উৎকৃষ্ট হোক নিকৃষ্ট হোক সেটাকে তবু চিনি, না-হক একথা কখনই বলে ফেলব না, 'গোরু বড় প্রভুভক্ত জীব, সে রাত জেগে চোর-ডাকু খেদায় কিংবা পাড়ার মোদ্দারমশাই

www.pathagar.com

গোরু চড়ে আদালতে পেশকারি করতে যান।' কিন্তু দেশভ্রমণ বলতে তো বুঝি দাদির বাড়ি যাবার সময় নৌকোর ছৈয়ের ভেতরের দিকটা— ছৈয়ের বাইরে যেতে চাইলেই বাবা রাশভারি গলায় বলতেন, 'থাক, থাক, আর বিলে ডুবে মরতে হবে না।' বাংলা ভাষাটা নিতান্ত পশ্চিম-বাংলার ভাষা। না হলে 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়' না বলে বলত, 'ডানপিটের মরণ বিলের তলায়'। সেই ছৈয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তো আর দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই তখন বাধ্য হয়ে সন্ধান নিতে হত, কোন 'এসে বুক' মুখস্থ করে বীরভূমের হেতমপুর ইস্কুলের বিশ্বম্ভর ভড় গেলবার ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে। 'চিত্তের প্রসার', 'অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য,' 'কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপূর্ণতা' ইত্যাদি যাবতীয় উত্তম উত্তম গুণরাজিতে প্রবন্ধটি ভরে দিতে তাই আমাদের তখন আর কণামাত্র অসুবিধে হত না— ইস্কুল-ঘরের চারিটি বেড়ার ভেতর বসে বসে। মাস্টারমশাইও কোনও আপত্তি জানাতেন না, কারণ আমরা বিলক্ষণ জানতুম, তাঁর দৌড়, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্',— অর্থাৎ, তাঁর এক ভাগ্নে ম্যাট্রিক ফেল মেরে আগরতলায় পালিয়ে যাওয়াতে তিনি ভয়ে ভয়ে 'দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' জপ করতে করতে অতি অনিচ্ছায় আগরতলা অবধি একবার 'দেশভ্রমণ' করেছিলেন। জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই যাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরম্বু, অপর্ণব্রতে। ফিরে এসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কারণ ভিড়ে মেলা জাত-বেজাতের লোক হয়তো তাঁর গাত্রস্পর্শ করে ফেলেছে এবং সবচেয়ে মারাত্মক অগ্নিপরীক্ষা তাঁকে তখন পেরোতে হয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য কোনও পরীক্ষার তুলনা হয় না, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ দেশভ্রমণের ঝাড়া বারোটি ঘণ্টা তিনি তাঁর নর্মসখী কৃশাণুদীপ্ত তাম্রকূটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিক্কণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুম্বন দিতে পারেননি। তিনি 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই আপ্তবাক্যটির স্মরণে শুচিস্মিতাকে সজল নয়নে তার সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে দৃঢ়পদে পশ্চিমাভিযান করেছিলেন।

এ-জাতীয় গুরু পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছেন। টোলো-পণ্ডিত, আপন চেষ্টায় ইংরেজি শিখেছিলেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রি ছিল না বলে ক্লাস সিক্সের উপরে যাবার তাঁর হক ছিল না। কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা এই, তিনি যখন দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে 'পয়েন্ট' দেবার সময় উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা ঝাড়তেন তখন, কেন জানিনে, একমাত্র আমারই মনে সন্দেহ হত যে, তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হেঁশেলে মুরগি রান্না করার মতো। ছেলে-ছোকরারা খাবে, তিনি রান্নার পর গঙ্গাস্নান করে বুনেদি হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।

আমি তাই একদিন সাহস করে বলেছিলুম, ঘোরাঘুরি করলেই যদি এত বিদ্যে হয় তবে তো গার্ডসাহেব আজমল আলী আমাদের শহরের সবচেয়ে জ্ঞানী পুরুষ। আশ্চর্য পণ্ডিতমশাই রাগ করলেন না। সন্দিগ্ধ নয়নে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন শুধু; আমি তাঁর চোখের ভাষাতে পড়লুম, 'তবে কি রাস্কেলটা আমার মনের গোপন খবর পেয়ে গিয়েছে?'

তা সে যাই হোক, পণ্ডিতমশাই কিন্তু তখন একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার অর্থ, আর পাঁচটা জিনিসের মতো দেশভ্রমণও খুদাতালা আপন হাতে কব্জা করে রেখেছেন। পাঁচটা জিনিসের মতো দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার পরই মানুষ দেশভ্রমণে বেরোয় না; যার কপালে ওটা লেখা আছে, কিংবা বলুন কপালে নয়, যার পায়ে চক্কর আছে, সে-ই বেরোয় দেশভ্রমণে। কেউ বেরোয় পণ্ডিতমশায়ের মতো গজরাতে গজরাতে, কেউ বেরোয় চেন-ছাড়া পাখির মতো তিড়িং তিড়িং করে, তিন লম্ফে গেট পেরিয়ে।

www.pathagar.com

দেশভ্রমণ করেছি, এরকম একটি খ্যাতি আমার আছে। এ সম্বন্ধে কোনও প্রকারের উচ্চবাচ্য আমি করিনে। অর্থাৎ আমি যেসব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্লান্ত থাকি। দেশভ্রমণ ভালো কি মন্দ, কোন কোন দেশে গিয়েছিলাম এ সম্বন্ধে কোনও প্রকারের ইঙ্গিত দেবার প্রয়োজন মনে করিনে। অথচ, আমার বহু সহৃদয় পাঠক ধরে নিয়েছেন যে, আমি দেশভ্রমণের নাম শুনলেই মুক্তকচ্ছ হয়ে তদ্দণ্ডেই বন্দর পানে ধাওয়া করি।

এ ধারণা সত্য নয়, কিন্তু তবু এটার প্রতিবাদ আমি করতুম না, যদি না এ ধারণা আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করত। কিংবা এটা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হত তা হলেও চুপ করে থাকলে কোনও ক্ষতি হত না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমিই সবেধন উজ্জ্বল-নীলমণি নই, আমার চেয়েও হতভাগা গুটি কয়েক আছেন। তাই ব্যক্তিগত কাহিনী বলার সঙ্কোচ অনিচ্ছায় কাটাতে হল।

কেউ যখন বলে, 'ফলনা দেশভ্রমণ করতে ভালোবাসে' তখন সে বাক্যে আমি প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশি। এ যেন অনেকটা 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, গামছা পর গিয়ে।' তার অর্থ মেয়েটা এমনি মারাত্মক রকমের হন্যে হয়ে উঠেছে বিয়ে করবার জন্য যে, বাপ-মা'র স্নেহ-ভালোবাসার তোয়াক্কা সে আর করে না, আপন বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে তার আর কোনও ক্ষোভ নেই, বিয়ের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক শাড়ি-গয়না, বাজনাবাদ্যিরও তার প্রয়োজন নেই, আপন গামছাই পরে পড়ি-মরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।

পাঁড় দেশভ্রমণকারীর অর্থও তা-ই। যে মাটিতে তার নাড়ি পোঁতা আছে, যে নদীর জল খেয়ে সে আজ চলতে শিখেছে, যে আমজামকাঁঠাল তাকে ছায়া দিয়ে শ্যামল শীতল করে রেখেছ, যার প্রতিটি দূর্বাদল তার পদ-তাড়না কামনা করে— তারা যেন কিছুই নয়, তারা যেন বানের জলে ভেসে-আসা, ফেলনা। গুরুদের আশীর্বাদ, বাপ-মায়ের স্নেহ, ভাইবোনের ভালোবাসা, বন্ধুজনের সদান্তরিকতা, এসব কথা আর তুললুম না, সেগুলো এতই শুচিশুদ্ধ পবিত্র যে, ওদের স্মরণকে কলঙ্কিত করে মহাপাতকী হতে চাইনে।

অসহিষ্ণু হয়ে শান্ত পাঠক বললেন, 'কী জ্বালা, লোকটা তো আর চিরকালের তরে দেশত্যাগী হয়ে চলে যাচ্ছে না। দু দিন কিংবা দু বছর পরে আবার তো ফিরে আসবে। ইতোমধ্যে তোমার গাছগুলো তো আর রবি ঠাকুর-এর "হংস-বলাকা"র মতো ডানা মেলে আকাশের কিনারা খুঁজতে বেরিয়ে যাবে না, কিংবা নদীটি জনকতনয়ার অভিসম্পাতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাবেন না, কিংবা—'

বেশ কথা। তা হলে কিছু বলার নেই। এবং সত্যি বলতে কী, সেইটেই কাম্য। আমাদের মুনিঋষিরা সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের বাপ-পিতেমো তাই করেছেন। মুসলমান মৌলানা-দরবেশরা তাই বলেছেন। তাদের ব্যাটা-বাচ্চারা তাই করেছে।

তাই শাস্ত্রকার আদেশ দিয়েছেন, গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হলে পর তীর্থভ্রমণান্তে ('দেশভ্রমণ' কিংবা হালফিলের কথা 'টুরিজম') স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করত গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশ কর্তব্য। তার পর আর দেশভ্রমণ-টেশভ্রমণের রা-টি কেড়োনি। নিতান্তই যদি বাউণ্ডুলেপনা করতে হয় তবে কর, প্রাণভরে কর, সন্ন্যাস নেবার পর। এমনকি, বাণপ্রস্থ যাবে জনপদভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে। সে অবস্থায়ও যত্রতত্র পর্যটন গর্হিত।

কিন্তু সন্ন্যাসের বাউণ্ডুলেগিরির প্রতি কর্তারা এত সদয় কেন? তার এক কারণ :

www.pathagar.com

ভোগে রোগভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপাদ্ ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে তরুণ্যা ভয়ং,
শাস্ত্রে বাদীভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং,
সর্ববস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবা ভয়ং ॥

শুধু বৈরাগ্যেই অভয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন, যে-মুহূর্তে মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করবে। ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত না করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, গার্হস্থ্য সমাপন না করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ গর্হিত; কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়া যায় যে-কোনও সময়ে— ডবল, ট্রিপল প্রমোশন নিয়ে।

কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর গৃহে ফিরতে পারবে না। সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই দিকেই বিশেষ করে আমি আমার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোনও জায়গাতেই তিন দিনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই, এক বর্ষাকাল ছাড়া। বৌদ্ধ শ্রমণদেরও এই 'বিনয়'।

এর সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কী? সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আত্মার কি প্রসার হয় না-হয় সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার অধিকার আমার নেই; কিন্তু তাতে করে সমাজ ও সংস্কারের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে বলার অধিকার আমাদের মতো সংসারীদের নিশ্চয় আছে।

আমার মনে হয়, সন্ন্যাস নিয়ে পর্যটন করুন, আর সন্ন্যাস না নিয়ে টুরিস্টের মতো বাউণ্ডুলেপনা করুন, ফল একই। নানা দেশে নানা লোক, বহু সমাজবন্ধন, বহু উচ্ছৃঙ্খলতা, বিস্তর ধর্মাচার এবং ততোধিক চার্বাকাচরণ দেখে দেখে মানুষের চিত্তের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই 'প্রসার'ই তাকে দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে একদিক দিয়ে করে দেয় নির্বিকল্প উদাসীন, অন্যদিক দিয়ে আপন মাটি আপন গ্রামের কল্যাণ কামনায় নিস্পৃহ। ইংরেজিতে একেই বলে 'জেডেড', ফরাসিতে 'ব্লাজে'। এই অবস্থার কল্পনা করেই জার নিকোলাস বলেছিলেন, 'পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন সুখ'। গ্রাম্য ভাষায় একেই বলে 'দড়কচ্চা হয়ে "ল্যাদা" মেরে যাওয়া'।

এইসব 'ভবঘুরে' তখন আর সমাজের ভেতর আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যাচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলো অন্যায় বন্ধন থাকে, এককালে হয়তো সেগুলোর কোনও অর্থ ছিল, এখন লোকে ভুলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুক্তির রন্ধ্রও থাকে। এ দুয়ের টানাটানির মাঝখানের উত্তম পন্থাটি বের করার নামই সমাজ। আমাদের বাউণ্ডুলেটির কাছে দুটোই অর্থহীন। সে ঘোরাঘুরির ফলে দেখেছে বহু সমাজ, যেখানে অন্য বন্ধন, অন্য মুক্তি। দেশের সমাজের মূঢ়তা যেন তাকে বিচলিত করতে পারে না, তার আদর্শবাদও তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, তাই পূর্বেই নিবেদন করেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ।

আর যদি ধ্যান-ধারণা সাধনা-তপস্যার কথা তোলেন, তবে তাঁর পরম শত্রু দেশভ্রমণ। গ্যোটে বলেছেন, 'চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে।'

আর আমাদের অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে-স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে, তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো— '

www.pathagar.com

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ কর এক জায়গায়, দিতে থাক তুলির টানে রঙের পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ।'

চতুর্দিকে নিজেকে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ করে দিলে এ আনন্দ পাওয়া যায় না।

রসগোল্লা

'চুঙ্গিঘর' কথাটা বাংলাভাষাতে কখনও খুব বেশি চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালি যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোনও কারণ নেই। ইংরেজিতে একে বলে 'কাস্টম্ হাউস', ফরাসিতে 'দুয়ান্', জর্মনে 'ৎসল্-আম্ট্', ফার্সিতে 'গুমুরূক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভুতো সবাই সরকারি, নিম সরকারি, মিন-সরকারি পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান-হিন্দুস্থান গমনাগমন তো আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলিকে তার হকের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুমুরূক'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখিনি। রহমত বোধ করি সেটাতে তার 'গুমুরূক'কে এড়াবার চেষ্টা করেনি।

কেন? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক এবং (সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সক্কলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সেকথা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'— তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দলপতিই হন, কিংবা রাজা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই, কারণ এযাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু বিক্রি করিনি। কিন্তু যেখানে দু পয়সা লাভের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হকের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কী প্রকারে?

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোনও গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইস্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। বাস্, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানি চুঙ্গিঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তার পর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেইরকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

www.pathagar.com

আপনার পাঁজর কখানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁচিঁ করে বলবেন, 'ওটা তো আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে তো ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মূর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও তো ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যিশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন চুপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভালো নয়। এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারস্ট্রিপের পশ্চাতের সুদূর দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তার পর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টক্কা করবে। তার পর বলবে, 'পনেরো টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বলে দেব! ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এই শার্টটার দামই তো মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নতুন শার্টটার উল্লেখ করেননি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগ্‌ল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনি কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোনও লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল:

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত?

এবং শেষ প্রশ্ন :

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কী?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমানভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত দিলেই তো আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহাভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নতুন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন,

www.pathagar.com

ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ কর্মে নতুন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকা যান। এতই বেশি যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যেরকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান, এক ভদ্রলোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিগ্যেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝাণ্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম পাক্ড্ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মতো তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বারকয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস'। আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝাণ্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা তো ট্যাপ করতে পারতেনই সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোনও আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের— ঝাণ্ডুদা'র বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়— তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টার-টিম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানি লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডুদা জন্মেছিলেন তাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসি, কুলি, সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউন্টারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সব্বাইকে দরাজ হাত দু খানা পাখির মতো মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন, আমি এই এলুম বলে।' 'কিয়ান্তি' রানিকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝাণ্ডুদা'র বাক্স-পেঁটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না— তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গালদুটো ভাঙা, সে-গালের হাড়দুটো জোয়ালের মতো বেরিয়ে পড়েছে, চোখদুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মতো চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মতো হিটলারি গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডুদা ঝাণ্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, 'শেক্স্পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে।' আমার বিশ্বাস, আজ

www.pathagar.com

যে শেক্‌স্‌পিয়ারের এত নামডাক সেটা ওইদিন থেকেই শুরু হয়— কারণ ঝাণ্ডুদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনও কানাকড়ি ধার নেননি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওইদিন থেকে শেক্‌স্‌পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কী?'

'ইন্ডিয়ান সুইট্‌স্‌।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লন্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে-ভাবে ঝাণ্ডুদা'র দিকে তাকালেন তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচ শো ঢ্যাঢরা পিটিয়ে কোনও বাদশাও ও-রকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।

ঝাণ্ডুদা মরিয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লন্ডনে— নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ঢ্যাঢরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝাণ্ডুদা পিঁপড়ের মতো নয়ন করে সকাতরে বললেন, 'তা হলে ওটা ডাকে করে লন্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে তো বড্ড খরচা পড়বে। পাউন্ড পাঁচেক—নিদেন।'

হ্রস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজি হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ আইন তো সক্কলেরই জানা।

ঝাণ্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক, ও-মাল যখন সোজা লন্ডনে চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি তো আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ করেছে। 'কিয়ান্তি'-রানির সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও হয়নি— প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসি উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে— সে পর্যন্ত বিন্ ফিজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনও ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছিনে।' তার পর ইংরেজিতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে, ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইন্ডিয়ান সুইটস কি না।'

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নিচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসি বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয়নি।

ঝাণ্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডুদা টিন কাটলেন।

www.pathagar.com

কী আর বেরোবে? বেরোল রসগোল্লা। বিয়ে-সাদিতে ঝাণ্ডুদা ভূরি ভূরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন— ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালিদের, তার পর যাবতীয় ভারতীয়দের, তার পর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারিনি, কাজেই গণ্ডা-তিনেক ভাষায় তখন বাঙালির বহুযুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দিই কী প্রকারে?

ফরাসিরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা, 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা, 'ব্রাভো!'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম!'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গিঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসি-স্পাই সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে 'কিয়ান্তি', আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলা-বদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওঁদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিয়ান্তি'।

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীর রূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী!'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি'ও বললে না।

হঠাৎ, বলা-নেই, কওয়া-নেই, ঝাণ্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডুদার তাগ সবসময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না। তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ! পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না!'— আরও কত কী।

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার। চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাশি থেকে আরম্ভ করে

www.pathagar.com

ইল্‌দুচে মুস্‌সোলিনি— মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিস্‌টার, অ্যাম্বসেডর প্লেনিপটিনশিয়ারি— কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর তো বটেনই।

আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবে না কেন? এ যে রীতিমতো বে-আইনি কর্ম। সরকারি চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিনমণি লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়াবার চেষ্টা করুন আর সেঁকো খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝাণ্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পরান আমার, খাবি নি, ব্যাটা—' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ, ডাণ্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কী ভানুমতী, এ কী ইন্দ্রজাল!

দেখি, ফরাসি উকিল আকাশের দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদগদ কণ্ঠে বলছে : 'ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস! এ ভূমির এমনই পুণ্য যে হিন্দেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে "মিরাক্‌ল্ অব মিলান" এর কাছে— এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে "মিরাক্‌ল্ দ্য রসগোল্লা"।'

উকিল মানুষ, সোজা কথা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক বলে উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়ান্তি।' আরও দু'চার পাষণ্ড তায় সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বহুকষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাব্‌ড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুঁছিস নি; আদালতে সাক্ষী দেবে— ইগজিবিট নাম্বার ওয়ান।'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়ান্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিঙে রিস্‌ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডুদাকে সদুপদেশ দিলে, 'পুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড়কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড়কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসি উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়ান্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

www.pathagar.com

তার পর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো ইউ প্রসিড, অর্থাৎ কি না ময়না-তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইন্ডিয়ান সুইট্স্ চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড়কর্তা হয়তো অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়তো কখনও ঘুষ খাননি। 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটা ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘুষ না-খেয়েও দারোগা' তো হওয়া যেতে পারে।

বড়কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডুদা বললেন, 'একফোঁটা কিয়ান্তি?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড়কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

'কিয়ান্তি না রসগোল্লা' সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাত মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন :

> 'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
> অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম :

> রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
> ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!

চাপরাশি ও কেরানি

কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতা দেবার সময় পণ্ডিতজি বলেন, চাপরাসিদের মাইনে মাস্টারদের চেয়ে বেশি কিংবা ওই ধরনের আমার ঠিক মনে নেই। তার জন্য 'পণ্ডিত' সম্প্রদায় আমার অপরাধ নেবেন না। বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি তাঁদের উপকারই করেছি। কারণ পণ্ডিতজির সব কথা বিশেষ করে তাঁর শপথ এবং প্রতিজ্ঞা সর্বসাধারণ স্মরণ রাখলে বড় বিপদ হত। আমার মতো কোনও কোনও আহাম্মক এখনও ভুলতে পারেনি, পণ্ডিতজি স্বরাজলাভের উষাকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কেউ যদি কাউকে ওইভাবে ঝুলে থাকতে দেখে থাকেন, তবে দয়া করে জানাবেন, দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন কারণ আমার জীবন-সায়াহ্ন আসন্ন।

www.pathagar.com

অতএব, পণ্ডিতজি প্রাতঃস্মরণীয় বটেন, কিন্তু তাঁর বচনামৃত প্রাতঃস্মরণীয় নয়।

খয়ের। বাংলা 'খয়ের' নয়, উর্দু 'খয়ের'। তার অর্থ 'তা সে যাকগে।' এই উর্দু 'খয়ের'টি এই বেলাই একটু ভালো করে শিখে নিন। বিস্তর 'ফায়দা ওঠাতে' পারবেন। বুঝিয়ে বলি।

উর্দুওয়ালারা দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতার আরম্ভেই শুরু করেন তার দুঃখকাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। 'আমরা খেতে পাইনে, পরবার কিছু নেই, আশ্রয় জোটে না, শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি, মেয়েরা গর্ভযন্ত্রণায় মারা যায়; ডাক্তারবদ্যির ব্যবস্থা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমরা তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি, এইবারে বুঝি দেশের কর্ণধাররা বাতলে দেবেন, তাঁরা এসব বালাই-আপদ দূর করবার জন্য কী সব পরিপাটি ব্যবস্থা করেছেন, দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় এ-সব অভাব-অনটন তাঁদের সম্মার্জনী-সঞ্চালনে দূরীভূত হয়েছে, এইবারে আমাদের সবুরের মেওয়া ফলবে কবে, এই ধরনের কোনওকিছু।

বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন। চতুর্দিকে সূচিভেদ্য নৈস্তব্ধ্য। আমরা কান পেতে আছি, এইবার শুনতে পাব, 'চাপানে'র 'ওতর', এইবার শুরু হবে উল্টো 'বারমাস্যা', এইবারে আরম্ভ হবে আমাদের আশার বাণী, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন।

ও হরি! কোথায় কী?

শুনতে পাবেন, বক্তা গুরুগম্ভীর নিনাদে একটি কথা বললেন, সেটি 'খ য়ে র।'

মানে? এর অর্থটা তো তা হলে বুঝতে হয়। কারণ ইতোমধ্যে বক্তা 'জাপানের ড্রাই ফার্মিং' কিংবা 'জানজিবারের কো-অপারেটিভ সিস্টেমে' চলে গিয়েছেন। তা হলে নিশ্চয়ই ও 'খয়ের' শব্দে তাবৎ সমস্যার সমাধান ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওঁ-তে যেরকম হিন্দুর ব্রহ্মা লাভ, ক্রুশে যেরকম ক্রিশ্চানের গড লাভ। 'সকলং হস্ততলং শব্দ মাত্রেণ যদি অর্থধনং কোহপি লভেৎ।'

এইবারে 'খয়ের'-কলমার গুহ্য অর্থ শোনার পূর্বে ভালো ডাক্তারকে দিয়ে হার্টটি দেখিয়ে নিন। শক্‌টি মারাত্মক রকমের হবে। ছাপাখানায় সদ্‌ব্রাহ্মণও আছেন। আর কেউ না পড়লেও তাঁরা বাধ্য হয়ে আমার লেখা কম্পোজ করেন, প্রুফ দেখেন। অকালে ব্রহ্মহত্যা করলে লোকসভায়ও আমার ঠাঁই হবে না।

'খয়ের' কথার সাদামাটা প্লেন 'নির্ভেজাল' অর্থ, 'তা সে যাকগে— অন্য কথা পাড়ি।' অর্থাৎ এতক্ষণ আপনি যেসব দুঃখ-কাহিনীর ফরিয়াদ-প্রতিবাদ আগড়ম-বাগড়ম্ যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না। আপনি এখন কালীঘাট, মৌলা আলী সর্বত্রই লম্ভ-ঝম্ফ দিতে পারেন, কারণ, 'খয়ের' শব্দের প্রসাদাৎ আপনি আপনার পুচ্ছটি ইতোমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।

'খয়ের' বাক্যের শব্দার্থ আরবি ডিকশনারি ঘেঁটে বের করেও পুলি-পিঠের ন্যাজ গজাবে না। এতে পাবেন 'খয়ের' অর্থ 'উত্তম', 'শিব', 'মঙ্গল'। তবে কি বক্তা যে গোড়ার দিকে ফুল্লরার বারমাস্যা গেয়েছিলেন সেটা 'ভালো'?

না। আমরা অর্থাৎ বাঙালিরাও এরকম জায়গায় 'উত্তম' বলে থাকি, কিন্তু বিপরীত অর্থে। আমাদের পণ্ডিতগণ কোনও কিছুর সুদীর্ঘ অবতারণা করার পর সর্বশেষে বলেন, 'উত্তম প্রস্তাব'। তার অর্থ এই নয় 'এতক্ষণ যা বললুম সে সব খুব ভালো জিনিস';— তার সরল অর্থ, 'এ দিককার কথা বলা হল, এবার অন্য পক্ষের বক্তব্য নিবেদন করছি এবং সেইটেই আমার বক্তব্য এবং তাতেই পাবেন প্রশ্নের সমাধান, রহস্যের মীমাংসা।'

www.pathagar.com

'খয়ের'-এর এরূপ ব্যবহারকে ফার্সিতে বলা হয়, 'তাকিয়া-ই-কালাম'— 'কথার' (কালামের) 'বালিশ' (তাকিয়া)? অর্থাৎ যে কথার উপর ভর করে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন! বিপক্ষ রা'টি কাড়তে পারবে না। আপনি কেল্লা ফতেই করে দিয়েছেন, ভাগ্যিস, আপনি, মোকামাফিক 'খয়ের' শব্দটি প্রয়োগ করতে জানতেন, 'রাখে খয়ের মারে কে?'

মুসলমানরা নাকি এদেশের মন্দির ভেঙেছে, পার্ক সার্কাসে শিককাবাব চালিয়েছে, ইদানীং নতুন শুনছি, খামখেয়ালিতে খেয়াল আমদানি করে ধ্রুপদ-ধামার বরবাদ করেছে। করেছে তো করেছে, তাই বলে কি উষ্মাভরে গোসসা-ঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন? গড়ের মাঠে গিয়ে রাষ্ট্রভাষায় (কটকে আমার বৃদ্ধ বাঙালি কেরানি সরকারি ইশতিহার পড়ে ভীত কণ্ঠে আমাকে শুধিয়েছিল 'আমাকেও লোস্ট্রভাষা শিখতে হবে নাকি, স্যার?') কীভাবে 'খয়ের' শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হয় সেটি শিখবেন না? ওইটে ঠিকমতো, তাগমাফিক, বাংলায় 'এস্‌তেমাল' করতে পারলে পাড়ার তর্কবাগিশ, তকিয়া (ই-কালামের)-রকল্যাণে তর্কবালিশ হতে কতক্ষণ?

চিন্তা করে দেখুন, 'খয়ের' শব্দের কত গুণ! রাষ্ট্রভাষা হিন্দি তাঁর শব্দভাণ্ডার থেকে লাথি ঝাঁটা মেরে তাবৎ আরবি-ফার্সি শব্দ বের করে দিচ্ছেন— কারণ হিন্দি বাংলার তুলনায় অনেক ধনী (!) কি না— কিন্তু কই 'খয়ের' শব্দটি তাড়াবার প্রস্তাব তো কেউ করে না। কট্টর কান-ফাটা হিন্দিতে 'ভারতওয়ার্ষ কী উন্নতি ঔর সোওয়াধীন্তা, গঁড়তন্ত্রর উর সামওয়াদ' ইত্যাদি 'কঠন্ কঠন্' (কঠিন কঠিন) সমস্যায়ে নির্মাণ করার পর সে-ইন্দ্রজাল তাঁরা ছিন্নভিন্ন করেন কোন মোহমুদ্‌গরে? সেই সনাতন-রাম! রাম!— সেই যাবনিক, ম্লেচ্ছ খ-য়ে-র দ্বারা। এবং সেই 'খয়ের'-এর 'খ'ও উচ্চারণ করেন অ্যাসন ঘর্ষণ দ্বারা যে শুনে মনে হয় বড়ি মসজিদের সামনে জাকারিয়া স্ট্রিটের কাবলিওলা 'খ' উচ্চারণ করার ছলে গলা সাফ করছে। কোথায় লাগে তাঁর কাছে স্কচ 'লখ্' শব্দের 'খ' জর্মন 'বাখ' শব্দের ওই একই ব্যঞ্জন?

মুসলমানরা মন্দির ভেঙে অতিশয় অপকর্ম করেছে, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রাগে 'খয়ের' শব্দের যে বিরাট বালাখানা তৈরি করে দিলে তার উপর বসে হাওয়া খাবেন না?

শুধু মন্দ দিকটাই দেখবেন, ভালো দিকটা দেখবেন না?

তবে একটা গল্প শুনুন।

হয়তো অনেকেই শুনেছেন, তাঁরা অপরাধ নেবেন না। কারণ, বিবেচনা করে দেখুন, পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি না করলে সেটি বেঁচে থাকবে কী করে? মহাভারতের গল্প সবাই জানে, তাই বলে কি আমরা মহাভারতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছি?

খয়ের।

গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।

কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে এক ভদ্রসন্তানের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদয় হল। মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পুজো-পাটা করালে এবং শেষটায় উত্তম দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা ভদ্রসন্তানের কপালে ইয়া একখানা খাসা তিলক কেটে দিল। বহর আর চেহারা দেখে মনে হয় ওই দিয়ে লাইটনিং কন্ডাক্টরের কাজ অনায়াসে চালানো যায়। দেখলেই

www.pathagar.com

ভক্তি হয়। গড় হয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে যায়। ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ হয়ে তারা 'ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা' ইত্যাদি জপ করতে করতে ভদ্রসন্তান বাড়িমুখো হল।

কিন্তু হায়, সংসারের কত না সর্বজনীন অনাচার, রঙিন প্রলোভন। হবি ত হ, কিছুদূর যেতে না যেতে পড়ল বাহারে একখানা 'বার'। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ড্রাই ডে, শরাব বারণ, তাই ভদ্রসন্তান প্রলোভনের ভয় নেই জেনে সে-পথ নিয়েছিল, কিন্তু বিধি বাম, বড়দিন না কিসের যেন জব্বর পর্ব ছিল বলে 'ইস্পিশেল' কেস হিসাবে 'বার' খোলা।

এখন এগোই কী প্রকারে? ভদ্রসন্তানের রাস্তায় এগোবার কথা হচ্ছে না। আমি গল্পটা নিয়ে এগোই কী প্রকারে? পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন। তাঁদের আমি অধর্মের কাহিনী শোনাই কী করে। কিন্তু তাঁরা যখন এতাবৎ এতখানি দয়া করেছেন তখন গোপাল ভাঁড়ের মা-কালীর মতো জোড়া মোষ থেকে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত দুটো বুনো ফড়িং নিজেই ধরে খেতে রাজি হবেন— এই আমার ভরসা।

পাঁট। ইংরেজিবাগীশ ছোঁড়ারা বলে 'পাইন্ট'। তিন কোয়ার্টার খেতে না খেতেই হয়ে গেল। রঙিন পাখনায় ভর করে সে পুনরায় নামল রাস্তায়। কোয়ার্টারটুকু ফেলা যাবে বলে বোতলটা পকেটে— বোতলবাসিনীর সেবকরা বরঞ্চ জীবনের বেটার-হাফকে বিসর্জন দিতে রাজি আছে ওই 'ব্যাড' কোয়ার্টারকে নয়।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উদয় হয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, কারণ আমি জ্যোতির্বিদ নই। তবে উদয় হলেন পাড়ার মৈত্রমশাই, নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ, কালেভদ্রে বাড়ি থেকে বেরোন। এক মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটার কোথায় জেনেও বলেননি। ইনি কিন্তু বোতল দেখে বললেন, 'পাষণ্ড মাতাল।'

পকেটে বোতল থাকলেই, এমনকি সঙ্গে সঙ্গে টলটলায়মান হলেই মানুষ মাতাল হয় না। কিন্তু মৈত্রমশাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা করতেন। তাতে আছে—

১। দেবদত্ত বিরাট লাশ।

২। দেবদত্তকে দিনের বেলায় কেউ কখনও ভোজন করতে দেখেনি। অতএব, দেবদত্ত রাত্রে খায়।

এটাকে বলে নলেজ বাই ইনফারেন্স্‌।

আমাদের ভদ্রসন্তান সচরাচর কথা কাটাকাটি করে না। কিন্তু দ্রব্যগুণ অনস্বীকার্য। বেদনাভরা কণ্ঠে, গদ্‌গদ্‌ ভাষে করুণ নয়নে শুধু বললে 'মৈত্রমশাই, বোতলটাই শুধু দেখলেন, তিলকটা দেখলেন না।'

মন্দির ভাঙাটাই শুধু দেখলেন, 'খয়ের'টা শুনলেন না।

আমার অনেক পাঠক আমাকে বাচনিক এবং পত্র দ্বারা মাঝে মাঝে জানান যে, আমার কোনও কোনও গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে থাকেন। আমি শুনে বড় উল্লাস বোধ করি। কারণ পাণ্ডিত্য বিতরণ করার শক্তি মুর্শিদ আমাকে দেননি। আমি বিদুর, যা পারি তাই দিই। তাঁরা হয়তো বলবেন, এ গল্পটা সর্বত্র বলা যাবে না। তাই তাঁদের জন্য একটা গার্হস্থ্য সংস্করণ নিবেদন করছি। এটি অনায়াসে পুত্র-কন্যার হাতে দিতে পারবেন।

www.pathagar.com

ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানের গল্প। কুট্টি বসে আছে ছ্যাকরা গাড়ির কোচবাক্সে। বাবু জামাকাপড় পরে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। পা গেল হড়কে। বহুতর ধাক্কা আর গোত্তা খেয়ে খেয়ে বাবু গড়িয়ে পৌঁছলেন নিচে। তিন লম্ফে কুট্টি কোচবাক্স থেকে নেমে কর্তাকে কোলে তুলে নিলে। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদভরা কণ্ঠে কয়, "অহো-হো, কত্তার বড় লাগছে। আহা-হা-হা, এইহানে লাগছে, এ হে-হে-হে, ওইহানে লাগছে।' গা বুলোয় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলোয়। শেষটায় কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কত্তা আইছেন জলদি।'

জখম-চোটের কথাই শুধু ভাবছ, তাড়াতাড়ি যে এসেছে সেটা দেখছ না।

কিন্তু কেরানি আর চাপরাশিদের কী হল?

খয়ের।

চাপরাশিদের মাইনে কোতওয়ালের মতো হোক সেই আমার প্রার্থনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশিদের কাছে নিবেদন, কোতওয়ালের মাইনে যেন কমে গিয়ে চাপরাশিদের আজকের মাইনেতে না দাঁড়ায়। আমার বাসনা সক্কলেরই যেন, কোটালের মাইনে হয়— অর্থাৎ আই-জি-র মাইনে হয়। আমি ধনী হব, তুমি ধনী হবে, সবাই ধনী হবে— এই হল সত্যিকার প্রার্থনা। ঋষি তখন বিশ্বজনকে আহ্বান করে জানিয়েছেন সকলেই অমৃতের পুত্র তখন ওই সত্যই ঘোষণা করেছেন। পাঁড় কমিউনিস্টও ওই আদর্শের জন্য লড়ে। পেঁতিরা বলে, 'মজদুর ভাইরা শুধু সোনার খাটে বসে রুপার শানকি থেকে দু হাত ভরে গুড় খাবে এবং আর সবাই রাস্তায় পাথর ভাঙবে।' এটা কোনও কাজের কথা নয়। আমাদের পণ, আমরা সবাই রাজা হব।

কিন্তু বেদান্তের এই অতি প্রাচীন সত্যটি পুনরায় জানবার জন্য আমি এ প্রবন্ধের অবতারণা করিনি। মূল কথায় ফিরে যাই।

মনে করুন, আপনি দিল্লির কোনও সরকারি দফতরে কাজ করেন। সেখানে গেলে না করেও উপায় নেই। কেন নেই, সে কথা পরে হবে। বিশ্বাস না হয়, ১৯৪৭ সালের একখানি টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে ১৯৫৭ সালের খানার তুলনা করে দেখুন, চাকুরের সংখ্যা কত গুণ বেড়েছে। ওখানে একদিন রুটিওলা, আণ্ডাওলা আর থাকবে না— এই আমার বিশ্বাস।

আপনার চাপরাশি চৈতরাম কিংবা ব্রিজমোহন ৯৫ টাকা মাইনে পায়। কেরানি বোধ হয় ১১৫ টাকা পায়। আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না— তবে অনুপাতটা মোটামুটি এই। অঙ্কশাস্ত্র এ স্থলে বলবে, 'অতএব চাপরাশি কেরানির চেয়ে বিশ টাকা কম পায়!' ওই করলেন ভুল। শুনুন।

আপনি চৈতরামকে ঘণ্টি বাজিয়ে বললেন, 'যাও তো চৈতরাম, এক পাকিট গোল্ডফ্লেক নিয়ে এস।'

সরকারি আইন অনুসারে চৈতরাম অনায়াসে বলতে পারে, 'আমি যাব না। আমি মাইনে পাই সরকারি কাজের জন্য। আপনার জন্য সিগারেট আনা সরকারি কাজ নয়।' আপনি কিচ্ছু বলতে পারবেন না। বলা উচিতও নয়।

কিন্তু চৈতরাম তা বলবে না। সে ভদ্রলোক। তদ্দণ্ডেই বলবে, 'বহৎ (উচ্চারণ 'বোহৎ') আচ্ছা, হুজুর।' এবং লম্ফ দিয়ে এমন তীরবেগে বেরিয়ে যাবে যে, আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট!'

www.pathagar.com

এক মিনিটের ভেতর চৈতরাম আপনার টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখবে। সিগারেটের দোকানে আসতে-যেতে পনের মিনিট লাগার কথা। কী করে হল?

চৈতরাম ডাইনের বুক পকেটে রাখে গোল্ডফ্লেক, বাঁয়ের পকেটে ক্যাপস্টান, পাতলুনের পকেটে রেড অ্যান্ড হোয়াইট, মেপোল ইত্যাদি। নিতান্ত কর্কশ ব্যবসায়ী হিসেবে সে পরিচয় দিতে চায় না বলে, বারান্দায় গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেটটি বের করে এনেছে। আসলে সিগারেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা। ঠিকমতো নোটিস দিলে সে আপনাকে বলকান্ সবরনি সিগারেটও এনে দিতে পারে। ও-মাল শুধুমাত্র এম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

আইন বলে, সরকারি চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবসা করতে পারবে না। কিন্তু আপনি যখন পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করলে সরকার আপনাকে হুড়ো দেয় না, তখন চৈতরামের সিগারেট বিক্রিতে দোষ কী? কিছু না। আমি তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি তার ব্যবসা বাড়ুক।

কিন্তু কেরানি এ ব্যবসা করতে পারে না। কে কত মাইনে পায়, একথা এখন আর তুলবেন না। সিগারেট বিক্রি করে এখন চৈতরাম কেরানির মাইনে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই হল আরম্ভ।

প্রায়ই আপনি লক্ষ করেন, দশটা থেকেই চৈতরাম টুলের উপর ঢোলে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ডাকলে তার সাড়া পাবেন না। বরঞ্চ ঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে দর্শন দেওয়াতে কখনও গাফিলতি করেনি। একদিন আমি তাকে শুধালুম, তার ইন্‌সম্‌নিয়া আছে কি না। সে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, 'না।' হেড ক্লার্ক ওই সময় আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃদুহাস্যের রেখা দেখতে পেলুম। পরে তাঁকে শুধালুম, 'ব্যাপারটা কী?'

নাহ্! চৈতরাম প্রতি রাত্রে অভিসারে বেরোয় না— যদিও তার যমুনা-পারে বাস এবং পিতৃপিতামহের সাবেক মোকাম বৃন্দাবন এবং মথুরার মাঝখানে। নাহ্! 'বৃন্দাবনকে কুন্‌জ-গলিয়ে শ্যামরিয়া কা দরসন' ইত্যাদি যাবতীয় সমুদয় ব্যাপার সে মায়ের গব্ব থেকেই শুনে আসছে, ও-সব রোমান্‌সে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।

সে করে অতিশয় গদ্যময়ী ব্যবসা। খবরের কাগজ বেচে। সাতটার ভেতর ওই কর্ম শেষ হয়ে যায় বলে সরকারি চাকরির সঙ্গে এতে ওতে কোনও দ্বন্দ্ব বাধে না। দুধের ব্যবসাও আটটার ভেতর শেষ হয়ে যায় বলে এককালে তা-ও করেছে। এখন নাকি ভাবছে, দুটোই কম্বাইন করা যায় কি না। চোর পালিয়ে যাওয়াতে বাবু তম্বি করে দরওয়ানকে পুছেছিলেন, 'চোর ভাগা কিওঁ?' দরওয়ান বলল, 'মেরা এক হাথ মে তলওয়ার, দুসরেমে ঢাল; পক্‌ড়ে কৈসে?' চৈতরাম তাকে ছাড়িয়ে যাবে। তার এক হাথমে দুধ, দুস্‌রেমে পাইপর (পেপার) এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।

এইবারে চিন্তা করুন, চৈতরামের আয় কতখানি বেড়ে গেল। কেরানি বেচারি তো আর সকালবেলা দুধ কিংবা খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারে না। সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? পারে টুইশানি করতে। কিন্তু সেখানকার কম্পিটিশন কীরকম মারাত্মক, সেকথা আপনারা না জানতে পারেন, আমি বিলক্ষণ জানি— বেকার হওয়ার পরের থেকে এই আট মাস ঘুরে ঘুরে একটাও যোগাড় করতে পারিনি। অধম কুলীন সন্তান— এর চেয়ে

www.pathagar.com

অনেক অল্পায়াসে পাঁচটি বিয়ে করতে পারতুম। চারটি আইনত— 'হিন্দু কোড-বিল' আমার ওপর অর্সায় না।

হেড ক্লার্ক আপনাকে বললেন, 'স্যার, আপনি যে চাপরাশিদের য়ুনিফর্মের জন্য দরদ নিয়ে পার্সনাল ইন্‌ট্রেস্ট নেন, সে বড় ভালো কথা। কিন্তু স্যার, এদের য়ুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারি ফাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়, ছেঁড়ে বাইসাইকেলের সেডলে বসে দুধ বিক্রি করার ফলে। চাপরাশিদের পাতলুন দেখে বলে দেওয়া যায়, সকালবেলা কে কোন ব্যবসা করে।'

ভুলে গিয়েছিলুম, য়ুনিফর্মের সাফসুতরায়ের জন্য চৈতরাম সরকারের কাছ থেকে 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্' পায়। অবশ্য একদিন ক্যাসওয়েল লিভ নিলে সেদিনের জন্য অ্যালাওয়েন্‌স্‌টি কাটা যায়। অ্যাকাউন্টেন্টের অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতি কর্মে— আপনাদের মোটা মাইনের হিসাব রাখতে নয়। এই 'ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্' শিটখানা ঠিকমতো টানতে পারেন ক'টি ঝানু অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই নিয়ে বিরাট বিরাট আলোচনা হয়ে গিয়েছে। একবার এক আনা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তির গোলমালে আপিসসুদ্ধ সবাই অডিটার জেনারেলের কাছে কী হুড়োটাই না খেয়েছিলুম। শনিবার হাফ ডে— অ্যাকাউন্টেন্ট হাফ ওয়াশিং চার্জ কেটেছিলেন বলে। কাগজের সম্পাদক যখন তাঁর স্তম্ভে বলেন, সরকারি পয়সার প্রতি আমাদের দরদ নেই তখন আমাদের প্রতি বড় অবিচার করেন। অবশ্য 'দামোদরে' কত লক্ষ টাকা কোন দিকে ভেসে যায়, সেকথা আমি বলতে পারব না, তবে একথা আল্লার কসম খেয়ে বলব, বেহেস্তের দোহাই দিয়ে বলব, 'তাঁবা-তুলসি-গঙ্গাজল' স্পর্শ করে বলব, সরকারি নোকরি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরও এই 'ওয়াশিং শিটে'র দুঃস্বপ্ন দেখে এখনও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে এক গা ঘেমে জেগে উঠি। গিন্নি জানেন। বুকে হাত বোলান আর গুরুদত্ত 'ওয়াশিং-ওচাটন' আওড়ান।

কেরানি ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ পায় না। য়ুনিফর্ম যখন নেই তখন ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স্ হয় কী প্রকারে? শিশুবোধ ব্যাকরণ। অথচ তাকে ঠাট বজায় রেখে দফতরে আসতে হয়। বুশ শার্ট ইস্ত্রি না করা থাকলে বছরের শেষে তার কনফিডেনশিয়েল রিপোর্ট লিখি, 'শ্যাবি।' আপনি হয়তো বলবেন, 'ওই ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্‌স আর ক পয়সা?' বটে! ছ পয়সা হোক আর ছ গণ্ডাই হোক— দেখুন না একবার রাস্তায় নেমে ছ পয়সা কামাতে কতক্ষণ লাগে।

ওই য্-যা। ভুলে গিয়েছিলুম, বর্ষাকাল এসেছে— চৈতরাম বর্ষায় ছাতা আর বর্ষাতি পায়। মহামূল্যবান সরকারি সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও-দফতরে নিয়ে যাবার সময় যদি ভিজে যায় তবেই তো চিত্তির— একদম অক্ষরার্থে।

কিন্তু কেরানি পায় না। যদিও সরকারি কাজেই তাকে এ-দফতর ও-দফতর করতে হয়— বগলে ফাইলও থাকে। কেরানিরা সচরাচর চাপরাশির ছাতা ধার চায়।

একবার এক কেরানি ছাতাখানা হারিয়ে ফেলে। চাপরাশি বলে 'ছাতা কিনে দাও।' সরকারি ফাইল বাঁচাবার প্রেমে নয়, দুধ বাঁচাবার জন্য। কেরানি বলে, সরকারি কাজে খোয়া গিয়েছে, ওটা 'রাইট অফ্' হবে।' দুধের স্মরণে নাকি উপদেশ দিয়েছিল, 'তা বেরোবার সময়

www.pathagar.com

দুধে জল দিসনি, বৃষ্টির জলে ওটা পুষিয়ে নিস।' শেষটায় কী হয়েছিল, জানিনে। সি. সি. বিশ্বাস বলতে পারবেন! তখন আইন-মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

চৈতরাম শীতকালে কম্বল পায়। কেরানি পায় না। তার চামড়া বোধ করি গণ্ডার ব্র্যান্ড। সদাশয় সরকার বলতে পারবেন।

চৈতরাম কোয়ার্টারও পায়। একখান ঘর। একফালি বারান্দা। এক ডুমো উঠোন। ঘরখানা সে একজন রেফুজিকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে চৈতরামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতরাম বারান্দায় শোয়, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে নাশতা বখরায় খায়-টায়। চৈতরাম দু খানা ঘর পেলে বড় ভালো হত। একখানাতে সে মাথা গুঁজতে পারত বলে? উহুঁ, দু খানাই ভাড়া দিতে পারত বলে। তাই চণ্ডীগড়ের নতুন ক্যাপিট্যালে তারা দু খানা ঘরের জন্য আবেদন-আন্দোলন চালিয়েছে। আমি সেই আবেদনে সানন্দে স্বাক্ষর নিয়েছি।

কোয়ার্টার কেরানিও পায়— যাদের সত্যকার মুরুব্বির জোর আছে। কিন্তু সেটা ভাড়া দিয়ে থাকবে কোথায়? মুশকিল।

এই তো গেল মোটামুটি জরিপ। তার ওপর পুজো-আর্চায় বখশিশটা-আসটা। কোনও জিনিস বড়সাহেবের জন্য কিনে আনলে তিনি কি আর চেঞ্জটা সবসময় ফেরত চান? কেরানি এসব রসে বঞ্চিত।

এই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈতরাম করে কী?

ওই জানলেই তো পাগল সারে।

কেরানিদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসা করে। এটা সবিস্তার বর্ণনা করতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কেরানিরা অসন্তুষ্ট নয়। এবং আপনি খুশি, মাসের পয়লা তারিখে কাবুলিওয়ালাদের দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে। চাপরাশি ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে!

জনৈক বন্ধু গল্পটি বলেছেন—

আহম্মক জামাই শ্বশুরকে শোধাচ্ছে, 'সসুরমশাই, সসুরমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' (মনে মনে, 'ব্যাটা না হলে তুই বউ পেলি কোত্থেকে?')

'কার সঙ্গে, সসুরমশাই?'

রাগত কণ্ঠে, 'তোমার শাশুড়ির সঙ্গে।'

জামাই, গদ্ গদ্ কণ্ঠে, 'আহাহা, ভালোই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়েছে।'

দফতরের ভেতর আপোসে এই ব্যবস্থা আপনারও পছন্দসই হওয়ার কথা। চিন্তা করে দেখুন।

* * *

শুনেছি, একদম টপে উঠলে, অর্থাৎ মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে নাকি অনেকরকম সুখ-সুবিধা আছে। অবশ্য চাপরাশিদের মতো টায় টায় এরকম নয়! তবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কোনও বিশেষজ্ঞ যদি সেটা বাতলে দেন তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারব, দশ পার্সেন্ট উচ্ছুগ্‌গো করাতে তাঁরা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন।

www.pathagar.com

চিল্কা

সন্ধ্যাবেলা গোলাপের কুঁড়িটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলুম। প্রকৃতি যেন যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি কুঁড়ি তৈরি করার পর আজ এ কুঁড়িতে তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সকালবেলা বাগানে গিয়ে দেখি, সে কুঁড়িটি ফুটেছে। কুঁড়ির ভেতরে প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাপড়ির যে নিখুঁত সামঞ্জস্য সাজিয়ে রেখেছিল সেই সামঞ্জস্য নিয়েই পাপড়িগুলো বাতাসের গায়ে শরীর মেলে দিয়েছে। রেণু যেন রাজকুমারীর, আর চতুর্দিকে সার বেঁধে তাঁর সখীরা এক নিস্তব্ধ নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

চুপ করে দেখতে দেখতে আমার মনে হল, সন্ধেবেলার কুঁড়িতে দেখেছিলুম এক সৌন্দর্য আর সকালবেলাকার ফোটা-ফুলে দেখেছি আরেক সৌন্দর্য। এই পরিবর্তনটি যদি আমার চোখের সামনে ঘটত তবে এই দুই সৌন্দর্যের ভেতর আরও কত সৌন্দর্য দেখতে পেতুম। কিন্তু সে তো হবার নয়; ফুল ফোটে এত ধীরে ধীরে যে তার বিকাশ আর পরিবর্তন তো চোখে পড়ে না। সমস্ত রাত কুঁড়ির কাছে জেগে রইলেও সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমার চোখ এড়িয়ে যাবে।

ভগবান আমার সে ক্ষোভ চিল্কার পারে ঘুচিয়ে দিলেন।

অতি ভোরে চিল্কার সার্কিট-হাউসে ঘুম ভাঙল, বারান্দায় কাচ্চাবাচ্চাদের কিচির-মিচির শুনে। লাঙ্গুল-আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলো তা হলে নিশ্চয়ই দুপুর-রাতে এসে পৌঁছেছে।

দরজা খুলে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার বাগানের সেই গোলাপকুঁড়ি। শুধু এ কুঁড়ির রঙ একটু বেশি লালচে। আমার আর পুব আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর এক ফালি সিঁথির সিঁদুর। কিংবা যেন কোনও রক্তাম্বরধারিণী গরবিনী চিল্কার উপর দিয়ে পুব সাগরের পানে যেতে যেতে রক্তাম্বরী নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলে ফেলে আমার ওই কুঁড়ির পেছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরীর কথা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম কুঁড়ির দিকে। সে কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করেছে। শুধু এর পাপড়ির আকার অন্যরকমের। সোজা, ধারালো তলোয়ারের মতো এক একটি সূর্যরশ্মি দিগ্বলয়ের অন্তরাল থেকে হঠাৎ পূর্ব গগন পানে ধেয়ে ওঠে। অসংখ্য রশ্মি অর্ধচক্রাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাদের কেন্দ্র— ঘুমন্ত রাজকুমারীর এখনও দেখা নেই। আকাশের লাল ক্রমেই কমে আসতে লাগল। চিল্কার রাঙা জলের ফালি গোলাপি হয়ে হয়ে শেষটায় নীলাম্বরী পরতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্দিকে আর সবকিছু পাণ্ডুর, যেন হিমানীর গ্লানি মাখা।

সবিতা স্বপ্রকাশ হলেন। আলোতে আলোতে হিমানীর সর্ব-গ্লানি ঘুচে যাচ্ছে। পুব আকাশের দিকে ধেয়ে-ওঠা সূর্য-অসিরাজি সবিতা সংহরণ করে নিয়েছেন। জাদুকর তার ভানুমতীর ইন্দ্রজাল অদৃশ্য করে পূর্ণ মহিমায় রঙ্গমঞ্চে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমারই চোখের সামনে আমার বাগানের গোলাপের কুঁড়িটি ফুটে উঠল। এর সম্পূর্ণ ফোটাটি আমি প্রাণভরে দেখলুম। এর কিছুই ফাঁকি গেল না। কিন্তু এ ফোটা গোলাপের ফোটার চেয়ে কত লক্ষ গুণ গম্ভীর। এর ব্যাপ্তি বিশ্বচরাচর ছড়িয়ে এবং হয়তো ছাড়িয়ে।

আমার মনে আর কোনও ক্ষোভ রইল না।

www.pathagar.com

আলো ফুটেছে, কিন্তু জলে বাতাসে, ডাঙায় আকাশে এখনও যেন কী এক আবেশ জড়ানো। চিল্কার জল কেমন যেন একটা নীলুফরি রঙ মেখে নিয়েছে। এ রঙ সমুদ্রের জল চেনে না, দেশের বিলে, বিদেশের ব্লু ডানয়ুবেও নীলের এ আভাস আমি কখনও দেখিনি। তবে কি চিল্কা একদিকে যেমন হ্রদ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে জোড়া বলে শাদায় আর নীলে মিশে গিয়ে নিলুফরি রঙ ধরেছে? তাই হবে। বর্ষায় নাকি নদীর অপর্যাপ্ত জল হ্রদে নেমে এসে তার লোনা জলকে মিঠা করে দেয়। শীতে নাকি সমুদ্রের জোয়ারের মারে জল ফের লোনা হয়ে যায়।

নীলুফরির মাঝখানে ওই বিরাট কালো পোঁচ কিসের? মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলে সে-পোঁচ আবার অল্প অল্প দুলছে। স্টিমলঞ্চ ক্রমেই কালো পোঁচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই কালো ফালিটা জল ছেড়ে আকাশের দিকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল— লক্ষ লক্ষ পাখি। এরা নাকি এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, হিমালয় থেকে। ঠিকই তো; এদের হাত আমি দেখেছি খাসিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে, ডাউকির হাওরে হাওরে, চেরাপুঞ্জির জলে ভর্তি বিলে বিলে।

চিল্কার সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে মুচড়ে দিল, বুক থেকে কী যেন একটি উঠে এসে গলাটাকে বন্ধ করে দিল। আর যেন ঢোক গিলতে পারছিনে।

মাথার উপরকার সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি ছড়াল কে? পাপড়িগুলো অতি ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে, এদিক ওদিক হয়ে হয়ে জলের দিকে নেমে আসছে। বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।

এ তো সেই পাখিগুলোর বুক। এদের পিঠের রঙ কালো। তাই তারা যখন জলে বসে থাকে তখন মনে হয়, এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন, আর আকাশ থেকে যখন নেমে আসে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সিত-মল্লিকা-বর্ষণ।

পাশে ভাগ্নি কৃষ্ণা বসে ছিল। বললে, 'মামা, এই দেখ, চিল্কার দেবী কালী-মা'র দ্বীপ। ওখানে জল নেই, ঘাস নেই। তোমার টাকের মতো সবকিছু খা-খা করছে।'

টাকের কথা ওঠাতে বিরক্ত হয়ে দ্বীপের দিকে না তাকিয়ে তাকালুম রোষ-কষায়িত লোচনে কৃষ্ণার চোখের দিকে। সেখানে দেখি চিল্কার মাধুরী। কৃষ্ণার চোখের শাদা যেন শাদা হতে হতে নীলুফরি হয়ে গিয়েছে আর তার গায়ের কালো রঙ দিয়ে চোখের চতুর্দিকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা এঁকে দিয়েছেন কৃষ্ণাঞ্জন।

ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান! শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনেছি নির্ঝরিণীর কলকল রোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আরবের মরুভূমির বুক ফেটে বেরিয়ে আসা সুধারসে, নবজাত শিশুর গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢ়ের ভিজে মাটির গন্ধ।

রসময় পাঠক, এইবারে আমি তোমার একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি কাব্যরস ভিন্ন অন্য আরও দু একটি রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাদ্যরস। চিল্কার এ পাখির রস আমি চেখেছি দেশে। আবার লোভ হল। সঙ্গে ছিল স-বন্দুক পারিকুদের রাজা। তার এবং তার বন্দুকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিল্কার কালীকে স্মরণ করে

www.pathagar.com

বললুম, 'গোটা পাঁচেক পাখি দাও না, মা!' তার পর ভাবলুম, না, অত বেশি চাওয়া-চাওয়ি ভালো নয়, দেবীকে দেখাতে হবে, আমি কত অল্পতেই সন্তুষ্ট হই। মনে মনে বললুম, 'আচ্ছা, না হয়, পাঁচটা নাই-বা দিলে। গোটা দুত্তিন দিলেই হবে। আমার খাঁই মাইজি বড্ডই কম।'

বলেই একটা ইরানি গল্প মনে পড়ে যাওয়াতে হাসি পেল। এক ইরানি দরবেশ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললে, 'হে আল্লাতালা, আমাকে হাজার পঁচিশেক তুমান দাও। আমি তোমার কিরে কেটে বলছি, তার থেকে পাঁচ হাজার তুমান গরিব-দুঃখীদের ভেতর দান-খয়রাত করে বিলোব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আচ্ছা, তা হলে তোমার পাঁচ হাজার তুমান কেটে নিয়ে আমাকে বিশ হাজারই দাও।'

চিল্কা হ্রদ বিস্তর ছোট দ্বীপে ভর্তি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরিব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোনও যোগসূত্র নেই। এদের পোস্ট-অফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয়নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই-বা এরা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা-গারোরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে করে শহরে যায়। এটা সেটা দেখে, ফুটপাথের দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িষ্যারই আদিবাসীরা মাঝে মাঝে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমার বাড়িঘরদোর দেখে, হয়তো মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভেতরই ওদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যেসব জিনিসপত্র দিয়ে তারা মাছ ধরে দু হাজার বৎসর পূর্বেও তাই দিয়ে তারা মাছ ধরেছে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার এদের কোনও কাজে লাগেনি।

হয়তো ভালোই আছে। ফার্সিতে বলে, 'দূর বাশ্, খুশ বাশ্।' দূরে আছে, ভালোই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, 'যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' হয়তো 'সভ্যতা'র আওতায় না এসে এরা সত্যই সভ্যতর।

চিল্কার বড় দ্বীপ পারিকুদ। ডাঙা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিল্কা, কোথায় তার নীলুফরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধু-রেখা আর কোথায়ই-বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ্র বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ তো দেখছি, পুব-বাংলার পাড়া গাঁ। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু দিকে রাস্তার জন্য মাটি তোলা পলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোট ছোট শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম। মাছরাঙা ওড়াউড়ি করছে আর মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন বক। মোষগুলো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে গম্ভীরে মাথা নাড়ছে। শুধু পুব-বাংলার জমির মতো এ জমি উর্বরা নয়; তাই ক্ষেত-খামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়ায়। ওইখানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক; এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

সঙ্গে পারিকুদের রাজা। রাজবাড়িতে পৌঁছে দু দণ্ড জিরিয়ে নিলুম। সেখানে বিরাট বিরাট কৌচ সোফা, দশ-হাতি খাড়া আয়না, জগদ্দল কাবার্ড আলমারি, সোনার সিংহাসন,

www.pathagar.com

মার্বেল-টপ টেবিল, বাথ-টাব, ঝাড়-ফানুস, আর কত কী! ওসব ওই গরিব জেলেদের পয়সায়? অবিশ্বাস্য।

কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছে চিল্কার পার অবধি। তার পর কত চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের ভেতর এগুলোকে নৌকায় চাপানো হয়েছে, নামাতে হয়েছে, কত লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এগুলোকে রাজবাড়ি পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে এনেছে, পড়ি-মরি হয়ে উপরের তলায় তুলেছে।

শুধু রাজপরিবার এগুলো ব্যবহার করেন। রাজপরিবার বলতে উপস্থিত রাজা আর রানি। আর আজ সকালের মতো আমরা।

সূর্য মধ্যগগনে। লঞ্চ পুবদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্বদিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয় হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গরমের দেশের দগ্ধতাম্র দিগন্তে যে অস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অন্যরূপ। এখানে যে অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চুম্বনে সবকিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখিরা সব গেল কোথায়? শুধু দু একটি ঝাঁক হেথা হোথায়। বোধহয় ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী বলে দ্বীপের গাছতলার ঠাণ্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রঙ দেখছি।

হ্রদের জল দুপুর-রোদে অতি হালকা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রঙ এমনিতে ঘন সবুজ কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল। গ্রামের পেছনে পাহাড়, তার রঙ আরও একটু বেশি ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পেছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কী করে সম্ভব হয় জানিনে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপঝাড় হয় সবুজ রঙের কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কী করে? তবে কি আমার আর পাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি আমার চোখ দুটিকে নীলাঞ্জন— কিংবা নীল চশমা পরিয়ে দিয়েছে যে আমি সবকিছুই নীল দেখছি?

মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয় আর আলগা আলগা তাসগুলো জুড়ে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসে। এখানে যেন আকাশের অন্তরাল থেকে কোনও এক জাদুকর আকাশ, পাহাড়, বন, জল, এই হরতন, চিরিতন, রুইতন, ইশ্‌কাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন। কিন্তু এ ওস্তাদ লাল-কালোর দু রঙ না নিয়ে, মেলাই তসবির না এঁকে, এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস নিয়ে অপূর্ব এক ভেলকিবাজি দেখাচ্ছেন।

হ্রদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটেনি— একেবারে সম্পূর্ণ নিখিরকিচ। শুধু আমাদের লঞ্চ যেন চিরুনির মতো ইন্দ্রপুরীর কোনও এক রমণীর দীর্ঘ বিন্যস্ত নীলকুন্তলে সিঁথি কেটে

www.pathagar.com

কেটে সমুদ্র-সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিঁথির দু দিকে চূর্ণ কুন্তলের ফেলনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কিন্তু এ গরবিনীর কুন্তলদাম এমনই বিপুল যে চিরুনি বেশিদূর এগোতে-না এগোতেই দেখতে পাই, দু দিকের ঘন কুন্তল সিঁথিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চতুর্দিকে অসীম শান্তি পরিব্যাপ্ত। শুধু লঞ্চের মোটরটার একটানা শব্দ কর্ণে পীড়া দেয়। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু, এই নীলিমার সৌন্দর্যমাধুরীতে ডুব দিলে কানে এসে মোটরের শব্দ পৌঁছয় না।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনেক পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা দিলেন না কেন?

এবারে সূর্যাস্ত। পশ্চিমের আকাশ হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল। আকাশ যেন প্রথমটায় তাঁর নীল কপালের সিঁথিতে একফালি সিঁদুর মেখেছিলেন, তার পর তার খোকা কচি হাতে এলোপাতাড়ি থাবড়া দিয়ে এখানে-ওখানে খাবলা খাবলা সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে। মা শেষটায় সমস্ত মাথায় সিঁদুর মেখে নিয়েছেন।

নীলে লালে মিশে গিয়ে বেগুনি হয়? তাই বোধহয়।হ্রদের জল বেগুনি হয়ে গিয়েছে।

আজকের সূর্যাস্ত বড় অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটে শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মাহফিল শেষের তানপুরোর রেশের মতো খানিকক্ষণ আকাশ বাতাস-জলস্থল রাঙিয়ে রাখে।

দিল্লির কবি গালিব সাহেব এই 'শেষ রেশটুকু'র ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর দুরবস্থা তখন চরমে। বাড়িখানা ঝুরঝুরে। এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'অগর পানি বরস্‌তা এক ঘণ্টা, তো ছৎ বরসতি দো ঘণ্টে'— 'জল যদি বর্ষে এক ঘণ্টা তো ছাত বর্ষে দুঘণ্টা!'

দু এক ঝাঁক পাখি এখানে-ওখানে। পারিকুদের রাজাকে বললুম, 'দু একটা মার না।'

রাজার রাজকীয় চাল। পাখি দেখলে চাকরকে ধীরে সুস্থে বলেন, 'বন্দুকো।' চাকর রাজার রাজা! তার চাল আরও ভারিক্কি। আরও ধীরেসুস্থে কেস খুলে বন্দুক এগিয়ে দেয়। রাজা গদাইলস্করি চালে 'বন্দুকো' জোড়া লাগিয়ে বলেন, 'কার্তুজো'। ক-রে, ক-রে সব যখন তৈরি তখন পাখিরা সাইবেরিয়ায় চলে গিয়েছে। তবে কি রাজার তাগ খারাপ?

তবু ভদ্রতার খাতিরে দু একটা গুলি ছুড়লেন। ফলং শূন্যং।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বড়লাট গেছেন বরোদায় পাখি শিকারে। আমাদের ওস্তাদ শিকারি রহমত মিয়া গেছেন সঙ্গে। সন্ধ্যায় যখন ওস্তাদ বাড়ি ফিরলেন তখন বাচ্চা শিকারিরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধালে, বড়লাট সায়েবের তাগ কী রকম? ওস্তাদ প্রথমটায় রা কাড়েন না। শেষটায় চাপে পড়ে বললেন, 'বড়লাটের মতো শিকারি হয় না, আশ্চর্য তাঁর তাগ। কিন্তু আজ খুদাতালা পাখিদের প্রতি সদয় (মেহেরবান) ছিলেন।'

পূর্ব-পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকটিরিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিমের লালের ইশারায় পুব লাল হয়। সেই লাল ফিকে হচ্ছে— কী গোপন কায়দায় তার খবর পূর্বে পৌঁছচ্ছে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ তো ফিকে, কোনও রঙ নেই,

www.pathagar.com

ফেরফার নেই। কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে, এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়?

আধা আলো-অন্ধকারে সাতপাড়া দ্বীপে নামলুম। আম-বাগানের ভেতর ছোট একটি ডাক-বাংলো। লাঙ্গুল আশ্রমের কাচ্চাবাচ্চারা কিচিরমিচির করছে। খানিক পরে চিল্কা হ্রদের তাজা মাছ-ভাজার গন্ধ নাকে এল। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি, কখন খেলুম কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, কিচ্ছু মনে নেই।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল। দেখি আমার অজানাতে বাতিওলারা এসে আসমানের ফরাশে এখানে ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে। এবারে শেষ রাত্রের মুশায়েরা বসবে। আমগাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝিঁ নূপুর বাজাবে, পুবের বাতাস মজলিসের সর্বাঙ্গে গোলাপ-জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে।

তার পর দেখি দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে চাঁদ উঠলেন ধীরে ধীরে, গা টেনে টেনে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। অন্ধকার আকাশে যেসব মোসাহেবরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁদেরও চেনা গেল। ছোট বাচ্চা যেমন মুশায়েরার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আবার তেমন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হল। আজ আমার ছুটি শেষ। আপিসের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। লঞ্চে উঠে পাড়ের পানে রওনা দিলুম। সে সকালেও অনেক নবীন সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু আপিসের জুজু আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অসাড় করে দিয়েছে। যেন ডুবসাঁতার দিয়ে ডাঙায় পৌঁছে, আপিস আর অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কটক এলুম।

বাঙালি

এই যে কলকাতা। জয় মা গঙ্গা!

আর যেন মা তোমায় কুলত্যাগ করে ভিন-দেশে যেতে না হয়।

আহা, মাইকেল কী কবিতাই না রচেছিলেন—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।
তাই ভাবি মনে—'

কিন্তু আশাকে আমি দোষ দিইনে। আশাকে তখনই দোষ দেওয়া যায়, যখন মানুষ হেথাকার শান্তি-সুখ বর্জন করে হোথাকার খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য ছোটে। কিন্তু বঙ্গসন্তান মাত্রই কলকাতা ছাড়ে পেটের দায়ে। হেথায় অন্ন জুটছে না বলেই সে হোথাপানে ধেয়ে যায়—হায়, তার জীবনে স্বাধীনতা কোথায়? 'তার জীবন' কথাটিই ভুল। তা না হলে আজ ঢাকার পয়সাওলা ছেলে কলকাতার রাস্তায় ফ্যাফ্যা করছে কেন? কলকাতার বাচ্চাই-বা দিল্লির এর দোরে ওর দোরে হানা দিচ্ছে কেন? তার জীবন তো এখন দৈন্যের জীবন, দু মুঠো অন্নের কাছে গচ্ছিত, একটুকরো কাপড়ের কাছে বেচে দেওয়া।

www.pathagar.com

কিন্তু থাক এসব অপ্রিয় আলোচনা। আপনাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, আপনারা শাঁক বাজান আর নাই বাজান 'মম চিত্ত মাঝে' ঘন ঘন শাঁক বাজছে।

বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে— না? তবে কি না আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যার জন্মদিন, তা সে পাঁচ বছরের ছেলেই হোক সেদিন সে রাজা। তার চতুর্দিকে সেদিন পর্ব জমে ওঠে, তাকেই সবাই কথা কইতে দেয়। আজ কলকাতায় আমার পুনরায় নবজন্মদিনে আমার সহৃদয় পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিঞ্চিৎ বা বরদাস্ত করে নেবেন বইকি। শাস্ত্রেরও তার ব্যবস্থা আছে। আমি স্মার্ত নই, তাই আবছা-আবছা মনে পড়ছে, কেউ চৌদ্দ বৎসর (কিংবা সাতও হতে পারে) নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার শ্রাদ্ধ করতে হয়, কিন্তু তার পর যদি হঠাৎ সে ফিরে আসে, তবে তার জন্য নতুন করে জন্মোৎসব ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম করতে হয়। তাকে মাতৃগর্ভস্থ ছোট বাচ্চাটির মতো দু মুঠো বন্ধ করে আস্তে আস্তে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ভান করতে হয়। তার নামকরণ, চূড়াকরণ, এমনকি নতুন করে উপনয়নও হয়। মনে পড়ছে না, তবে বিবেচনা করি, ব্রহ্মচর্যের পর তাকে পুনরায় তার স্ত্রীকে বিয়েও করতে হয়— বিলিতি ধরনের সিলভার, গোল্ডেন ওয়েডিংয়ের মতো। তাতেই-বা কী কম আনন্দোল্লাস, অবশ্য সবকিছুই হয় ঘণ্টাখানেকের ভেতর। এ সবক'টা ব্যবস্থাই আমার বড়ই মনঃপূত, ভাবতে গেলেই হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন বাচ্চাটির অর্থাৎ লোকটার মায়ের ছবি মনের ওপর ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু পরিবর্তন করে বলি, তিনিও কি সেদিন বধূ-বেশ পরে সীমান্তর উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টেনে নিয়ে অন্যান্য অন্তঃপুরিকা কুললক্ষ্মীদের ন্যায় প্রসন্নকল্যাণ মুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত হন না?

কিন্তু হায় যার মা নেই?

দিল্লি ভালো জায়গা; ভালোবাসি কিন্তু কলকাতাকে।

আসানসোল কিংবা বর্ধমানের কাছে রেলগাড়িতে ঘুম ভাঙল। আগের রাত্রে যুক্ত প্রদেশের কোনও নাম-না জানা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে যে, পরদিন সকালবেলাই চোখ মেলব বাঙলা দেশে; তাই না জাগলে আমি হাওড়া পেরিয়ে, শেয়ালদা ছাড়িয়ে যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, তার খবর কি আই.বি. পর্যন্ত রাখতে পারত? ডাক্তাররা বলেন, মনের শান্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদায়িনী— ওনারা তত্ত্বটা লাতিনে বলেন বলে আমি অনুবাদটি ঈষৎ সংস্কৃত-ঘেঁষা করে দিলুম। ঘুম কেন বর্ধমানের কাছাকাছি ভাঙল সেকথাও নিবেদন করছি। চায়ের গন্ধ পেয়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আসাম-বাংলার বাইরে কেউ চা তৈরি করতে জানে না— বাংলা প্ল্যাটফর্মের রদ্দি চা-ও দিল্লি-লাহোরের উত্তম উত্তম খানদানি পরিবারের চা-কে খুশবাইতে হার মানাতে পারে। বাংলার চায়ের খুশবাই ঘুম ভাঙাল।

চোখ খুলে দেখি সমুখে বাংলা।

অবশ্য মানতে হবে যুক্তপ্রদেশ-বিহার দুম করে বাঙলা দেশে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি 'আলোক-মাতাল স্বর্গ-সভার মহাঙ্গন থেকে' 'কালের সাগর' পাড়ি দিয়ে এক মুহূর্তেই 'শ্যামল মাটির ধরাতলে' চলে আসতে পারেন তবে আপনিই-বা কেন এক ঘুমের ডুব-সাঁতার কেটে এলাহাবাদ থেকে বর্ধমান পৌঁছতে পারবেন না? এমনকি, গেল রাত্রিতে যে-লোকটা আপনার কামরায় ঢুকে উপরের বার্থে শুয়েছিল, যাকে আপনি 'ছাতু' ভেবে

www.pathagar.com

অবহেলা করেছিলেন, সে ব্যক্তি বর্ধমানে পৌঁছে দেখবেন দিব্যি বাংলা বলতে আরম্ভ করছে। আপনার জানটা অকারণে খুশ হয়ে যাবে, গায়ে পড়ে বলবেন, 'এক কাপ চা হবে স্যার!'

পাঞ্জাবিদের তুলনায় এরা কালো, বেঁটে, রোগা, অনেকেই হাড্ডিসার, এদের সুট কেনার পয়সা নেই, যদি-বা থাকে তবু মাসে দু বার করে প্রেস করিয়ে ব-তরিবত পরতে জানে না, এদের রমণীরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের শাড়ি-ব্লাউজ পরে, পেট-কাটা এক বিঘতি কাঁচুলির উপর অবহেলার দোপাট্টা ফেলে এরা গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না, এদের বাচ্চারা ট্যাঁশ উচ্চারণে 'ড্যাডি' 'মাম্মি' 'ও কে' 'নো কে' বলতে শিখলে না— এরাই বাঙালি।

দিল্লির লোক একদা মাংস-রুটি খেত; এখনও তারা রুটি-মাংসই খায়। শুনেছি বাঙালিরা নাকি এককালে মাছ-ভাত খেত। ঠিক বলতে পারব না, এখনও খায় কি না! রেশনে যে-বস্তু পাওয়া যায়, তাকে চাল বলে তারা তাদের বাপ-পিতেমোর খাদ্য চালকে অসম্মান করতে চায় না। এই কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ কিছু মাছ ধরা পড়াতে বাঙালি উদ্বাহু হয়ে যে নৃত্যটা দেখালে, তাতে মনে হল— আমি দিল্লিতে বসে 'আনন্দবাজারে' পড়েছিলুম— যেন স্বয়ং উর্বশী স্বর্গ থেকে সুধাভাণ্ড নিয়ে বাঙলা দেশে অবতীর্ণা হয়েছেন! ছেলেবেলায় দেখেছি, উদ্বৃত্ত মাছ পচিয়ে পোড়াবার জন্য তেল আর ক্ষেতে দেবার জন্য সার তৈরি করা হয়েছে! যাঁরা এসব করেছেন, তাঁরাও বাঙালি, এরাও বাঙালি।

এককালে এ দেশের শিক্ষিত লোকমাত্রই সংস্কৃত জানতেন কিংবা আরবি-ফার্সি জানতেন। উনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠল, যার তুলনা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে নেই— সে এমারত গড়াতে চুনসুর্কি জোগালে সংস্কৃত এবং কিছুটা আরবি-ফার্সি, আজ সে সৌধের স্তম্ভ তোরণ দেখে বাঙালি মুগ্ধ, কিন্তু শুনতে পাই, দু মুঠো অন্নের জন্যে সে আজ এতই কাতর যে, জোর করেও তাকে আজ আর সংস্কৃত পড়ানো যাচ্ছে না। তবে একথা ঠিক, তাই নিয়ে সে লজ্জা অনুভব করে, খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (রাষ্ট্রভাষার পীঠভূমিতে সংস্কৃতচর্চার জন্য চেল্লাচেল্লি হয়, কিন্তু কেউ গা করে না)।

এই লজ্জাটুকু নিয়েই বাঙালি।

তবুও এই বাঙলা দেশ।

এখনও ধুলো কমেনি, সে ধুলো এখনও লাল, পুরোপুরি বাঙলা দেশ এখনও আরম্ভ হয়নি।

হঠাৎ দেখি লাইনের পাশে পুকুর ভরে রক্তপদ্ম ফুটেছে। সবুজ বাঁশবনের মাঝখানে ছোট্ট পুকুরটি-কৃষ্ণনীরে রক্ত-সরোজিনী! দিল্লির নিজাম-প্রাসাদের লাল গোলাপের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ক্ষণেকের তরে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল, তরুণ বয়সে যখন এই অঞ্চলে বসবাস করতে এসেছিলুম তখন প্রথম দর্শনেই এরা আমার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে নিয়ে বসেছিল। শরৎ, হেমন্ত, এমনকি, বেশ শীত পড়ার পরও কত দূর পুকুরে পদ্মের সন্ধানে গিয়েছি, কখনও ফিরেছি একটিমাত্র পদ্ম নিয়ে, হাতে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে, কখনও-বা এক আঁটি বগলে করে। প্রিয়জনকে বিলিয়েছি হাসিমুখে, লোভীজন জোর করে কিছুটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, ক্ষণেকের তরে ক্ষুণ্ন হয়েছি কিন্তু বিরক্ত হইনি। ঘরে এসে কলসিতে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি। যতদিন পারা যায়। তার পর তারা একে একে শুকনো মুখে বিদায় নিয়েছে আজ সকালে একজন, কাল সকালে দু জন।

www.pathagar.com

বুকে লেগেছে, মনে ভেবেছি, আর পদ্ম আনতে যাব না, আনলেও সব কটি বিলিয়ে দেব, ঘরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা কি মনে রাখা সোজা? একেই তো জ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন শ্মশান-বৈরাগ্য।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানুষ আবার কিছুদিন পরে বিয়ে করে সংসার পাতে, আবার বিরহ-বেদনা, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আমিও শ্মশান-বৈরাগ্য ভুলে গিয়ে নতুন করে সংসার পেতেছি, আবার তাদের বিদায়-বেলায় ম্লান মৃদু গন্ধে বিধুর হয়েছি।

কিন্তু ওই যে লোকে বলে, মার খেতে খেতে মানুষ শক্ত হয়, কই, আমি তো হতে পারলুম না!

তার পর তো দেশ-বিদেশে ঘুরেছি। নরগিস দেখেছি, দায়ুদী কিনেছি, লিলি শুঁকেছি, বসরার গোলাপ বুকে গুঁজেছি, বড় বড় ফুলের বাজারের পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশি ফুলের জলুস দেখেছি, কিন্তু কখনও বেশিক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারিনি আমার রক্তপদ্মকে।

বিদেশি বন্ধুরা জিগ্যেস করেছেন মতামত। আমি তাদের ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসা গেয়ে শেষটায় বলেছি, কিন্তু আমাদের পদ্ম ভারি চমৎকার ফুল। এক বন্ধু তখন মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এ লোকটা বিদেশে ঘোরে স্বদেশ আপন পকেটে রেখে রেখে।'

এইবার দেশে ফিরেছি। স্বদেশ আর পকেটে পুরে রাখতে হবে না।

জয় মা, গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।

সুকুমার রায়

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আঙিনা পেরুতে-না-পেরুতেই একখানা নেমন্তন্ন পেয়ে গেলুম।

এলগিন রোড অঞ্চলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'হরবোলা' নাম দিয়ে একটি দল গড়েছে। এদের উদ্দেশ্য হাস্যরসের উত্তম উত্তম পালার অভিনয় করে বাঙালির হৃদয়ে তার লুপ্তপ্রায় হাস্যরসকে আবার বইয়ে দেওয়া। হরবোলার প্রযোজকদের ভাষায় বলি, 'হাসতে ভুলে গেছি বলে দুর্নাম আছে আমাদের (বাঙালির)। সুকুমার রায়কে কেন্দ্র করে সেই দুর্নাম কিছুটা যদি আমরা দূর করতে পারি, তা হলেই এই উদ্যোগ সার্থক হবে।' হরবোলা নেমন্তন্ন করেছেন, তাঁদের প্রথম পালা দেখতে।

সুকুমার রায় যে বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সে বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁরই রচিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' বেছে নিয়ে হরবোলা আপন রুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

'সকের থিয়েডার', তার ওপর হরবোলার অধিকাংশ সদস্য অভিনয় করতে নেমেছেন, গান ধরতে শুরু করেছেন জীবনে এই প্রথম, কাজেই পালা এবং তার বন্দোবস্তে যে দোষত্রুটি

www.pathagar.com

থাকবে সেটা আগের থেকেই বলা যেতে পারে, কিন্তু দোষক্রটি সত্ত্বেও তারা যে রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেইটেই সবচেয়ে আনন্দের কথা।

আমি কিন্তু একটা ধোঁকা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সিরিয়স নাট্য কীভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে, কিন্তু যে নাট্য মূলে হাস্যরসে টইটম্বুর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে? বিশেষ করে সুকুমার রায়ের পালা, যেখানে প্রতি ছত্রে, না, প্রতি শব্দে রস আর রস। নট যদি সেখানে তার অভিনয় নিয়ে সে রস শুধু প্রকাশই করেন, তবে তো আর কোনও হাঙ্গামা থাকে না, কিন্তু যদি সে রস প্রকাশ করতে গিয়ে নট সেখানে 'থিয়েটারি' (অর্থাৎ করুণকে করুণতর, বীরকে বীরতর, হাস্যরসঘনকে ঘনতর) করে ফেলেন, তা হলে সেটা চপলতায় পরিণত হয়। সুকুমার রায়ের রচনা হাস্যরসে এতই কানায় কানায় ভরা যে, তাতে কোনও কিছুই যোগ দিতে গেলেই, তা সে আঙ্গিকের মাত্রাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যেকোনো বস্তুই হোক, রস নষ্ট হয়ে যায় এবং রসিকতা তখন প্রগল্‌ভতা হয়ে যায়।

এই বিপদে না পড়ার জন্যই বাস্টার কিটন হামেশাই প্যাঁচার মতো মুখ করে হাস্যরসের অভিনয় করতেন, কিন্তু চার্লি চেপলেন তাঁর অভিনয়ে যৎকিঞ্চিৎ 'থিয়েডারি' এনে হাস্যরসকে আরও জম-জমাট ভর-ভরাট করে তোলেন, কিন্তু এ দু জনেরই সমস্যা হরবোলা সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক সহজ। এঁদের রসিকতা ঘটনা কিংবা অ্যাক্‌শান নিয়ে— কেউ কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়লেন, কেউ 'পিয়া মিলন কো' গিয়ে খাণ্ডার স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়লেন, কাজেই তাঁর অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু সুকুমার রায়ের রসিকতা সূক্ষ্মতর, হাস্যরসের জগতে সূক্ষ্মতম বললেই ঠিক বলা হয়, সে রসিকতা প্রধানত ভাষায় এবং ভাষা ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনায়। অভিনয়ের ভেতর দিয়ে তাকে বাহ্য রূপ দেওয়া, চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা (একসটেরিয়োরাইজ করা) তো সহজ কর্ম নয়। করিই-বা কী প্রকারে? বাস্টার কিটনের মতো প্যাঁচা-ঢঙে, না চার্লির মতো একটুখানি রসিয়ে?

এই হল আমার ধোঁকা।

'হরবোলা' সম্প্রদায়ের মস্ত একটা সুবিধে, তাঁরা 'সকের দল' গড়েছেন। কাজেই তাঁরা এক্‌সপেরিমেন্ট করে করতে ভয় পাবে না জানি, সেই আমার ভরসা। আঙ্গিক নিয়ে ধোঁকা থাকলেও এ বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সে আঙ্গিক ব্যবহার অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রচুর সফলতা অর্জন করেছেন। সুতরাং তাঁরা যদি সুকুমার রায়ের আসছে পালা কিটন-আঙ্গিকে করে দেখেন তবে মন্দ হয় না। এই ধরনের এক্‌সপেরিমেন্ট করেই শেষটায় পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক কোন আঙ্গিক সুকুমার রায়ের হাস্যরসকে রঙ্গমঞ্চে রূপায়িত করার উপযুক্ত।

'শক্তিশেল'-এর সঙ্গীতের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন আমার জনৈক বন্ধু, ওস্তাদ ফৈয়জ খানের শিষ্য। আমি তাঁর অন্ধ ভক্ত; কাজেই এস্থলে তাঁর সঙ্গীত-পরিচালনার গুণাগুণ যদি আমি বিচার না করি, তবে আশা করি তিনি অপরাধ নেবেন না।

শেষ কথা, কর্মকর্তাগণ অভ্যাগত-অতিথিদের প্রচুর খাতির যত্ন করেন। শুধু লৌকিকতা বা মুখের কথা নয়, আমি সর্বান্তঃকরণে 'হরবোলা'র হরবকৎ হরেক রকমের উন্নতি কামনা করি।

www.pathagar.com

সুকুমার রায়ের মতো হাস্যরসিক বাংলা সাহিত্যে আর নেই সেকথা রসিকজন মাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু একথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি ফরাসি, ইংরেজি, জর্মন সাহিত্যেও নেই, রাশানে আছে বলে শুনিনি। একথাটা আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হল, কারণ আমি বহু অনুসন্ধান করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একমাত্র জর্মন সাহিত্যের ভিলহেল্‌ম্‌ বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয়-স্ব-শ্রেণি না হলেও ঠিক সুকুমারের মতো তিনিও অল্প কয়েকটি আঁচড় কেটে খাসা ছবি ওতরাতে পারতেন। তাই তিনিও সুকুমারের মতো আপন লেখার ইলাসট্রেশন নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইউরোপে অভূতপূর্ব সেকথা 'চরুয়া' ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।

বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বুশ বেশিরভাগই ঘটনাবহুল গল্প ছড়ায় বলে গিয়েছেন এবং সে কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সুকুমার রায়ের বহু ছড়া নিছক 'আবোল-তাবোল' তাতে গল্প নেই, ঘটনা নেই, কিছুই নেই— আছে শুধু মজা আর হাসি। বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যেরকম শুধুমাত্র ধ্বনির ওপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়ে গীত বানাতে হয় না, ঠিক তেমনি সুকুমার রায়ের বহু বহু ছড়া স্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশান নেই, গল্প নেই, অর্থাৎ আর কোনও দ্বিতীয় বস্তুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বড় কঠিন কর্ম। এ কর্ম তিনিই করতে পারেন, যাঁর বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এ জিনিস অভ্যাসের জিনিস নয়। ঘষে মেজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ বস্তু হয় না।

বুশ আর সুকুমারের শেষ মিল, এঁদের অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা জর্মন কিংবা বাংলার কেউ কখনও করেননি, এঁদের ছাড়িয়ে যাবার তো কথাই ওঠে না।

একদা প্যারিস শহরে আমি কয়েকজন হাস্যরসিকের কাছে 'বোম্বাগড়ের রাজা'র অনুবাদ করে শোনাই— অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল (তাতে করে কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হয়েছিল অস্বীকার করিনে) এবং 'আলতা'র বদলে আমি লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলুম (আমার ঠোঁটে কিংবা চোখে নয়— অনুবাদে)।

ফরাসি কাফেতে লোকে হো-হো করে হাসে না, এটিকেটে বারণ, কিন্তু আমার সঙ্গীগণের হাসির হর্‌রাতে আমি পর্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁদের হাসি বন্ধ করতে বারবার অনুরোধ করেছিলুম। কিছুতেই থামেন না। শেষটায় বললুম, 'তোমরা যেভাবে হাসছ তাতে লোক ভাববে, আমি বিদেশি গাড়ল, বেফাঁস কিছু একটি বলে ফেলেছি আর তোমরা আমাকে নিয়ে হাসছ— আমার বড় লজ্জা করছে।' তখন তাঁরা দয়া করে থামলেন, ওদিকে আর পাঁচজন আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল বলে আমি তো ঘেমে কাঁই।

তার পর একজন বললেন, 'এরকম weird, ছন্নছাড়া, ছিষ্টিছাড়া কর্মের ফিরিস্তি আমি জীবনে কখনও শুনিনি।'

আরেকজন বললেন, 'ঠিক! এবার একটা চেষ্টা দেওয়া যাক, এ লিস্‌টে আর কিছু জুতসই বাড়ানো যায় কি না!'

সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে আকাশ পাতাল হাতড়ালুম, দু একজন একটা-দুটো অদ্ভুতকর্মের নামও করলেন, কিন্তু আর সবাই সেগুলো পত্রপাঠ ডিসমিস করে দিলেন।

www.pathagar.com

আমরা জন পাঁচ প্রাণী প্রায় আধঘণ্টা ধস্তাধস্তি করেও একটা মাত্র জুতসই এপেনডিক্স পেলুম না! গোটা কবিতার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আগের থেকেই জানতুম, কিন্তু সেদিন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলুম, যদিও সুকুমার রায় স্বয়ং বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়', যে জগতে সুকুমার বিচরণ করতেন, সেখানে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সিগনেট প্রেস সুকুমার রায়কে পুনরায় বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন বলে বাংলার ভেতরে-বাইরে বহু লোক ওই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। আমার বাসনা, সিগনেট যত শীঘ্র পারেন সুকুমার রায়ের অন্যান্য গদ্য পদ্য লেখা যেন পুনরায় প্রকাশ করেন। বহু অতুলনীয় অনবদ্য অভূতপূর্ব লেখা 'সন্দেশ'-এর ফাইলে চাপা পড়ে আছে। 'পাগলা দাশু'কে পেয়ে যেন লঙ লস্ট ব্রাদারকে পাওয়ার আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরেছি, কিন্তু তার আর সব ভাই-বেরাদররা কোথায়? তারা যেন আর বেশিদিন আত্মগোপন না করে।

দু একটি অসাবধানতা লক্ষ করেছি, তারই একটা এ স্থলে নিবেদন করি।

'খাই-খাই' কাব্যের 'পরিবেশন' কবিতায় আপ্তবাক্য দেখছি—

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস' কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারও কিছু চাই" বলি তড়বড় ছুটি
বীরোচিত ধীর পদে এসে দেখি ত্রস্তে
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।'

অথচ আমার অর্ধবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি বলেছে :

'কোনো চাচা অন্ধপ্রায় (মাইনাস কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি
"কারও কিছু চাই" বলে' তড়বড় ছুটি।
হঠাৎ ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড়ি পড়ে কারও নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীরপদে'
— ইত্যাদি ইত্যাদি

'হঠাৎ ডালের পাঁকে' ইত্যাদি লাইন দুটো বাদ পড়াতে অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। কিন্তু থাক, আর না। সুকুমার রায় বলেছেন :

'বেশ বলেছ, ঢের বলেছ
ঐখেনে দাও দাঁড়ি,
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন
বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি ॥'

www.pathagar.com

ভাষার জমা-খরচ

পুব-বাংলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের সংখ্যা এক লপ্‌তে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাংলার উপভাষা দক্ষিণ-কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোনও কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছিনে— শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) সয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনও কোনও লেখক ওঠাননি। পুব-বাংলার লেখকেরা ভাবেন, 'ক'রে' শব্দকে 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার করা হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গিতে বা ইডিয়মে— অবশ্য সেগুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে ইডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পুব-বাংলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরিব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতির লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেন?' অর্থাৎ 'হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতিখেলা যে Polo খেলা সে কথা বাংলা দেশের কম লোকেই জানেন, (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ-ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওতরাবে না। আবার,

'দুষ্টলোকের মিষ্ট কথা,
দিঘল-ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল।
তিনই মন্দকারী।'

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোনও বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটা মহৎগুণ আছে এবং এ গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ— যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাংলা এবং পশ্চিম বাংলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'— এ স্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম, অর্থাৎ চটুল, সৌখিন হয়তো-বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লি, আগ্রা, বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখনউ, দিল্লিতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক। কিন্তু এদের সব্বাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাকশূন্য করা, ফার্সি এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম।

প্রথম তা হলে একটি সর্বজন-পরিচিত, রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়, অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে

www.pathagar.com

গেলেই পাঠক অনায়াসে নতুন বস্তুটি চিনতে পারে— ইংরেজিতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুলরুম টু দি ওয়াইড ওয়ার্লড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারিনে। তাই পশ্চিম বাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী, 'রমনা যেতে কত নেবে?'

কুট্টি গাড়োয়ান, 'এমনিতে তো দেড় টাকা, কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।'

যাত্রী, 'বল কী হে। ছ আনায় হবে না?'

কুট্টি, 'আস্তে কন কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

এর জুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাইনি।

মোটেই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মতো কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজরামর, কিন্তু কুট্টি হামেশাই চেষ্টা করে নতুন নতুন পরিবেশে নতুন নতুন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন এক কুট্টি গিয়ে যে ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াটাকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বলল, 'কন্ কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া তো নয়, বাঘের বাচ্চা, বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল ড্র' করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথি, অপটিমিজম।'

কিংবা, আরেকটি গল্প নিন, এটা একবারে নিতান্ত এ যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশিদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং সুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো রঙ কোট বা প্রিন্স কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশকালো তদুপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানি শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচ করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের উপর ছটা বোতাম, আর দু হাতে কব্জির কাছে তিনটে তিনটে করে ছোট বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্স কোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানি (বাকির-খানি) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমির আলী অ্যাভিন্যুতেই অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখর-খানি লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি কুট্টির সব গল্পও ক্রমে ক্রমে বাখরখানির মতোই পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নতুনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনও কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন— পরশুরাম যেরকম পশ্চিম বাংলার নানা হালকা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম যেরকম একদা কলকাতার নিতান্ত কক্‌নিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এটা হল জমার দিকে, কিন্তু খরচের দিকে একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশির সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে ভাষা বিদেশি অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পুব-বাঙালির সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটিভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তার, এলাহি, বেলেল্লা, বেহেড, দো গেড়ের চ্যাং এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পূব-বাঙালির সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন তবে আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের রক-আড্ডাতে পুব-বাঙালির সংখ্যা থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারি গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্য-ভঙ্গি বানাতেন যে, রসিকজনই বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পুব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো এরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জমজমাট হয় না— আড্ডা জমে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পুব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্র ভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টো এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণির খানদানি কলকাত্তাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবি ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল ভাশুর-ভ্রাতৃবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমা'র কাছে শেখা বাংলা এবং সে বাংলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তারাই বলতে পারবেন যাঁরা সে বাংলা শুনেছেন। ক্রিক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানি ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে বাংলা বলতেন তার ওপর বাংলা সাহিত্যের বা পুব-বাংলার কথ্য ভাষার কোনও ছাপ কখনও পড়েনি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্যমনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরান, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছে থেকে এ অধম এন্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালিই চেনেন, এঁর নাম গাঙুলি মশাই— ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিল ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু, এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

www.pathagar.com

কলের একদিক দিয়ে গোরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে জলতরঙ্গের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ টারালাপ করে, গাঙ্গুলি মশাই আর অন্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে— এ গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিপাটি হয়নি?

হায়, এ-শ্রেণির লোক এখন আর দেখতে পাইনে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের ওপর।

দর্শনচর্চা

মাদ্রাজে দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপলাচারী বলেন, 'প্রাচীনকালে চরম ও পরম সত্যের অন্বেষণার জন্য যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, তাঁহারা ইহাকে কেবল বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর বলিয়াই মনে করিতেন না, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্তীকালে দার্শনিকগণ যে সমস্যা লিখিলেন, তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত সে সমস্ত কথা একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই হইল না।'

ঠিক এই উক্তিটিই আজকাল নানা গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনতে পাওয়া যায় বলে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিকাল মূল্য ছিল, এখন আর নেই; এখন দার্শনিকদের কেতাবে শুধু শব্দ আর শব্দ, এই হল রাজাজির মূল বক্তব্য।

এককালে 'ক' ছিল এখন 'খ' হয়ে গিয়েছে, সে কথা কেউ বললেই দার্শনিকরা তার জবাবে বলেন, কারণ বিনা কার্য হয় না, অতএব দেখতে হবে দর্শনের বাস্তব মূল্য হঠাৎ উবে গেল কেন।

এ কথা যদি প্রমাণ করা যায় যে, দার্শনিকেরা আস্তে আস্তে চরম ও পরম সত্যের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে একদিন অসত্যের সন্ধানে লেগে গেলেন তা হলে অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, সেই কারণেই তাদের পুস্তকরাজি আজ অবোধ্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু এ যাবৎ, কি এদেশে কি বিদেশে, কেউ তো দার্শনিকদের এরকম সন্দেহের চোখে কখনও দেখেনি। বরঞ্চ বেশ জোর দিয়ে বলতে হবে, সত্য দার্শনিক চরম সত্য ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের সন্ধান কখনও করেনি— ধাপ্পাবাজি জাল-জোচ্চুরি করার ক্ষমতা যার আছে, সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে মন দেবে কেন, এসব তো করে অন্য লোকেরা। এই দার্শনিকই তাই দুঃখ করে বলেছেন,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম্!

অর্থাৎ যে প্রতারণা করতে জানে তার বিদ্যার কী প্রয়োজন। তার পরই তিনি আবার বলেছেন ঠিক ওই একই বাক্য,

www.pathagar.com

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যয়া কিম্
প্রয়োজনম্!

কিন্তু এবারে প্রতারণাসমর্থ শব্দের সন্ধি ভাঙতে হবে প্রতারণা + অসমর্থ দিয়ে অর্থাৎ তুমি যদি প্রতারণা না করতে জান তবে বিদ্যে নিয়ে তোমার কী কাজ হবে?

তাই বিদ্যা বিদ্যারই জন্য, দর্শন দর্শনেরই জন্য। অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানুসন্ধানেরই জন্য। সত্য নিরূপিত হলে সেই যদি তোমার-আমার কাজে না লাগে তবে সত্যের সেটা দোষ নয়। শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি মশারির পেরেক ঠোকা না যায় তবে সেটা শিবলিঙ্গের দোষ নয়।

মানুষ কোনও যুগেই সম্পূর্ণ সত্য সন্ধান পায়নি— পেয়ে থাকলে তার আর অবনতি-উন্নতি কিছুই হত না। সম্পূর্ণ সত্য ভগবানের হাতে, মানুষের কাজ হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা সেই সত্যের যতদূর সম্ভব কাছে পৌঁছানোর। তাই করতে গিয়ে তার প্রচেষ্টার ফল যদি অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকাল) হয় তবু তাকে সত্যেরই সন্ধান করতে হবে।

এ স্থলে আর একটি কথা ওঠে। সত্য নিরূপিত হলে তাকে কাজে লাগাবার ভার কার হাতে? এখানে বিজ্ঞান থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। এটম বম্ বানাবার সূত্রটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন তার পর এটম বম্ বানানো হবে কি না এবং হলে পর সেটা হিরোশিমার মাথায় ফাটানো হবে কি না সেটা স্থির করেন রাজনৈতিকরা, সমাজপতিরা, জাঁদরেলরা। তাঁরা যদি না চান, তবে বৈজ্ঞানিকদের সাধ্য নেই যে, তাঁরা এটম বম্ হাতে নিয়ে ভুবনময় দাবড়ে বেড়াবেন। এবং শেষ পর্যন্ত এটম বানানো হোক আর নাই হোক, ভালো কাজে লাগুক আর মন্দ কাজেই লাগুক, এটম বম্ তৈরি করার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক সত্য সূত্র আবিষ্কৃত হল সেটা সত্যই থেকে যাবে।

কিন্তু এগুলো হল আংশিক সত্য— বৈজ্ঞানিকের সন্ধানের আদর্শ। দার্শনিক সন্ধান করেন চরম সত্যের। সে সত্য কখনও কারও অমঙ্গল করতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, যাহা সত্য তাহাই শিব এবং তাহাই সুন্দর। এই তিনের চরম রূপ কখনই একে অন্যকে আঘাত করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের বেলা যে-রকম, দার্শনিক সত্যের বেলাও ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক, সমাজবিদ্ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন দার্শনিক-সত্যের কতখানি মানব-সমাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজাজি দার্শনিকদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, 'আধুনিক যুগের দার্শনিকগণের আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চিরসংশয়বাদী। এই সংশয় ধর্মবিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছে।' যদি বা এ মন্তব্য স্বীকার করে নিই, তবু আবার বলতে হবে, সংশয়বাদ ধর্মের আসন কেড়ে নেবে কি না সে কথা স্থির করবেন সমাজপতিরা। দার্শনিকেরা সত্য নিরূপণ করাটাই তাঁদের চরম স্বধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, সে নিরূপণ সমাজে কী স্থান নেবে, সে সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন। এককালে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সর্বকলা-শিল্প-ধর্মের সেবা করত। ছবি আঁকা হত দেবদেবীর, গান গাওয়া হত দেবদেবীর, নৃত্য করা হত দেবতার সামনে। আজ নন্দলাল দেবদেবীর ছবি আঁকেন, আবার খোয়াইডাঙারও ছবি আঁকেন (এবং নন্দলালও খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের ন্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন যে, লোকে তাঁর দেবদেবীর ছবিকে পূজা করছে কি না, তিনি সুন্দরের রূপ দিয়েই আনন্দিত), রবীন্দ্রনাথ রচেছেন শত শত বর্ষার গান, উদয়শঙ্করের আপন রচা সার্থক নৃত্যের

www.pathagar.com

বেশিরভাগ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাই বলে আজ কি কেউ এ অপবাদ দেয় যে, এঁদের কলাসৃষ্টি প্র্যাকটিকাল নয়, রবীন্দ্রনাথের গান 'একত্র গ্রথিত কতকগুলো কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই নয়,' উদয়শঙ্করের নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস!

মোদ্দা কথা এই, যাঁরা 'ধর্মপ্রাণ' তাঁরা এঁদের সৃষ্টিকর্ম, বৈজ্ঞানিকের তথ্য, দার্শনিকের সত্য, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।

কেন পারছেন না, এ প্রশ্ন যদি কেউ শুধায় তবে অপ্রিয় সত্য বলতে হবে, এবং আজ যখন অপ্রিয় সত্য দিয়েই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেছি তবে সেই আলাপই এখন তালে চলে আসুক। আসল কথা হচ্ছে এই, আজ যাঁরা 'হা ধর্ম হা ধর্ম' করেন, তাঁদের অধিকাংশই (রাজাজির কথা বলছিনে, তিনি সত্যই ধর্মপ্রাণ কি না সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোনও অভিজ্ঞতা নেই) ধর্মে একনিষ্ঠ নন। স্বধর্মে, সত্য ধর্মে, সনাতন ধর্মে যদি তাঁদের শ্রদ্ধা ঐকান্তিক এবং অবিচল হত তবে তাঁরা আজ দার্শনিককে, কাল বৈজ্ঞানিককে হিরণ্যকশিপু, হিরণাক্ষ্য নামে অভিহিত করতেন না।

কিন্তু আমি কে, আমার ছোট মুখে বড় কথা কেন?

অতএব, সে আপ্ত-বাক্য সন্ধান করে, এক ঋষির বচন উদ্ধৃত করে তাঁরই পশ্চাতে আশ্রয় নিই।

সে ঋষি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর মতো ধর্মনিষ্ঠ ঋষি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন অতি কম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এরকম ভগবৎপ্রেমিক আমি আমার জীবনে অল্পই দেখেছি।

তিনি লিখেছেন,

'একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি গায়কদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি— বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে— তিনি আর বেশি দিন টেকেন না! এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসি পায়, কান্নাও পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি তোমার এতই প্রিয়বস্তু, তবে তার পথ অবলম্বন কর— ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা তো আর তোমার হাত-পা বাঁধিয়া রাখে নাই; কোতোয়ালের প্রতি মহারানির (ভিক্টোরিয়া) এমন কোনও শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে, 'কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে।' বৈরাগ্য তো আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে! বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র, আর অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু— অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিশ ঘণ্টা সংসারকার্যে ষোল আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না— একটা কেরানিগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে দল বি এ, এম এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে।

www.pathagar.com

ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোনও কর্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচারণ করে না— তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্তব্য সাধনের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছু না— মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে, তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে— যখন যাহা কর্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্বাহ করা যাইতে পারে।' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নানা চিন্তা; সাধনা— প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* প্রবন্ধ, পৃ ১-২, বিশ্বভারতী)।

এই উদ্ধৃতিতে যেখানে যেখানে 'বৈরাগ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

লেসে ফ্যের

নৃতত্ত্ববিদের কৈলাস, কৈলাস পর্বতে নয়, তাঁদের স্বর্গ আসামের পর্বতে। এ কথা ভূ-ভারতের তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ্ উত্তমরূপে জানেন বলেই আসামে আসবার জন্য তাঁদের ছোঁকছোঁকের অন্ত ছিল না। কিন্তু ইংরেজ তখন আসামের ম্যানেজার, কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল ইংরেজি প্রবাদে যাকে বলে 'ডগ্ ইন দি মেঞ্জার' নয় 'ডগ অ্যান্ড দি ম্যানেজার'। ইংরেজ নিজে অনুন্নত পার্বত্য জাতির ভেতর বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করত না, অন্য উৎসাহী পণ্ডিতকেও তাদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

ইংরেজ কস্মিন্‌কালেও কোনও প্রকারে জ্ঞানচর্চা করেনি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য না। কিন্তু ওই কর্ম সে করেছে রাজ্যবিস্তার এবং আনুষঙ্গিক ধনার্জনের বহু পূর্বে। নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের যখন প্রচার এবং প্রসার হল, টাকার গরমিতে ইংরেজ তখন কোনও প্রভু হস্তীদেহ ভুঁড়িখানা ভারি গোছ হয়ে গিয়েছেন, মা-সরস্বতীর পেছনে আসামের বনে-বাদাড়ে ঘোড়ার মতো গত্তি আর তাঁর গায়ে নেই। যে দু চারখানা বই ইংরেজ আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়গুলো সম্বন্ধে লিখেছে সেগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা— নৃতত্ত্বের নব নব তত্ত্বাবিষ্কারের দৃষ্টি-বিন্দুর সন্ধান এ কেতাবগুলোতে পাবেন না।

কিন্তু জানা-অজানায় ইংরেজ এদের অনেকের সর্বনাশ করে দিয়ে গিয়েছে, এদের ভেতর মিশনারিদের ঘোরাঘুরি এবং বসবাস করতে দিয়ে।

খ্রিস্টধর্ম অতি উত্তম ধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কোনও ধর্ম থেকেই সে নিকৃষ্ট নয়। কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে খ্রিস্টের বাণী থেকে নব নব আদর্শের অনুপ্রেরণা পেয়েছে, খ্রিস্টের অনুকরণ করে বহু সাধুসন্ত ভগবানের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের দেখে সংশয়বাদীরা বলেছেন, ভগবান আছেন কি না জানিনে কিন্তু যদি থাকেন তবে তার স্বরূপ এঁদেরই মতো।

কিন্তু সেই মহান ধর্মপ্রচারের ভার যদি অজ্ঞের হাতে পড়ে তবে তার ফল বিষময় হয়। কারণ সে তখন খ্রিস্টের নামে যে বাণী প্রচার করে সে উচাটন শয়তানের।

www.pathagar.com

আসামের সব মিশনারি যে শয়তান ছিলেন, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু অজ্ঞের স্কন্ধে শয়তান ভর করে যে কী কুকর্ম করতে পারে সে তত্ত্ব হজরত মোহাম্মদ (দ.) জানতেন বলেই বলেছেন,

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।

যে মিশনারি এসে আসামের বনের ভেতর বাসা বাঁধল তার বাংলো দেখে আমরা দূরের থেকে মুগ্ধ হই। অনেকটা যেন—

'ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসু গাছের তলাটিতে,
পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই যে রেলের কাছে,
ইস্টেশনের বাবু থাকে,
আহা এরা কেমন সুখে আছে ॥'

টিলার উপর ফুটফুটে বাংলো, চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারি, ঝকঝকে তকতকে বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল সাজানো— মনে হয়, আহা, পাদরি কেমন সুখে আছে।

যাদের ভেতর পাদরি সাহেব খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তাদের তুলনায় তিনি আছেন অনেক সুখে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু বিলেতের যে কোনও মজুরের বাড়ি পাদরির বাসার চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক, মজুর পাদরি সাহেবের চেয়ে খায় ভালো এবং পাদরির সবচেয়ে দুঃখ যে তাকে আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহুদূরে অনাত্মীয়ের মাঝখানে। তাই রবীন্দ্রনাথ এদেরই একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন,

'আপনার জন আপনার দেশ
হয়েছি সর্বত্যাগী
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।
সুখসভ্যতা রমণীর প্রেম
বন্ধুর কোলাকুলি
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারিনে
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।

কিন্তু এটা হল পাদরির হৃদয়ের দিক। এবং বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পাদরি আপন দেশের তুলনায় যত দৈন্যেই থাকুক না কেন, এদেশের মধ্যবিত্ত সন্তানের চেয়েও তাদের আর্থিক অবস্থা ঢের ঢের ভালো এবং চাষাভুষোদের সঙ্গে এদের কোনও তুলনাই হয় না।

www.pathagar.com

কিন্তু পার্থক্যটা সবচেয়ে মারাত্মক হয় যখন পাদরি পার্বত্য অনুন্নত জাতির ভেতর গিয়ে বাংলো বাঁধে।

অনুন্নত জাতি বুঝতে পারে না যে, ক্রিশ্চান হয়ে গেলেই সে পাদরি সায়েবের বাংলো ভেট পেয়ে যাবে না। পাদরির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে পাদরির বাড়ি, ঘর-দোর, জামা-কাপড়, বাসন-কোসন, টেবিল-চেয়ার দেখে মুগ্ধ হয় এবং এইসব জিনিস যোগাড় করার জন্য তার সরল মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নাগা কিংবা লুসাইয়ের যা আমদানি তা দিয়ে এসব বস্তুর কল্পনাও সে করতে পারে না। ফলে তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

পাদরি সায়েবেরা এই সর্বনাশটি করেছেন অনুন্নত জাতিদের। চোখের সামনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ছিমছাম স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিংটি তুলে ধরেছেন, সে স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছনোর ক্ষমতা নাগা কিংবা লুসাইয়ের কস্মিনকালেও হবে না— দ্বন্দ্ব তার লেগেই থাকবে।

অন্য বাবদে এইসব অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ইংরেজের নীতি ছিল 'লেসে ফ্যের' অর্থাৎ তাদের জীবনধারণ পদ্ধতিতে কোনও প্রকার পরিবর্তন না আনা, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র নাগাদের বাদ দিয়ে আর সব অনুন্নত সম্প্রদায়কে যত কম খাটানো যায় ততই মঙ্গল। তার কারণ এদের অনেকেই এমন শান্ত সরল ও নির্দ্বন্দ্ব জীবন-যাপন করে যে, আমাদের 'সভ্যতা', তাদের জীবনে নতুন কিছু তো আনবেই না, বরঞ্চ নানা প্রকারে দৈন্য দুর্দশা সৃষ্টি করবে। অন্তত একজন অতিশয় জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিতুল্য ভারতীয়কেও আমি এই মত পোষণ করতে দেখেছি। প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয় সাঁওতালদের সঙ্গে গত শতকের শেষের দিকে। তখনও বোলপুর অঞ্চলে ধান-কল হয়নি, সেখানকার কৃত্রিম জীবন তখনও সাঁওতালদের চরিত্র নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সরল অনাড়ম্বর সাঁওতালদের জীবনধারণ-পদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন এবং আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এদের জীবনে আমরা যেন হস্তক্ষেপ না করি। এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাঁওতালরা যে অহেতুক ভূতপ্রেতকে ডরায়, সেটা সারাবার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা এদের ভেতর প্রচার করলে ভালো হয়। সে ধারণা প্রচার করার কতটুকু প্রয়োজন, গুণীরা তার বিচার করবেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম উপদেশ আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছি।

আমি জানি, এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে। যাঁরা শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাস করেন, মড়ক এবং অন্যান্য ব্যাধি যাঁরা নির্মূল করতে চান, তাঁরা হয়তো সহজে আমাদের 'লেসে ফ্যের' পন্থা মেনে নেবেন না। উত্তরে আমার নিবেদন, এইসব অনুন্নত জাতির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও এত কম যে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন, এদের সম্বন্ধে আরও অনেক অনুসন্ধান করার পর বিস্তর ভেবে-চিন্তে কাজ আরম্ভ করতে হবে— অবশ্য ততদিন বেঁচে থাকলে আমি এখনও আপত্তি জানাব। কারণ ধর্মের মিশনারি আর 'সভ্যতার' মিশনারিদের ভেতর আমি পার্থক্য দেখতে পাই অতি কম।

www.pathagar.com

মার্কিনি তাত

মার্কিনিরা হন্যে হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কম্যুনিস্ট-জুজু দেখে। দেশে যেরকম ছেলে-ধরার জুজু দেখা দিলে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাকে তাকে ধরে বেধড়ক মার লাগায়, অনেকটা সেই রকমই। তফাত এই যে, এদের কর্তাব্যক্তিরা এরকম মারধর থেকে দূরে থাকেন, আর যতখানি পারেন জুজুর ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করেন। মার্কিন মুলুকে কিন্তু কম্যুনিস্ট-ডাইনি পোড়ানোর ভারটা আপন হাতে তুলে নিয়েছেন এই দেশের কর্তাব্যক্তিরা।

তা তারা আপন দেশে যা খুশি করুন, আমরা রা-টি কাড়ব না। আমরা বলি—

'হরি হে রাজা কর রাজা কর
যার ধারি তারে মার
যার ধারি দু চারখানা
তারে কর দিন-কানা
যার ধারি দু শ চার শ
তারে কর নির্বংশ
যে আমার আধলা ধারে
ব্যাটা যেন দিয়ে মরে!

কম্যুনিস্টরা আমাকে কিছুই ধারে না, তারা এখন মরুক তখন মরুক আমার কিছুটি যায়-আসে না।

কিন্তু মার্কিনরা যখন এদেশে এসে দাবড়াতে থাকে, তখন আমি বিদ্রোহ করি। ভারতবর্ষের যত্রতত্র আজকাল দেখতে পাবেন মার্কিন অধ্যাপক অমুক তার তমুক 'গণতন্ত্র', 'নবীন জীবনপদ্ধতি', 'দর্শনের নব সূত্রপাত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওগুলো হচ্ছে মুখোশ— যে কোনও বক্তৃতায় যান, দেখতে পাবেন তিন মিনিট যেতে-না-যেতেই, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাশিল্পের বাহানা ধরে তাঁরা ঠিক পৌঁছে গেছেন আসল মোকামে, 'এস ভাই ভারতীয়, তোমরা-আমরা সবাই মিলে রুশকে ঘায়েল করি।'

ইংরেজিতে একেই বলে 'ওয়ার মঙ্গারিং', বাংলায় বলে, 'তাতানো', 'ওসকানো', 'খ্যাপানো'।

ধর্মসাক্ষী, স্বেচ্ছায় যাইনি। অকালে বৃষ্টি নেমেছিল, আশ্রয়ের সন্ধানে বারান্দায় উঠেছিলুম। যজ্ঞির জজমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণে নয়, পঞ্চাশি আইনে পড়ে না। বক্তৃতার সারাংশ পূর্বেই নিবেদন করেছি। অবাক মানলুম দেশের লোক এই 'তাতানো'টা ধরতে পারল না। যে রকমভাবে তাবৎ বক্তৃতাটা গলাধঃকরণ করে মিষ্টি মিষ্টি প্রশ্ন শুধাল, তার থেকে মনে হল তারা যেন আরও মণ্ডাটা মিঠাইটা চাইছে।

থাকতে না পেরে শুধালুম, 'সায়েব, তোমার আসল মতলব, আমরা যেন তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে বলশিদের সঙ্গে লড়ি— নয় কি? ঠিক বুঝেছি তো?'

সায়েব একগাল হেসে আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন। আমি শুধালুম, 'বলশিদের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হয় না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অসম্ভব নয়"। তাই তিনি কোনও দলেই ভিড়ছেন না।'

www.pathagar.com

সায়েব বললেন, 'রুশরা চলে যাক চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, পোল্যান্ড ছেড়ে। তারা কীরকম সেখানে রাজত্ব চালাচ্ছে জান? সেখানে তারা সর্বপ্রকার স্বাধীনতার টুটি চেপে তার দম বন্ধ করে মারছে, জান সে কথা? এবার আমি পাল্টা একগাল হেসে বললুম, বিলক্ষণ জানি সায়েব। কিন্তু বল তো, তোমারই রুজভেল্ট আর চার্চিল যখন ইয়ালটা, তেহরান, পৎসদামে এসব দেশ রুশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন কি তাঁরা এত গবেট ছিলেন যে জানতেন না, রুশ সেখানে কোন ধরনের রাজত্ব কায়েম করবে? তোমারই মার্কিন জাত, ইংরেজ আর ফরাসি বেরাদর পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছেন, না নিজেদের প্যাটার্ন? তা নয় সায়েব, রুজভেল্ট-চার্চিল বিলক্ষণ জানতেন রুশ-নাগর বলকান-সুন্দরীকে নিয়ে কোন রঙ্গরস করবেন। কিংবা বলতে পারি, শেয়ালকে যদি দাওয়াত করে মুরগির খাঁচায় ঢোকাও, তবে সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভালো।'

সায়েবের মুখ সেদ্ধ-হ্যামবর্ণ; সেটা লিপস্টিক হল কি না বুঝতে পারলুম না— চোখে চশমা ছিল না। তবে কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল। বললেন, 'তোমরা গণতন্ত্র মানো। বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের বিপদে তোমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে?'

বললুম, 'তাতে করে তো আমরা মার্কিনেরই অনুসরণ করব। ভুলে গেছ, ১৯৩৪ সালে লয়েড জর্জ যখন তোমাদের দরজায় ধরনা দিয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বাঁচাও, তখন তোমরা সাড়া দিয়েছিলে? না বলেছিলে, "ও ইয়োরোপের ঘরোয়া ব্যাপার"। শেষটায় ঢুকেও বেরিয়ে পড়লে। লীগ অব নেশন্‌সে যোগ তো দিলেই না, উল্টো তার খয়ের খাঁ উইলসনকে তাড়ালে। তার পর ১৯৩৯ সালে যখন চেম্বারলেন-চার্চিল একই কান্না কাঁদলেন, ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও, তখনও কি পত্রপাঠ লম্ফিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে? না পার্লহারবারের আঁতে যখন ঘা পড়ল, তখন "গণতন্ত্র বাঁচাবার" টনক নড়ল? এখন দেখছ রুশ বড্ড বেশি তাগড়া হয়ে উঠেছে, তাতেই এত শিরঃপীড়া। সে কথা থাক। কিন্তু এ কথাও মানবে যে, আজ যদি আমরা কোনও পক্ষে যোগ না দিই, তবে সে শুধু তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মতো হবে। ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন, জাপান লড়াই করে মরল, তাই আজ তোমরা পয়লা নম্বর। এবার তোমরা আর রুশরা মারামারি করে দুর্বল হও তখন আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব।'

কথাটা সায়েবের বড্ড টক লাগল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু এই যে লড়াইয়ের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তার থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারবে কি?'

আমি বললুম, 'সে হচ্ছে অন্য কাহিনী। দুর্ভিক্ষের সময় বাঙালি ডাস্টবিন থেকে ভাত কুড়িয়ে খেয়েছে তাই বলে ওটা তার কর্তব্য একথা তো কেউ বলতে যাবে না। লড়াই এড়াতে পারব না, তাই তৈরি হয়ে জেতার পক্ষ নিই, সে হচ্ছে এক কথা; আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহালতবিয়তে "কর্তব্যবোধে" "গণতন্ত্র বাঁচাতে" যোগ দিই, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমাদের সে বোধটা হচ্ছে না।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। দেশ তো আমি চালাইনে। কেটে পড়লুম।

কিন্তু প্রশ্ন, এই যে হরেকরকম চিড়িয়া নানারকম মুখোশ পরে এদেশে এসে 'ওয়ার-মঙ্গারিং' করে তার কি কোনও দাওয়াই নেই??

www.pathagar.com

বাঙালি মেনু

বয়স হয়েছে, যখন খুশি রেস্তোরাঁয় ঢুকে মমলেট-কটলেট হুকুম দিতে লজ্জা করে। আর যখন বয়স হয়নি তখন জেবে সিঙ্গিল চায়েরও রেস্ত থাকত না বলে রেস্তোরাঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।

ভগবান দয়াময়। তিনি সবকিছুই দেন, কিন্তু তাঁর 'টাইমিং'টা বড্ডই খারাপ। বৃদ্ধকে দেন তরুণী ভার্যা এবং হোটেলে যাবার পয়সা। উনিশ শতকের নাটক-নবেলে একেই বলা হত 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস'।

অসময়ে বৃষ্টি। ট্রাম থেকে নেমেই রেস্তোরাঁতে ঢুকতে হল। বহুকাল পরে কলকাতা ফিরেছিও বটে— পুরনো যাবতীয় প্রতিষ্ঠান আগেরই মতো চালু আছে কি না দেখার বাসনাটাও রয়েছে।

একখানা আলুর চপ আর এক কপ্ চা।

শুনেছি সায়েবরা মাস্টার্ড খান শুধু শূকর এবং আরেকটা নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে। মুর্গি, মটন, মাছের সঙ্গে তাঁরা রাই খান না। মুর্গি, মটনের সঙ্গে নাই-বা খেলেন, কিন্তু মাছের সঙ্গে সরষে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের মিল— এ তত্ত্বটা সায়েবরা এদেশে দু শ বছর থেকেও শিখল না দেখে তাজ্জব মানতে হয়।

তা সে যা-ই হোক, আমি সরষে খাই সব জিনিসের সঙ্গে— এই নিতান্ত সন্দেশ-রসগোল্লা ছাড়া। তাই আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ছোকরাকে বললুম, 'সরষেটা ভালো না।'

ম্যানেজার শুনতে পেয়ে বললে, 'হক্ কথা বলেছেন, স্যার, কিন্তু বিলিতি মাস্টার্ডের ওপর সরকার ট্যাক্সো যা লাগিয়েছেন তার ঝাঁঝটা মাস্টার্ডের চেয়েও বেশি।'

আমি বললুম, 'তবে নাকচ করে দিন বিলিতি মাস্টার্ড; চালান দেশের তৈরি খাঁটি প্লেন কাসুন্দি। খরচাও কম পড়বে।'

ম্যানেজার আমার দিকে হাবার মতো তাকালে। বোধ হয় ভাবলে, আমি নিতান্তই গাঁইয়া। তা আমি বটিও।

দিশি-বিলিতি কোনও মাস্টার্ডই কাসুন্দির সামনে দাঁড়াতে পারে না। কাসুন্দিতে থাকে মিঠে-কড়া, মোলায়েম-মোলায়েম ঝাঁজ— আর বিলিতি মাস্টার্ডের ঝাঁজ চাষাড়ে, ফরাসি মাস্টার্ডে বদ্‌খদ্ মিষ্টি-মিষ্টি ভাব।

যবে থেকে আমার পাশের বাড়িতে এক দার্শনিক এসে উঠেছেন, পাড়ার আমাদের সক্কলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে। আমরা এখন আর তথ্য নিয়ে তর্ক করিনে, তত্ত্ব কারে কয় তারই চিন্তা করি। আমি তাই কাসুন্দির খেই ধরে তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশ করলুম। আমরা আপন জিনিসের সম্মান দিতে জানিনে। হিন্দিতে যাকে বলে 'ঘরকি মুর্গি দাল বরাবর' অর্থাৎ 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'।

তখন মনে পড়ে গেল, গেল লড়াইয়ের সময় আমাকে এক মার্কিন অফিসার আফ্‌সোস করে বলেছিল, কলকাতায় বাঙালি-রান্না খাবার রেস্তোরাঁ নেই। তাকে এক বাঙালি নিমন্ত্রণ করে ডাল-চচ্চড়ি খাইয়েছিল, সেই থেকে বেচারি তামাম কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বাঙালি

www.pathagar.com

রান্নার সন্ধানে, আর পেয়েছে শুধু মমলেট-কটলেট-ডেভিল কিংবা কোর্মা-পোলাও-কালিয়া। সে চেয়েছে এক ঘটি জল, পেয়েছে তিনখানা বেল।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'অমা যামিনীর অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান।' কলকাতায় বাঙালি রান্নার রেস্তোরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়— কলকাতায় প্রথম আশ্চর্য!

অথচ দেখুন ইংরেজি (কিংবা ট্যাঁশ বলতে পারেন), মোগলাই, চীনা, মাদ্রাজি, গুজরাতি ('অন্নপূর্ণা' দ্রষ্টব্য— খাওয়া না-খাওয়ার জিম্মেদার আপনি) বহু রকমের রান্নাই এই কলকাতায় পাবেন। রোস্ট কবাব চপ্ সুয়েজ ইডলিডোসে করহি, ফরাসি এস্‌কেলোপ দ্য ভো ও শাতোব্রিয়া, এমনকি ভিয়েনার ভিনার শ্নিংসেল পর্যন্ত পাবেন। পাবেন না শুধু ঘ্যাঁট, অম্বল।

তাই ভাবছি, আপনাতে-আমাতে একটা বাঙালি রেস্তোরাঁ খুললে হয় না?

বাঙালি সর্বভুক। তাই বাঙালি প্রবাদ 'লোহা খাইনে শক্ত বলে, "—" খাইনে গন্ধ বলে।' তাই বলে কি আমাদের রেস্তোরাঁয় সবকিছু থাকবে? উঁহু! আমাদের মাপকাঠি হবে— বাড়িতে আমাদের মা-মাসীরা আটপৌরে এবং পোশাকি যেসব রান্না করেন।

তা হলে এইবারে 'মেনু'টা তৈরি করা যাক।

কিন্তু তার পূর্বেই স্থির করতে হয়, খেতে দেবেন কিসে?

আমি মনস্থির করেছি— কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরের থালারও ব্যবস্থা থাকবে; নিতান্ত সাত্ত্বিক জনের জন্য শালপাতা, কলা-পাতার ব্যবস্থাও থাকবে। সব কটা থাক্ আর নাই থাক্— চীনে বাসন ছুরি-কাঁটা বারণ।

এখন আহারাদি।

১। ভাত— আতপ এবং সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকরখানি (বাদ দিলে চলবে না, পুব-বাঙলার বিস্তর লোক কলকাতায় আস্তানা গেড়েছেন), ঘি-ভাত, পোলাও। কিছু বাদ পড়ল না তো? ভেবে দেখুন। এ 'মেনু' তৈরি করা তো একজনের কর্ম নয়। আমি শুধু একটা পয়লা খসড়া করে দিচ্ছি।

এ-স্থলে আরেকটি তত্ত্ব খুলে কই। রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয়: তাই কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে— অর্থাৎ প্যারিসকে, কারণ রেস্তোরাঁ-লোকের বৈকুণ্ঠ প্যারিসে। তাই 'মেনু' বানাবার পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পদ ফরাসি কায়দাতেই যুক্তিসম্মত এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ। ফরাসি 'মেনু' আরম্ভ হয় হরেক রকম রুটির বর্ণনা দিয়ে (আমিও তাই ভাত-লুচি-পোলাও দিয়ে বিসমিল্লা পড়েছি), তার পর অর দ্য অভ্র, সুপ্, ডিম, ফিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব—

২। তেতো :—

উচ্ছেভাজা, করেলাসেদ্ধ, নালতে শাক (ইন সিজন— মৌসুমি কালে)। এইবারে ভাবুন, কিংবা মা-মাসীকে জিগ্যেস করুন, আর কী কী তেতো আছে— আমার দুর্ভাগ্য, যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে, তেতোটার খোলতাই নেই। পশ্চিমাঞ্চলে স্টাফ্‌ট—অর্থাৎ মাংসের পুর দেওয়া-করেলা খায়, কিন্তু বিবেচনা করি তার রেওয়াজ বাঙলা দেশে নেই।

www.pathagar.com

৩। ডাল :—

মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। তার পর ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা, কেউ বা দু চারটে বড়ি দেয়। অতএব ডালের দু ভাগ— প্লেন এবং মেশানো, যেমন পূর্বেই বলেছি ডাল আ লা ডাঁটা; কিংবা আ লা নারকেল অর্থাৎ ডালে নারকেলের টুকরো থাকবে।

৪। ভাজা :—

নিয়ে কিন্তু বিপদ। কারণ এতক্ষণ দিব্যি নিরামিষ চলছিল, এখন ভাজা নিরামিষ, আমিষ, ডিম তিন প্রকারই হতে পারে।

অতএব

(ক) আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো...

(খ) ডিমভাজা, মমলেট...

(গ) মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুঁটি, পোনা ...)

কাজেই খ এবং গ-কে হয়তো 'ডিম' এবং 'মাছের অনুচ্ছেদ' পুনরাবৃত্তি করতে হবে। 'ক্রস রেফেরেন্স' দিতে পারেন, কিন্তু ভয়, তা হলে 'মেনু' হয়তো জর্মন ডক্টরেট্ থিসিসের প্রকার এবং আকার নিয়ে নেবে। উপস্থিত অবশ্য আমি সেই নিষ্ঠা নিয়েই এই মহামূল্যবান নির্ঘণ্ট নির্মাণের প্রয়াসী হচ্ছি, কিন্তু তৈরি মালে তো ও-জিনিস ওতরালে চলবে না।

৫। ছেচকি— ছোঁকা— ছক্ক— চচ্চড়ি— লাবড়া (লাফড়া)।

এইবারে আমার পেটের এলেম বেরিয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে একটা আরেকটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমি জানিনে। যদিও খাবার সময় রাঁধুনিকে অপটু ঠাওরালে এ-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিতে কসুর করিনে। আর পাঁচজন কান পেতে শোনে, কারণ তারা জানে আমার চেয়েও কম। দু একবার যে কানমলা খাইনি তাও নয়। সে কথা যাক। এখন প্রশ্ন, এ-অনুচ্ছেদের মূল হেডিং নেবেন কী এবং তার পদ বাতলাবেন কী কী?

করে করে আসবেন, মাছ মাংস— তার কত অনুচ্ছেদ, তস্য ছেদ, পদ, পদ-ভেদ—ডালনা, ঝোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে, ডাবের ভিতর, কলাপাতায় পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে— খোদায় মালুম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

তাই আমার প্রস্তাব : একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিন এবং রেস্তোরাঁর মেনুর কায়দায় একখানা বাঙালি মেনু তৈরি করুন দু পাতা জুড়ে, অর্থাৎ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ভাঁজ খুলে যতটা জায়গা পান। এর বেশি কাগজ নিতে পারবেন না, কারণ পূর্বেই বলেছি মেনু থিসিস নয়। আবার শিটখানা যেন টায়-টায় ভর্তি হয়। ফাঁক থাকলে চলবে না। আমি যে পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ দিয়ে প্যাটার্ন বাতলালুম সেটা একদম অবজ্ঞা করে আপনি আপন মেনু বানাবেন। কোন্ জিনিসের কত দাম সেটা আপনি বলতে পারেন, না-ও পারেন। না-বলাই ভালো। কারণ 'কস্‌টিং' ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। রেস্তোরাঁ-ম্যানেজার অভিজ্ঞতা থেকে সেটা স্থির করবেন।

'একস্ট্রা' অনুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে, পুদিনা...), আচার (আম, জারক নেবু...) ইত্যাদি এবং কাসুন্দি।

যে-কাসুন্দি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলুম।

এইবারে বিবেচনা করুন ॥

www.pathagar.com

রন্ধন-যজ্ঞ

খবর এসেছে লন্ডনে এক বিরাট রন্ধন-যজ্ঞ হবে। সে-যজ্ঞে পৃথিবীর আঠারোটি দেশ আপন আপন সুস্বাদু রান্না পেশ করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হায়, আমাকে বিচারকর্তা করে ডেকে পাঠাচ্ছে না কেন? রন্ধন-মার্গে সত্যের সন্ধানে আমি বিস্তর ইন্ধন পুড়িয়েছি, আকাশের অ্যারোপ্লেন, মাটির ট্রেন আর জলের জাহাজ— এই তিন সচল বস্তু ভিন্ন আর সবই তো আমি খেয়ে দেখেছি। তা-ও আবার দেশি-বিদেশি নানা কায়দায়। জর্মন কায়দায় রান্না ভারতীয় 'রাইস-কারি' (অতিশয় অখাদ্য) খেয়েছি, শিখের বানানো বাঙালি লেডিকেনি খেয়েছি (সের্ফ পেল্লাদ-মারা গুলি— প্রহ্লাদকে খাইয়ে দিলে হিরণ্যকশিপুকে আর ভাবতে হত না), আরব বেদুইনের হাতে 'পাকানো' দিল্লির বিরিয়ানি খেয়েছি, জাপানির স্বহস্তে তৈরি চেঙ্গিসখানি কাবাব ভি খেয়েছি (এর নির্মাণকৌশল একদিন সবিস্তর নিবেদন করব— আহা, অতি খাসা জিনিস), আর কত বলব!

তা সে-কথা যাক গে, সে নিয়ে দুঃখ করে কোনও লাভ নেই, গুণীর আদর কি আর এ মূঢ় সংসার করেছে কিংবা করবে?

লন্ডন থেকে আরও খবর এসেছে, ভারতীয় 'টিম' চলবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বসু এবং শ্রীমতী রায়ের কর্তৃত্বে। তিনজনই বাঙালি, কাজেই বাঙালি হিসেবে, হে পাঠক, তোমার-আমার দু জনেরই মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হল, এ-কথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যেবাদী হতে যাব কেন? কে না জানে, আজ বাঙালি সর্বত্র অনাদৃত, কেন্দ্রীয় সরকার তাকে উপেক্ষা করে, বিদেশে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি শনৈঃ শনৈঃ কমে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞের পাল-পরবে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে সে প্রায় ব্রাত্য— অপাঙ্‌ক্তেয় হতে চলল। এরই মধ্যিখানে যদি বিশ্ব-রন্ধন-যজ্ঞে তিন বঙ্গরমণী ভারতের প্রতিভূ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, তবে কোন্ বাঙালির ছাতি তিন ফুট ফুলে উঠবে না?

কিন্তু আমার নিবেদন, গর্ব অনুভব করেছি বটে কিন্তু আনন্দিত হইনি।

আমি বাঙালি, আমি এই 'দেহলিপ্রান্তে' বসেও বাঙালি-রান্না খাই। আমি আতপ চালের ভাত, কিঞ্চিৎ ঘৃত, সোনা মুগের ডাল (দিল্লিতে অতিশয় নিকৃষ্ট), সর্ষে বাটায় মাছের ঝাল ইত্যাদি খেয়ে থাকি। বাঙালির অন্যান্য রান্না নিয়েও আবার দম্ভের অন্ত নেই, কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় রান্নার কেরদানি দেখাতে হয় তবে শুধু বাঙালি হেঁশেল দেখালেই চলবে না।

হ্যাঁ, আলবত, অতি অবশ্য আমি স্বীকার করি, বাঙালির সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালি বিধবার নিরামিষ (বিশেষ করে 'বোষ্টমের পাঁঠা' এঁচোড়), জলখাবারের লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, মাছের ডিমের বড়া, মোচার পুর দেওয়া সমোসা ইত্যাদি, তার পর ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই, মিহিদানা-সীতাভোগ আরও কত কী! (মুদ্রাকর মহাশয়, আপনার জিভে জল আসছে, অথচ এ-লেখা কম্পোজ না করে আপনার বাইরে যাবার উপায় নেই, তদুপরি আজকের দিনে আপনি-আমি কেউই এসব সুস্বাদু বস্তু চাখবার সামর্থ্য রাখিনে, অতএব অপরাধ নেবেন না।) এমনকি, আমাদের উচ্ছেভাজা, আমের অম্বল, কিসমিস-টমাটোর টক (প্রধানত বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের) নগণ্য জিনিস নয়, ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন।

www.pathagar.com

আর পিঠে—তার ফিরিস্তি আর দেব না।

কিংবা যাকে বলে 'ফেনসি-খানা' বিশেষ জেলা বা মহকুমার আপন বৈশিষ্ট্য। বাইরের—এমনকি, বাঙলা দেশের ভেতরের লোকই যেগুলো জানে না, যেমন মনে করুন ব্যাঙের ছাতা, ইংরেজিতে যাকে বলে মাশরুম, মেদিনীপুর এ-বস্তুর পাক্কা কদরদার, ভোজনরাজ ফরাসিও এর নামে অজ্ঞান, কিংবা পুব-সিলেটের 'চোঙা-পিঠে' (একরকম হাল্কা বাঁশের চোঙায় ভেজা চাল ভরে দিয়ে সে-চোঙা খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝলসানো হয়, তার পর চোঙা ভেঙে ফেললে একখানা আস্ত লম্বা টুকরো বেরিয়ে আসে—এক ফুট লম্বা; খেতে হয় শুকনো মালাই কিংবা করকরে কইমাছ ভাজার সঙ্গে), কত বলব!

শুঁটকি? নাক সিটকাচ্ছেন তো? কিন্তু আমার বিশ্বাস শুঁটকির আপন মূল্য আছে। ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন সব ভোজন-রসিকজনই 'স্মোকড্-ফিস' অর্থাৎ শুঁটকির কদর জানেন।

আরও কত কী!

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, বাঙালি মাছ, নিরামিষ, পিঠে, সন্দেশ সুচারুরূপে তৈরি করতে জানলেও সে পারে না— এবং একদম পারে না মাংস রাঁধতে।

বাঙালি-বাড়িতে মাংস খেতে গেলে আমার চোখে জল আসে। মাংস আর ঝোল নন্-কো-অপারেশন করে বসে আছেন— এদিকে শক্ত মাংস ওদিকে টলটলে ঝোল। মাংসের নিতান্ত আপন 'সোওয়াদ' আছে বলেই খাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অখাদ্য।

কিংবা মাংস-চালে মিশিয়ে বিরিয়ানি পোলাও বাঙালি রাঁধতে জানে না (বাঙালির উপাদেয় ঘি-ভাত, মটরশুঁটি-ঘি-ভাত অন্য জিনিস) অথবা মাংসে-তরকারিতে মিলিয়ে আলু-গোশ্‌ৎ, মটর-গোশ্‌ৎ, গোবি (কপি)-গোশ্‌ৎ বাঙালি বিলকুল চেনে না।

একেবারে কেউই পারে না—একথা আমি বলব না। ঢাকার নবাববাড়ি, সিলেটের কাজীবাড়ি এবং মজুমদার-বাড়ি (শুনেছি—খাইনি), মুর্শিদাবাদের ও মাটিয়াবুরুজের নবাববাড়ি এসব বস্তু সত্যই ভালো রাঁধেন। আর পারে উত্তম মুর্গি-ঝোল রাঁধতে গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর জাহাজের খালাসিরা; যে একবার খেয়েছে, সে কখনও ভুলতে পারে না।

কিন্তু এসব মাংস-রান্না বড়ই সীমাবদ্ধ, বাঙলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, বিক্রমপুরের মেয়ে প্রতি বৎসর গোয়ালন্দি জাহাজে করে কলকাতা-হস্টেলে যায়, যাবার সময় জাহাজে 'রাইস-কারি' খায়, সে রাঁধতে-বাড়তেও জানে, কিন্তু জাহাজের ওই মুর্গি-ঝোল সে কখনও রাঁধতে পারল না!

মাত্র একটি বাঙালি কাপালিককে আমি চিনি, যিনি সত্যই মাংস রাঁধতে জানতেন। পাঁঠার মাংস কষে তিনি পেঁয়াজ-রশুন-লঙ্কা দিয়ে যে অপূর্ব, না অভূতপূর্ব 'মহাপ্রসাদ' রাঁধতেন তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো সুখাদ্য আমি এ জীবনে কখনও খাইনি। কিন্তু তিনি ব্যত্যয়। তিনি এখন সেই লোকে, বিবেচনা করি, যেখানে আহারাদির কোনও ঝামেলা নেই, তাই আমাদের শহরে এখন আর কেউ 'মহাপ্রসাদে'র সন্ধান পায় না। আমার মতো দু একজন এখনও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর স্মরণে চোখের জল ফেলে।

অথচ দেখুন, পশ্চিম-ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়। নানা রকমের সুরুয়া (সুপ্), শিক-শামি-টিকিয়া-বুড়ি-আফগানি-মিশ্রি-নরগিস কত রকমের কাবাব, ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, গুর্দা, কলিজা, তন্দুরিমুর্গি, মুর্গিমুসল্লম,

www.pathagar.com

মুর্গিশাহি, রওগন যুষ, তার পর মাংসে-তরকারিতে মেশানো আলু-গোশ্‌ৎ, গোবি-গোশ্‌ৎ, দইয়ে মাংস-মাখানো রায়তা-গোশ্‌ৎ, মাংস কুচি কুচি করে কোফতা, কিমা এবং তার থেকে কোফতা ঝোল, কিমা-ঝোল, বাহান্ন রকমের সমোসা, এবং আরও কত কী।

এককথায় আমরা বাঙালি যে-রকম মাছ দিয়ে পঁয়ষট্টি রকমের ভেল্কিবাজি দেখাই, এরাও তেমনি মাংস দিয়ে নিপুণ বোল চিকন কাজ দেখাতে জানে।

আমার মনে সন্দেহ জাগছে বাঙালি রমণীরা লন্ডনে এসব রান্না রাঁধবেন কী করে?

কিংবা পার্সিদের ধনে-শাক? উপাদেয় বস্তু।

মাছের রাজা আমরা, কিন্তু ভৃগুকচ্ছ পার্সিদের রান্না ইলিশ-মশলাও তো ফেলনা নয়। মাছটিকে ঠিক মধ্যিখানে লম্বালম্বি কেটে ফাঁকা জায়গাটা সবুজ পেশা মশলা দিয়ে ভরে গোটা মাছটাকে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে সেঁকা হয়। তিনখানা আড়াই-সেরি আস্ত ইলিশ খেয়েও আপনার পেটের অসুখ করবে না, এর বাড়া কী প্রশংসা আছে বলুন?

গুজরাতিদের পতৌড়ি। ঘোলের ভিতর বেসন ভিজিয়ে রাখবেন রাত্রিবেলা। সকালে তাই দিয়ে চাপাটির মতো পাতলা রুটি বানাবেন, তেলে ভেজে নিয়ে ফালি ফালি করে কেটে 'রোল অপ' করে নেবেন। মুখে দিলে মাখনের মতো মিলিয়ে যাবে। নিরামিষের ভিতর এ-রকম মুখরোচক বস্তু এ-ভারতে কমই আছে। মিষ্টির ভিতর শ্রীখণ্ড এবং দুধ-পাক।

মারাঠিদের দহি-ভাত। বেহারিদের আচার। তামিলদের মালে-গাটানি সুপ, রসম, ইডলি-ডোসে। কাশ্মীরিদের বসন্তঋতুর বাচ্চা ভেড়ার কাবাব। পাঞ্জাবিদের হালুয়া, লস্‌সি; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য 'অবদান'!

ক্রিকেট-টিমে আর রন্ধন-টিমে কোনও তফাত নেই। ক্রিকেটে এগারো জন নাইডু পাঠানো হয় না—তা তিনি যত ভালো ব্যাট্‌স্‌ম্যানই হোন না কেন। ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুগলি বোলার, উত্তম উইকেট কিপার, এমনকি, না-ব্যাট্‌স্‌ম্যান না-বোলার শুধুমাত্র ফিল্ডার (যথা ভাইয়া) দু একজন রাখতে হয়।

অতএব এই রন্ধন-যজ্ঞে ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে বহুতর ভীমসেনকে পাঠাতে হবে।

'বাঁশবনে—'

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত 'গুর্মে' অর্থাৎ 'খুশখানেওলা' বা ভোজনরসিক একবার তুর্কিতে বেড়াতে যান। ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদিনা যেরকম প্যারিস, এশিয়া-আফ্রিকায় সেইরকম তুর্কি। অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কি নয়—দিল্লি, লখনউ, আগ্রা। কিন্তু সে-কথা থাক্।

প্যারিস গুর্মের কন্‌স্‌তুন্‌তুনিয়া (কন্‌স্টানটিনোপোল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন-রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশিদিন লাগল না। তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ওই মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্য আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি

www.pathagar.com

প্যারিসের গুর্মেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনেনি, তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজি আছি।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওনা দিলেন। তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে—তিনি তো আর সিন্‌সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্‌স্তুন্‌তুনিয়া আসেননি।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, 'কী রকম খেলে?'

তিনি বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও খাইনি। তুর্কি গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষলাভ করেছে।'

একপ্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু...'

সবাই বললে, 'কিন্তু...?'

'পদ ছিল বড্ড বেশি।'

ভোজন-মার্গে যাঁরা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ কখন বলে, 'ওহ্, যা খাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের—'

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভালো রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা-সন্দেশে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, 'রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল', তবে শুধাই : সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনাকালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, 'রুচি-মাফিক তোমার বিশেষণটা বেছে নাও' কিংবা চিত্রকর হনুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের ন্যাজ এঁকে দিয়ে বলেন, 'পছন্দসই তোমার ন্যাজটা বেছে নাও।'

কাগজে পড়েছি ডাচেস অব উইনজার কখনও সুপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকি পদ মানুষ ভালো করে খাবে কী করে? অতিশয় হক্ কথা। আমার ভালো পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করিনে। যদিস্যাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই (শেরির গেলাস ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোঁটা 'মাগ্‌গি'—তদভাবে উস্টাস সস্+চার ফোঁটা তাবাস্কো সস্—তদভাবে চীনা চিলি সস্—তদভাবে একটি চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো+প্রয়োজনীয় নুন। এসব ভালো করে মিশিয়ে খুশবায়ের জন্য উপরে অতি সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন); এটা খাদ্য নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।

তবে রেস্তোরাঁর কথা আলাদা। কারণ রেস্তোরাঁয় তাবৎ চৌষট্টি পদ খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্কিপ্ করতে থাকলে গৃহস্বামী তথা অন্য নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব্। রেস্তোরাঁয় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভালো রেস্তোরাঁতে আ লা কার্তের বাহান্ন পদ থাকার পরও গোটা তিনেক তাব্‌ল দোৎ (tuble d'hote) বা ফিক্‌স্‌ড্ দামে ফিক্‌স্‌ড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করুন দু টাকাতে আছে (১) সেলেরি সুপ, (২) রোস্ট মাটন, (৩) পুডিং; আড়াই টাকাতে (১) সেলেরি সুপ,

www.pathagar.com

(২) বয়েল্‌ড ফিশ, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং; এবং তিন টাকাতে আছে (১) সেলেরি সুপ, (২) বয়েল্‌ড ফিশ্‌, (৩) রোস্ট চিকেন্‌, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রিম।

এই তাব্‌ল দোৎ বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ডোমকে বাঁশ-বাছতে সাহায্য করা। বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশি। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মহিলারা মেনু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয়। এই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেননি কোন্‌ সুপ তাঁর বিম্বাধর ছুঁয়ে কম্বুকণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন। ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

দা-ঠাকুরের পাইস-হোটেলে মেনু বাছতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই-বা টক, সে-তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের সময়ে পাইস হোটেলে তাব্‌ল্‌ দোৎও থাকত। ওই জিনিস সে-দিন রান্না হয়েছে লাটে; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায়।

সায়েবি হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে। সে-রেস্তোরাঁ যদি আবার উন্নাসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেনুখানাই লেখা থাকে ফরাসি ভাষায়। 'বাছুরের কাটলেট' নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়তো খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে। শুধালেন, 'কী বস্তু?' বললে, 'এস্কালপ দ্য ভো ভিয়েনোওয়াজ'—তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই, 'ভো' যে বাছুর আপনি জানবেন কী করে? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন। রেস্তোরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তুরই নাম পাবেন জর্মনে— 'ভিনার স্নিৎসেল্‌'। 'স্নিৎসেল' অর্থ 'এস্কালপ', তার মানে ইংরেজিতে 'স্ক্যালপ', সোজা বাংলায়, 'মাংসের টুকরো'। ওটা কিসের মাংস তার কোনও হদিস ওতে নেই। শুয়োরেরও 'স্নিৎসেল্‌' হয়, চীনদেশে হয়তো কুকুরেরও হয়। শুনেছি, আমাদের মুনিঋষিরা গণ্ডার খেতেন। অনুমান করি, তাঁরা তা হলে গণ্ডারের 'স্নিৎসেল' খেতেন।

আমি ইংরেজি জানিনে। মুসলমান মুরুব্বিদের কাছে শুনেছি, শুয়োরের মাংসের নাম ইংরেজিতে 'পর্ক' এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ। তাই 'পর্কচপ' না-খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মরক্ষা করেছি। তার পর একদিন আবিষ্কার করলুম, 'হ্যাম', 'বেকন' শুয়োরের মাংস, এমনকি ওই মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেনুতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করিনি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে 'তওবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'অজান্তে খেলে পাপ হয় না।' কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভালো লাগতে পারে।

কিন্তু ইংরেজি রেস্তোরাঁ বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোনও দুশ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেনু সম্বন্ধে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তদুপরি 'বয়' যখন বিল হাজির করে, তখন আমি হঠাৎ জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-দুরস্ত বিলেত-ফেরতাকেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবালু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

www.pathagar.com

বাঙালির দুর্বলতা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয়—তার প্রাণ ছোঁক ছোঁক করে মোগলাই রান্নার জন্য। কিন্তু মেনু পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যেসব খাবার সৎ-কামনা নিয়ে সে রেস্তোরাঁয় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা 'অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে'র নির্ঘন্ট যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া যে আমাকে জিল্‌ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। সুখাদ্যের জিল্‌টিং ভোলার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালি-রান্না বললে কী বোঝায় সেটা আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালি-রান্না একরকম নয়। পুব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এন্তার তফাত। পুবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, 'মাই মোটর কার ইজ সাউন্ড ইন্ এভ্‌রি পার্ট একসেপ্‌ট ইন দি হর্ন'—ঠিক সেইরকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে 'সুগার ইন্ এভরিথিং এক্‌সেপ্‌ট ইন্ রসগোল্লা।'

সব মোগলাই রান্না একরকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র 'কলকাত্তাই মোগলাই' রান্না। হালে 'লাহোরি মোগলাই'ও প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-পিন্ডির 'শেফ'রা দিল্লির কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবি মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লির মোগলাই এখন চাঁদনি চৌকে আশ্রয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে :—

(১) আফগানি নান্! কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্ রুটির (ফার্সিতে 'নান্' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্‌রুটি' তাই হুবহু পাঁউরুটির মতো, কারণ পর্তুগিজ 'পাঁউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানি নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের ন্যায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যিখানটা বিস্কুটের মতো ক্রিস্‌প্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিব্যি 'চিজ্ অ্যান্ড বিস্‌কিট'ও খাওয়া যায়)। এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্‌প্ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু চার দিন খাওয়ার পরেই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরি মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আস্ত মাছ সাফসুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুর (আভ্‌ন)-এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালোমতো রান্না হয়নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ! আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবিদের এই 'তন্দুরা ফিশ' অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরি চিকেন্। এতে প্রায় কোনও মশলাই ব্যবহার করা হয় না বলে এ-জিনিস যত খুশি খান অসুখ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আস্ত মুর্গিটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান্ সহযোগে খাবেন—ছুরিকাঁটার পাশ মাড়াবেন না।

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামি কাবাব, বড়ি কাবাব, মিশ্‌রি (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফ্‌তা-নরগিস্‌ (অনেকটা ডেভিলের মতো) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত এক, দুই, তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাত্তাই-মোগলাই রেস্তোরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনও কোনও রেস্তোরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আণ্ডা পোলাও এবং মটর পোলাও। ফিশ পোলাও অল্প রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে দুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্মা, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। যাঁরা ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অসুখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহি-ওলা-গোশ্‌ৎ'—অর্থাৎ দই-মাংস (সাধারণ মটনের হয়) খাবেন। দিল্লিওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহি-ওলা গোশ্‌ৎ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাকওলা-গোশ্‌ৎ'— অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যেরকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-ফুর্জি, রওগন যুষ, শাহি কুর্মা এবং লাটের মাল চিকেন কারি, কটন কারি ইত্যাদি তো রয়েছেই। ভেজিটেরিয়নদের জন্য মটর-পোলাও এবং চিজ-আলু, কিংবা চিজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চিজ-মটর ঝোল মানায় বেশি।

আমি মটর-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন কারি খাই; কারণ মটন-পোলাওয়ের সঙ্গে মটর-কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে দুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুবলেট বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না গ্রেভির অপ্রাচুর্য হলে, সবসময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেনু বাছাই করার সময় ডেকে নিয়ে তার সদুপদেশ নেবেন। না নিলে কী হয়?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তোরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেনুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চয়ই সুপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তার পর আঙুল নামালেন অনেকখানি নিচে। ভাবলেন মাছ, মাংস, আণ্ডা কিছু একটা আসবে। এল আবার সুপ। ইংরেজ জানতেন না, ফরাসিরা বাইশ রকমের সুপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষ পদে। পুডিঙ কিংবা আইসক্রিম হবে।

এল খড়কে—টুথ-পেক্!!

www.pathagar.com

বাংলার গুণ না জর্মন গুণী

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-করিডরে দু পিরিয়ডের মাঝখানে লেগে যায় গোরু-হাটের ভিড়, কিংবা বলতে পারেন আমাদের সিনেমা-হলের সামনের জনারণ্য। তফাত শুধু এইটুকু যে, জর্মনরা আইনকানুন মেনে চলতে ভালোবাসে বলে ধাক্কাধাক্কি-চেঁচামেচি বড় একটা হয় না, করিডরে তো রীতিমতো উজান-ভাঁটা দুটো স্রোতের মতো ছেলেমেয়েরা চলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসের দিকে, কিংবা ইউনিভার্সিটি-রেস্তোরাঁর দিকে অথবা কমন-রুম পানে।

তার মাঝখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখতে পেতুম বুড়ো আইনস্টাইন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছেন ক্লাস নিতে। আলুথালু কেশ, লজ্‌ঝড় বেশ। কোন খেয়ালে মগ্ন ছিলেন খোদায় মালুম। শেষ মুহূর্তে টনক নড়েছে সেদিন তাঁর ক্লাস আছে— রুম নম্বর গিয়েছেন ভুলে, কী পড়াতে হবে তারও খেয়াল নেই। ছেলেরা সমীহভরে পথ করে দিত আর বুড়ো আইনস্টাইন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে তাবৎ ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং চষে বেড়াতেন আপন রুমের সন্ধানে। মুখে শুধু 'পারদোঁ, পারদোঁ' (মাফ করুন, মাফ করুন), কারণ জানেন, কলিসন লাগলে দোষ তাঁরই।

অথবা দেখতে পেতুম, অর্থশাস্ত্রের বাঘা কৌটিল্য সমবার্ট চলেছেন হেলেদুলে। বগলে একগাদা কেতাব, তারই ধাক্কায় টাইটা একটু বেঁকে গিয়েছে, সঙ্গে গোটা দশেক শিষ্য শিষ্যা। চলতে চলতেই পড়ানো চলছে। সমবার্ট আর কতদিন বাঁচবেন কে জানে, তাই—

ছেলেরা সব সমবার্টেরে ঘেরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে—

তাঁর শেষ জ্ঞানবিন্দুটুকু শুষে নিতে চায়।

কিংবা দেখতুম কাঁচাপাকা চুল, একচোখ কানা সংস্কৃতের অধ্যাপক ল্যুডার্সকে। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বেদে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতা, আর্য, অনার্য, না প্রাক-আর্য, তাই নিয়ে যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা খুন-খারাপি করার মতো অবস্থায় এসে পড়েছেন, তখন সবাই বললেন, 'মোন-জো-দড়ো বৈদিক, না প্রাক-বৈদিক, সেকথা ঠাহর করার মতো এলেম মার্শালের পেটে নেই। সেখানে পাঠাও ল্যুডার্সকে। চতুর্বেদ আর সে সময়কার আহার-বিহার, ক্ষেত-খামার, হাতিয়ার-তলোয়ার সর্ববিষয় তাঁর নখদর্পণে! মোন-জো-দড়ো সভ্যতার গোপনতম কোণেও বৈদিক সভ্যতার কণামাত্র প্রভাব গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে, তবু সে ল্যুডার্সকে ফাঁকি দিতে পারবে না—

'করাচি বন্দরে নেমেই ল্যুডার্স তার গন্ধ পাবেন, ওই একটি চোখ দিয়েই তাকে খুঁজে নেবেন আর ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে বিশ্বজনকে দেখিয়ে দেবেন, বেদের ইন্দ্রদেব কোন ময়ূরের পেখম পরে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন।

'আর ল্যুডার্স যদি বলেন, "না, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মোন-জো-দড়োর কোনও প্রকারের যোগসূত্র নেই" তা হলে নাককান বুজে সেই রায় মেনে নিয়ে তাবৎ ঝগড়া-কাজিয়ার উপর ধামাচাপা দিয়ে দাও।'

আইনস্টাইন, সমবার্ট, ল্যুডার্স এঁরা সব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ, তোরণ, শিখর বিশেষ। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো শুষে নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে কত যে নাম-না-জানা ঘুলঘুলি গবাক্ষ ছিলেন তার হিসেব রাখবে কে?

www.pathagar.com

এঁরা যে বিশ্ববিদ্যালয়-যজ্ঞশালার প্রত্যন্ত প্রদেশে অনাদৃত উপেক্ষিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগত একটু বেশি। এঁদেরই একজন ছিলেন, অধ্যাপক ভাগনার, ইনি পড়াতেন বাংলা ভাষা।

জর্মন ভাষা বিশ্ববরেণ্য ভাষা। সে ভাষা পড়াবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে কি না জানিনে, কিন্তু বাংলার মতো অর্বাচীন ভাষা পড়বার ব্যবস্থা সে সুদূর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এ সংবাদ শুনে পুলকিত হয়েছিলুম।

ভাগনারের সঙ্গে আলাপ হতেই তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথেষ্ট বঙ্গভাষাভাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়নি বলে তিনি কথা কইলেন জর্মন ভাষায়, মাঝে মাঝে বাংলা মসলার ফোড়ন দিয়ে। অদ্ভুত শোনাল, কিন্তু সেই নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশে বিদেশির মুখে বাংলা শুনে জানটা যে তর্ হয়ে গেল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই!

ভাগনারের বাড়ি গিয়ে দেখি, ভদ্রলোক একখানা বাংলা বই নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন। ডাইনে-বাঁয়ে বিস্তর বাংলা অভিধান, ব্যাকরণ— এক পাশে ব্যোট্‌লিঙ্ক-রোটের পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত-জর্মন অভিধান।

বাংলা অভিধানে হদিস না মিললে সংস্কৃত দিক-সুন্দরীর (ডিক্সনারি) নিকট দিগ্‌দর্শন যাচঞা করবেন বলে।

ভূমিকা না করেই বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করুন।'

এতদিন পর আজ আর ঠিক মনে নেই কিন্তু খুব সম্ভব গল্পটা ছিল শরৎ চাটুয্যের 'আঁধারে আলো'! 'হাবুবাবু ছোরা চালাতে শিখেছে' এইরকম ধারা কী জানি কী একটা ছিল। যোগরূঢ়ার্থে 'নীলকণ্ঠ' শিব এ কথা ভাগনার জানতেন কিন্তু 'হাবুবাবু' যোগরূঢ়ার্থে যে শান্ত-শিষ্ট গোবেচারি— নিন্‌কমপুপ— সে কথাটার সন্ধান ভাগনার কোথাও পাননি, অবশ্য আভাসে আন্দাজে শব্দটার খানিকটে মানে আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভাগনার দেখলুম তাঁর ওয়াটার্লুতে এসে ঠেকেছেন, সেই গল্পের মধ্যে বিদ্যাপতির এক উদ্ধৃতিতে :

"আজু রজনী হম ভাগে পোহাইনু,
পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা
জীবনযৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরানন্দা— "

আজু-ফাজু, পেখনু-টেখনু খাঁটি বাংলা কথা নয়, কিন্তু হুঁশিয়ার ভাগনার কেঁদে-কঁকিয়ে এসব মানে বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু 'নিরানন্দা' কথায় এসে যে মানে তিনি করেছেন, সেটা মন মেনে নিলেও হৃদয় 'নিরানন্দা'ই থেকে যায়।

ভাগনার বললেন, 'তবে কি এই বুঝতে হবে, প্রিয়মুখচন্দ্র দর্শন করাতে আমার এতই আনন্দ হল যে, মনে হচ্ছে দশদিশ নিরানন্দ হয়ে গিয়েছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল আনন্দ আমাতে এসে ঠাঁই নেওয়ায় 'দশদিশ নিরানন্দ' হয়ে গিয়েছে?

অভিনবগুপ্তের না হোক, অভিনব টীকা তো বটেই।

সবিনয়ে বললুম, বিদ্যাপতি বিনা টীকায় পড়ার মতো বিদ্যা আমার নেই তবে যতদূর মনে পড়ছে, কথাটা এখানে 'নিরানন্দ নয়, আসলে আছে বোধহয় 'নিরদ্বন্দ্বা'। আমাতে-

www.pathagar.com

প্রিয়াতে মিলন হয়েছে ঐক্য হয়েছে, দশদিশে আমি আর কোনও দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছিনে। যেখানে যত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরহ ছিল সেখানেই মিলন এসে গিয়েছে— দশদিশে এখন শান্তি।

আর বেদেও তো ঋষি প্রার্থনা করেছেন, 'সর্বপ্রকারের দ্বন্দ্বের সমাধান হোক।'

ভাগনার বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ছাপার ভুল হতে যাবে কেন?

এর কোনও সদুত্তর আমি দিতে পারিনি। আপনারা যদি বাতলে দেন। ঘটনাটি যে এত সবিস্তর বয়ান করলুম তার 'মরাল' কী?'

সুকুমারী ভাষায় বলি :

'হাসতে হাসতে যাঁরা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?'

প্রকাশক আর ছাপাখানা যে 'নিরদ্বন্দ্বা' হয়ে ছাপার ভুল করেই যাচ্ছেন, 'ভাগনারেরই লাগছে ব্যথা, বুঝছে না কি তারা??'

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামর জনসাধারণের ভেতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা— এমনকি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে :

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য-অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই তো চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে, এ-খাতে ও-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলোই-বা চালু রাখি কোন কৌশলে?

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নতুন স্কুল খোলাই শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোনও বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভালো পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ-বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস

www.pathagar.com

করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে কোনও সময় আপনি সে গ্রামে গিয়ে যদি হিসাব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশি না; বাদবাকি আর সবই লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-কঁকিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্যই আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি— মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন— আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ কথা ভাবিনে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী! তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়, তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মতো কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা-মজুর আমাদের মতো গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্ট্যান্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর সময়ে হয়তো একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণকাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়তো তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়— আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কেনার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, সে-চাষা কোনও গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা *রামায়ণ* কিংবা *মহাভারত* কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওতাটা কিন্তু প্রধানত বাঙলা দেশে। হিন্দিভাষীদের *তুলসী রামায়ণ* পড়ে সে লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দিতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না— কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশি পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর খুব শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে *রামায়ণ-মহাভারত* পড়ে না এবং বাংলাভাষায় এরকম ধরনের সহজ সরল মুসলমানি ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কিরকম তার খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিস্তর হদিস পাব।

তা হলে ওষুধ কী?

যে উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি বসানো। কিন্তু অত টাকা জোগাবে কোন গৌরী সেন? সরকার তো দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নতুন স্কুল খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলে-মেয়েদের হাতে দেওয়া বিনি পয়সায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ সমস্যা নিয়ে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি— তারা এ সমস্যার সমাধান কী প্রকারে করে, কিন্তু কোনও ভালো ওষুধ এখনও খুঁজে পাইনি। আমার পাঠকেরা যদি এ

www.pathagar.com

সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

অন্য এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল' ডিরেক্‌শান্ দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সেই সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল', বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই 'রিলিজিয়ান' বলতে চাননি— তা হলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত— তাই মোটামুটি ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদু আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে লওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করতে পারেন, সে-বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এবং মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই— যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজিতে, আর মেরে-কেটে দু ভাগ বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে তো আর জোর করে বি. এ. অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারিনে। এবং তাতেই-বা কী লাভ? ক জন সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে অবসর সময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি? সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচর্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিত্তির। আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারের বইয়ের দোকানগুলোতে। যেসব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই জোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।

আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছা হবে, অথচ অনুবাদ নেই তার হিসেব করবে কে?

হিন্দিওয়ালাদের তো আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদসাহিত্য অনেক বেশি কমজোর। এই দিল্লির কনট সার্কাসে আমি হিন্দি বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতোই চক্কর লাগাই— আজ পর্যন্ত কোনও সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দি অনুবাদ চোখে পড়ল না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠি ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতিতে আরও কম। আসামিতে প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানিনে— তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা-সন্তান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

www.pathagar.com

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ তো দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অর্থাৎ অধ্যাপকদের ওপর। কিন্তু হায়, তাঁদের তো দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন??

পোলেমিক

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রায় কোনও প্রকারের ফেরফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টি-পর্ব, কেনাকাটা, মারামারি একই ওজনে চলে। দিল্লিতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু—গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াত-নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মিটিং, হপ্তায় দুটো করে আর্ট-প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদি মেনুহিন, আর এক গাদা সঙ্গীত-সম্মেলন, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এ সবকিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যেসব দেশের বাৎসরিক পর্ব গরমে পড়েছে, সেসব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে 'রিসেপশন' দেন, আর সবাই শার্ক স্কিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জলুসেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন— পার্টিতে যদি রঙবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু তো বটেই; এসব পার্টিতে জল মানা)। তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ দিল্লির কাহিনী। পুরনো দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না। প্রায় প্রতিদিনই কোনও-না-কোনও নাগরিককে, অভিনন্দন করার জন্য কোনও-না-কোনও পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিড়িঙ্গে লাউডস্পিকার ঝুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয় তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে— দরজা-জানালা বন্ধ করে একে অন্যের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এরকম একটা অভিনন্দন-পার্টিতে আমি দিনকয়েক পূর্বে গিয়েছিলাম। যে দু জনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনিনি, দিল্লির কজন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তা-ও বলতে পারব না।

দু জনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন :

'আমি এ স্থলে— নাথ বিদ্যারত্নকে নদীয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী— মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ

www.pathagar.com

বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব-স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়েরই একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদীয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুইজনের নদীয়ার চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভালো দেখায় না; এবং ওই উপলক্ষে দু জনে হুড়াহুড়ি গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভালো দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দু জনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাদেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন ফয়তা ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তার যেরূপ মরজি হয়।'

নিত্যি নিত্যি কারণে-অকারণে হৈ-হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লিবাসী বাঙালির ওপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্যসভা, কাল ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পর্ব' হয়।

এবং অনেক সময় মনে হয়েছে, এসব পর্বে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমতো হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডির ভেতর অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি পক্ষে 'স্টাডি সার্কাল' বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যাবৎ কৃতকার্য হতে পারিনি। আমার বয়স হয়েছে তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয়, অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসেবে দিল্লির মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকারও পান— সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লিতে আছি, এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব, তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করিনে।

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও আমরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছুই করে উঠতে পারিনি, অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আবার দিল্লিতে ব্যাঙের ছাতার মতো একটা জিনিস বড্ড বেশি গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহিন শোনেন, আবার আলাউদ্দিন সায়েবকেও হাততালি দেন; এঁরা ভরতনাট্যম আর মণিপুরি নিয়ে কাগজে কপচান, চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানে'র অন্ত নেই।

এঁদের একজন তো সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডিতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই— পারলে আমিও ওঁর ব্যবসা ধরতুম।

www.pathagar.com

কিন্তু আমার দুঃখ ভদ্রলোকটি বড্ডই বাংলা এবং বাঙালি-বিদ্বেষী। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যেরা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেন।

তাঁর মতে যামিনী রায়, যামিনী রায়, এবং আবার যামিনী রায়। বাঙলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রদ্দি।

ইনি যেসব 'আর্ট সমালোচনা' প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁরা এসব জিনিসের সত্য সমঝদার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের সুসন্তানদের কীর্তি বারবার স্বীকার করা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়া'র অন্যতম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনকে অস্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ-জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে— বাংলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালির পর্বত প্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে। ভারতচন্দ্রের পদ্যময় পোলেমিক, আর বাংলা গদ্য তো আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন তো কলমের লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিদ্যাসাগর। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে কথা লিখতে পারলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আইনজীবী নিজেকে ধন্য মনে করবেন— অধমের মতে পোলেমিকে বিদ্যাসাগর মশাই মিলটনের বাড়া। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কী করে প্রয়োগ করতে হয় তার উদাহরণ তো আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' মানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তার পর তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেস্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে তো অতুলনীয়। বরঞ্চ বলব, 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর চেয়েও বড় ক্যানভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ-মসীযুদ্ধে এবং এ সত্যও আজ স্বীকার করব যে, আজ যদি কোনও হেস্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ও-রকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না— সে সাহিত্যিক যে নেই সেকথা স্কুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়নেওলা আজ বাঙলা দেশে নেই।

তার পর রবীন্দ্রনাথ; তিনিও তো কম লড়েননি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁজ কম; কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না!

গল্প শুনেছি উর্দুর কবি-সম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বারবার জওক্‌কে তসলিম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে ওই দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ওই শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে-কোনও পোলেমিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে-যুগের আর যে কোনও লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।

তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাঙলা দেশে এ-পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই। ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট, ব্যঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও বাঙালি এইসব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দু কথা শুনিয়ে দেন না কেন??

www.pathagar.com

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতার কী। রসনির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন, আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেন। কিন্তু যখন কোনও জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মতো নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না এবং তখন আবার এ প্রশ্নও উঠে যেসব লোক আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালিচরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুথি-প্রবন্ধ থাকত, তবে তারই ওপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারত। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালি সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালি বড় দম্ভী', 'বাঙালি অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না'। সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়— যেমন শুনবেন, 'বাঙালি মেয়ে ভালো চুল বাঁধতে জানে,' কিংবা 'ব্যবসাতে বাঙালিকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল।'

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লিতেই প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।

বাঙালির প্রতি আপনার যদি কোনও দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলো জিনিস বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধি পাঞ্জাবি দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি। সিন্ধিরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবিরা দিল্লি অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্যে দিব্য গোছগাছ ছিমছাপ করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবিরা গাদা গাদা রেস্তোরাঁ খুলেছে। ফলে খাস দিল্লির মোগলাই রান্না, সেখান থেকে লোপ পেয়েছে— এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবি রান্না, লাহোর অঞ্চলের। (দিল্লির রান্নার কাছে সে রান্না আজ পাড়াগেঁয়ে)। এই পাঞ্জাবিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট-গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে— কিন্তু কখনও হাত পাতেনি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধুই, পুব-বাংলার লোক পশ্চিম-বাংলায় এসে অনেক করেছে, কিন্তু পাঞ্জাবি-সিন্ধিরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার ওপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি এবং এ স্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য একটু ধৈর্য ধরুন।

www.pathagar.com

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসাবিশেষের চাকরি, সেখানে সে চাকরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এসব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ওপর।

তাই প্রশ্ন, এইসব চাকরি পাচ্ছে কজন বাঙালি? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কী? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসেবে তারা তাদের ন্যায্য হকগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লিবাসী বাঙালিমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, 'না, না, না।' পরশ্রীকাতর অবাঙালিও সে ঐক্যতানে যোগ দেন। মনে মনে হয়তো বলেন, 'ভালোই হয়েছে।' তা সে কথা থাক।

কেন পায়নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালির। কে কেন পারল না, সে সাফাই গাইবার জন্যই এ আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লির সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালি এখনও তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লিতে যা ভেল্কিবাজি দেখালেন সে কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভেতর লিটল থিয়েটার চালান চাটুয্যে। দিল্লিতে যাবতীয় চিত্রভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালি উকিলবাবুর তাঁবুতে। গাওনা-বাজাতে বাঙাল আলাউদ্দিন সায়েব— রবিশঙ্করের কথা নাই-বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবীর।

ইতোমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লি ছাড়িয়েও কহাঁ কঁহা মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, কে করে তবে 'নটীর পূজা', কাকে ডাকা যায় 'চণ্ডালিকা'র জন্য?

অর্থাৎ বাঙালির রসবোধ আছে, অর্থাৎ স্পর্শকাতর। তাই সে সেনসিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা হামলার সময় শমসুল হক (কিংবা ইসলাম) নামক একজন ইন্সপেক্টর আসামিদের সঙ্গে পিরিত জমিয়ে ভেতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলত, 'হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালি 'শ্যাম' এবং স্পর্শকাতরতাই তার 'শূল'। শুধুমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালি তিন দিনের ভেতর যেরকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশের লোক সেরকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধি পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধরনা দেবে সেখানে বাঙালির নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসার করে খেতে হলে ড্রিল-ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়া-ধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধহয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর, তাদের ভেতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা— তাই তার ডিসিপ্লিনও ভালো।

www.pathagar.com

এ আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কী মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভালো নয়।' কিন্তু এ কথা কাউকে বলতে শুনিনি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভালো নয়।'

কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, সে তো আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানব কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন বস্তু— স্পর্শকাতরতা, বা ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন।

দেয়ালি

ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেয়ালি-উৎসব হয় এবং সর্বত্রই ওইদিন আলো জ্বালানো হয়। দিল্লিতেও বিস্তর আলো জ্বালানো হয়েছিল— বহু রঙের বহু ধরনের আলো জ্বালিয়ে দিল্লিবাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কলকাতাতেও এইরকম রঙ-বেরঙা আলো জ্বালানো হয়।

আমার কিন্তু এখনও ভালো লাগে ছোট শহরের দেয়ালি দেখতে— যেখানে বিজলি বাতি নেই। বিজলির প্রধান দোষ মানুষ নানা রঙের প্রদীপ জ্বালাবার জন্য সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং তাতে যেন রুচির অভাব লক্ষ হয়। দ্বিতীয়ত, পিদিমের শিখার কাঁপনে কেমন যেন একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, বিজলির নিষ্কম্প আলো বড় ঠাণ্ডা বড় নির্জীব বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, বিজলিবাতি একবার জ্বালিয়েই খালাস, তার জন্য কোনও তদারকি করতে হয় না। তাতে করে কেমন যেন জীবনস্পন্দনের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না— মনে হয় সিনেমা-সাজানোর আলোই জ্বালানো হয়েছে, তবে সিনেমা কোম্পানির অঢেল পয়সা নেই বলে রোশনাইটার খোলতাই হয়নি।

তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি, একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এ পিদিমে তেল ঢালছে, ও-পিদিমের পলতে উস্কে দিচ্ছে, পিদিমের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, ছোট ভাইকে হাতে ধরে এক পিদিম থেকে আর এক পিদিম জ্বালাতে শেখাচ্ছে, তখন মনের ওপর যে ছবিটি আঁকা হয় সে-ছবি বহু বৎসর পরে স্মরণ করেও প্রবাসীর মনে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে খানিকটে মধুর বেদনাও এনে দেয়।

দিল্লি শহরও পিদিম জ্বালে। কিন্তু পাশের বাড়িতে বিজলিবাতির রোশনাই থাকলে পিদিমের আলো কেমন যেন ম্লান আর বে-জলুস মনে হয়। তদুপরি দিল্লির যেসব জায়গায় পিদিম জ্বালানো হয় সেসব জায়গার সঙ্গে আমার তো কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই, তাই, 'অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।'

www.pathagar.com

এই দেয়ালি দেখে আরেক দেয়ালির কথা মনে পড়ে গেল। আর সে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা তিনি তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনে অল্পই দিতে পেরেছেন :

'কবি বলে, যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।'

দেয়ালির উৎসব-আলো দেখে বারবার মনে পড়ল, জীবনের বড় বড় আনন্দদীপগুলো অনন্ত ওপারে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন। হায়, কজনের জীবনে কবার তারা এপারের দেয়ালি সর্বাঙ্গসুন্দর করে জ্বালাতে পারে!!

গানের কথা : ভারত ও কাবুল

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, কে জানিত কাবুলিও গান গায়!

কিন্তু সত্যই কাবুলি গান গাইতে আর শুনতে ভালোবাসে।

কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশি। কাবুলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কম, এবং সে সঙ্গীতে তার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই বলে সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর। কাবুল শহরে যে দু চারজন কালোয়াত আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তর-ভারতে বাস করে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গিয়েছেন। তবে উচ্চারণের বেলা খাঁটি হিন্দি গানে তাঁরা একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়েন যদিও উর্দু গজল গাইতে তাঁদের তেমন কোনও অসুবিধা হয় না।

যাঁদের রেডিও আছে, তাঁরা প্রায়ই ভারতীয় কেন্দ্র থেকে আমাদের ওস্তাদি, গজল-গীত শুনে থাকেন।

কাবুলিরা খাস আরবি, ইরানি বা তুর্কিস্তানি সঙ্গীত শুনে সুখ পান না।

তাই যখন খবর এল, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর কাবুলে গান গাইতে গিয়েছেন তখন আনন্দিত হলুম। এঁর পূর্বে কজন সত্যকার ওস্তাদ কাবুলে গিয়েছেন সেকথা আমার জানা নেই, তবে দু চারজন গিয়ে থাকলেও ওঙ্কারনাথ যে সেখানে রাজসম্মান পাবেন সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

www.pathagar.com

কার্যত তাই হয়েছে।

একদা কাবুলের রাজা যেরকম শ্রমণ হিউয়েন সাঙকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন ঠিক তেমনি কাবুলের আজকের রাজা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথকে সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজা জহির শাহ পণ্ডিতজিকে বলেন, রেকর্ডে পণ্ডিতজির সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য তাঁর পূর্বেই হয়েছিল; কিন্তু মুখোমুখি তাঁর আপন কণ্ঠের গান শোনার সুযোগ তাঁর জীবনে এই প্রথম।

কাবুলিরা তাগড়া জাত; তারা সঙ্গীতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ পছন্দ করে। ঠিক ওই বস্তুটিই পণ্ডিতজির আছে— তিনি গাইতে আরম্ভ করলে সভাস্থল গমগম করতে থাকে। তিনি যে শুধু এদেশে সুখ্যাত তাই নয়, ইয়োরোপও তাঁর গলা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আমার এক জর্মন বন্ধু পণ্ডিতজির 'নীলাম্বরী'তে গাওয়া 'মিতুয়া' রেকর্ডখানা বাজিয়ে বারবার আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেন।

তাই ওঙ্কারনাথ যে কাবুলে অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কী!

কিন্তু এই কি শেষ?

হাউই জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার শিখা দিয়ে যে লোক তার মাটির প্রদীপটি জালিয়ে নেয় সে-ই বুদ্ধিমান। ওঙ্কারনাথ কাবুলে যে আতসবাজি দেখিয়ে দিলেন তার জের এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। ওরই খেই ধরে অনেক কিছু করবার আছে।

বিদেশি কত ছাত্র ভারতীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি শিখে যায়। এসব বিদ্যা আমাদের নিজস্ব নয়, ইয়োরোপের কাছ থেকে শেখা। এগুলোতে আমাদের আপন কোনও গর্ব নেই। কিন্তু কাবুলি 'শাগরেদ' যদি ভারতে এসে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত শিখে যায় তবে তাতে ভারতের গর্ব ষোল আনা; এই করেই পুনরায় ভারত-আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত এবং দৃঢ়ীভূত হবে। ভারত সরকারের উচিত তার সুব্যবস্থা করা— আফগানিস্তান আমাদের তুলনায় গরিব দেশ। (আরেকটা কথা ভুললে চলবে না। কাবুলে পাশ্চাত্য 'জাজ' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে; আমরা যদি এই বেলা জোর হাতে হাল না ধরি তবে একদিন দেখতে পাব, কাবুল আর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে চায় না।)

দ্বিতীয়ত, এদেশ থেকে ছাত্র কিংবা অধ্যাপক পাঠাতে হবে কাবুল গিয়ে অনুসন্ধান করতে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নৃত্য একদা কাবুলে কতখানি প্রচারিত এবং প্রসারিত ছিল এবং অদ্যকার পরিস্থিতিই-বা কী! তাঁকে প্রস্তাব করতে হবে, কী করলে আমাদের সঙ্গীত সে দেশে আপন অর্ধলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

এসব কর্ম যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল!

আমি চেষ্টা করছি, কাবুলি খবরের কাগজ থেকে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বিজয় অভিযান উদ্ধার করতে।— শক্ত কাজ। দিল্লিতে তো আর কাবুলি সংবাদপত্র বিক্রয় হয় না! পেলেই কিন্তু পেশ করব ॥

www.pathagar.com

উনো, হিন্দি, ক্রিকেট

প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ সুকুমার রায় বলেছেন,

'গোঁফকে বলে তোমার আমার— গোঁফ কি কারও কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

অর্থাৎ মানুষ দিয়ে গোঁফের বিচার হয় না— গোঁফ দিয়ে মানুষের বিচার করতে হয়।

কথাটা আমাদের কাছে আজগুবি মনে হলেও আসলে তা নয়। চোখ খোলা রাখলে নিত্যি নিত্যি তার উদাহরণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এই মনে করুন কলকাতা শহর। কি লোকসংখ্যা, কি আয়তন, কি ব্যবসাবাণিজ্য, কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা— সবদিক দিয়েই কলকাতা শহর দিল্লিকে এক শ' বার হার মানাতে পারে, কিন্তু হলে কী হয়, দিল্লি যে রাজধানী! অতএব দিল্লির মাহাত্ম্য কলকাতার চেয়ে বেশি।

অর্থাৎ রাজধানীর গোঁফ দিয়ে শহর যাচাই করতে হয়। শহরের প্রাধান্য থেকে রাজধানী হয় না।

তবেই দেখুন, সুকুমার রায়ের বাণীটি আপ্তবাক্য কি না।

তাই দিল্লির ধারণা ইউএনও'র পালা-পর্ব করার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশি এবং এ সপ্তাহে দিল্লি বিস্তর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সে পর্ব সমাধান করেছেও বটে।

মেলা গুণী বিস্তর ভাষণ দিয়েছেন। কি গলা, কি বলার ধরন, কি হাত-পা নাড়া, কি উচ্ছ্বাস— সব দেখে শুনে মনে কণামাত্র সন্দেহ আর থাকে না, এঁরা যদি দিল্লিতে বক্তৃতা না দিয়ে উনোতে দিতেন, তবে অনায়াসে আমাদের জন্য কাবুল-কান্দাহার জয় করে আনতে পারতেন।

এঁরা কী বক্তৃতা দিলেন? আমার নীরস ভাষা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করলে গুণীদের প্রতি অবিচার করা হবে, তাই প্রতীকের সাহায্যে, অর্থাৎ অ্যালজেব্রা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব।

এঁদের প্রায় সকলেই একই কথা বললেন। সেটা হচ্ছে এই; যদিও উনো ক, খ, গ করতে সক্ষম হননি, তবু চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে চ, ছ, জ হয়তো-বা করলে করতেও পারেন। এবং ট, ঠ, ঢ-ও যে তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব একথাই-বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?

যেন ইস্কুলের মাস্টারমশায় জমিদারবাবুর ফেল করা ছেলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখছেন। জমিদারবাবুকে না চটিয়ে তাঁর গর্দভ ছেলের হাল-হকিকত বাতলানো সোজা কর্ম নয়। উনোর প্রশস্তি-গায়করা সেই টাইপ-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

হায় কাশ্মির, হায় কোরিয়া, হায় ইন্দোচীন, হায় তুনিস্, আরও কত হায়, হায়!

আমি কিন্তু উনোর কাম্-কেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।

প্রথমত, মিটিঙে গালিগালাজ মারামারি না করা। কিছুদিনের কথা, ফ্রান্সের পার্লিমেন্টে সদস্যেরা অন্য কোনও অস্ত্র-শস্ত্র পাননি বলে গলার চেন খুলে একে অন্যকে জোরসে

www.pathagar.com

ঠুকেছেন— ফলে রক্তারক্তিও নাকি হয়েছিল। বাঙলা দেশের পার্লিমেন্টেও নাকি অনেক কিছু হয়েছে, যদিও রক্তারক্তি হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তবে মারামারিই তো শেষ কথা নয়। ভাষা অনেক সময় ডাণ্ডার চেয়েও কঠিন কঠোরতর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মাস্টাররা এখন ছেলেদের চাবুক মারেন না বটে, তবে সে চাবুক এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের জিভে; তাঁদের জিভ এখন চাবুকের চেয়ে নিষ্ঠুরতর।

কিন্তু সে তত্ত্বালোচনা উপস্থিত থাক।

আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয়, এখনও উনোতে হাতাহাতি কিংবা পুরোদস্তুর একে অন্যকে অপমান না করেও তাঁর কাজকর্ম (তা সে যতই নগণ্য কিংবা অর্থহীন হোক না কেন) সমাধান করছেন কী করে?

কাষ্ঠরসিকেরা এর উত্তরে কী বলবেন তা-ও আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁরা বললেন, 'আরে বাপু, যেখানে শুধু তর্কাতর্কি— বাকযুদ্ধ, যেখানে কোনও প্রকারের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান হবে না, যেখানকার কোনও বাগাড়ম্বরই আমার আপন দেশে কোনও প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ আমার দেশকে এক গিরে জমি কিংবা এক কড়ির আমদানি খোয়াতে হবে না, সেখানে মারামারি হাতাহাতি করতে যাব কোন দুঃখে?'

হক্ কথা। দুনিয়ার বহু জাতই এ তত্ত্ববাক্যে সায় দেবে। কিন্তু আমি বাঙালি। আমার মন বলে কথাটা হক হলেও টক করে মেনে নিতে আমার বাধছে। 'মোহনবাগান'-'ইস্টবেঙ্গলে'র খেলাতে কে জেতে কে হারে, তাতে আমার কণামাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবু তো তাই নিয়ে তর্ক করে আমি সেদিন দুটো চড় খেয়েছি, তিনটে কিল মেরেছি। সে রাত্রে না খেয়ে শুতে গিয়েছি, পাশের বাড়ির শা-রা সাত টাকা সেরে ইলিশ কিনে ফিস্টি করেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (সোজা বাংলায় ইম্পর্টেন্ট) হিন্দি ভাষা রাষ্ট্রভাষা। তাঁর জয় হোক। তিনি দেশ-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন; আমার বুক ফাটবে না! কিন্তু যখন বলা হয়, হিন্দি না শিখলে (এবং ইংরেজি বর্জন করার পর) আমরা দিল্লির পার্লিমেন্টে একে অন্যকে বুঝব কী করে, তাই সবাই হিন্দি শেখ, তখন আমার মনে আসে উনোর কথা। সেখানে কত গণ্ডা ভাষা নিয়ে কারবার চলে ঠিক বলতে পারব না, তবে বিবেচনা করি ভারতে যে কটি ভাষা চালু আছে, তার চেয়ে বেশি ভাষা-ভাষী সেখানে জমায়েত হন। তাঁদের বেশিরভাগই বক্তৃতা দেন আপন আপন মাতৃভাষাতে। বর্মার সদস্য যখন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন, সঙ্গে সঙ্গে সে বক্তৃতা ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনিশ ইত্যাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়। প্রত্যেক সদস্যের কানে 'ইয়ার-ফোন' লাগানো। সমুখে ছোট একটি কল। তিনি যে ভাষায় অনুবাদ চান, সে ভাষার ওপর কলের কাঁটাটি লাগিয়ে অনুবাদটি শুনে নেন! যেমন যেমন বক্তৃতা হয়, অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে চলে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ শেষ হয়— সব সদস্যই জেনে যান, বক্তা কী বললেন। যেসব সদস্য বক্তার মাতৃভাষা জানেন, একমাত্র তাঁরাই 'ইয়ার-ফোন' ব্যবহার করেন না।

www.pathagar.com

তবে দিল্লির পার্লিমেন্টেই-বা এ ব্যবস্থা হতে পারে না কেন? ভারত-সুদ্ধ লোককেই-বা হিন্দি-উর্দু-হিন্দুস্তানি শিখতে হবে কেন?

হিন্দি-উর্দু-হিন্দুস্তানির কথায় মনে পড়ল ক্রিকেট-কমেন্টারির কথা।

এবারকার ক্রিকেট টেস্টম্যাচের খেলাতে হিন্দিতেও 'সমসাময়িক টীকা' ধাবমান মল্লীনাথ (রানিং কমেন্টারি) দেওয়া হয়েছে। যেদিন আপিসের অত্যাচারে খেলা দেখতে যেতে পারিনি, সেদিন লাঞ্চের সময় টীকা শুনে দুধের আশ ঘোল নয়, জল দিয়ে মিটিয়েছি। মাঝে মাঝে হিন্দি টীকাও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শুনতে হয়েছে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এক টীকাকার যুক্তপ্রদেশের অতি খানদানি ঘরের ছেলে। তিনি জানেন, আমির এলাহি বহুদিনের মুরুব্বি খেলোয়াড়। তাই তিনি বারবার বললেন, 'এরপর আমির ইলাহি সাহেব বড়ি খুবসুরতকে সাথ (বড় সৌন্দর্যের সঙ্গে) গেন্দ (বল) পাকড়ুলি (ফিল্ড করলেন)। আমির ইলাহিকে 'সাহেব' বলার পূর্বে তিনি অন্য দু একজনকে 'সাহেব' উপাধি দেননি, এরপর তাঁর মনে হল সবাইকে 'সাহেব' বলা উচিত, তাই তিনি আঠার বছরের ছোকরা হাফিজকেও 'সাহেব' সম্বোধন করতে লাগলেন।

ক্রিকেট গণতান্ত্রিক খেলা। ক্রিকেটের দেবেন্দ্র ব্র্যাডমানকেও কোনও ইংরেজি টীকাকার মিস্টার ব্রাডমান কিংবা 'রেসপেকটেড' ব্র্যাডমান বলে উল্লেখ করেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ সৌজন্য-ভদ্রতার দেশ, ক্রিকেট খেলি আর যাই খেলি, পিতৃবয়স্ক আমির ইলাহি, কিংবা মুরুব্বি অমরনাথকে 'সাহেব' না বলে বাক্য-স্ফুরণ করি কী প্রকারে।

টীকাকার আবার হিন্দি-উর্দু দুই-ই জানেন। আবার তিনি এ তথ্যও জানেন, করাচি-লাহোরে বিস্তর মুসলমান তাঁর টীকা রেডিওর পাশে বসে কান পেতে শুনছেন। তাঁরা কট্টর হিন্দি বুঝতে পারেন না— টীকাকার তাঁদেরই-বা নিরাশ করেন কী প্রকারে? তাই সমস্তক্ষণ তিনি ছিলেন আপসের তালে।

দৃষ্টান্ত দিই।

পাকিস্তানের 'অবস্থা তখন বড়ই বিপদসঙ্কুল' হিন্দিতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, 'বিপদজনক পরিস্থিতি', উর্দুতে, বলতে হয়, 'খতরনাক হালৎ'। টীকাকার দু কুল রক্ষা করলেন, 'খতরনাক পরিস্থিতি'। আশা করলেন, পাকিস্তান-হিন্দুস্তান উভয়েই বুঝে যাবে 'অবস্থা সঙ্গিন'!

আমি কিন্তু সত্যই স্বীকার করি, ভাষার ওপর ভদ্রলোকের দখল আছে। মাঁকড় 'আরামকে সাথ' (অক্লেশে, আরামের সঙ্গে) গেন্দ (বল) বোলারকে ফিরিয়ে দিলেন, পঙ্কজবাবু 'আহ্সানিসে' (অনায়াসে, অবহেলায়) বলটাকে পাকড়ে নিলেন, গুলমহম্মদ বড় 'শানদার' (মহিমাময়) খেলা দেখালেন, নাজির মহম্মদ 'কাইম' ('কায়েমি'— অর্থাৎ সেটেলড্ ডাউন) হয়ে গিয়েছেন— আরও কত কী!

আর অদ্ভুত তাঁর নিরপেক্ষতা। বরের মাসি, কনের পিসি। একে বলেন, সাধু সাধু, ওকে বলেন শাবাশ শাবাশ! কেউ ক্যাচ ধরলে তিনি 'অচৈতন্নি', কেউ সিঙ্গল করলে তিনি 'বেহুঁশ'।

খেলা না দেখেও খেলা দেখার আনন্দ পেয়েছি ॥

www.pathagar.com

বুদ্ধং শরণং

সারিপুত্ত ও মাহমৌদ্গল্যায়নের পূতাস্থি প্রায় এক শতাব্দীর পর পুনরায় তাঁদের সমাধিস্থলে রক্ষিত হচ্ছে।

প্রায় এক শ বছর পূর্বে সাঁচির স্তূপের উপর থেকে নিচের দিকে সুড়ঙ্গ কেটে তলার দিকে দুটি পেটিকা পাওয়া যায় এবং তাদের উপরের লেখা থেকে সপ্রমাণ হয় যে, পেটিকা দুটিতে এই দুই মহাস্থবিরের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। আপাতদৃষ্টিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এই দুই মহাপুরুষের দেহাস্থি বের করা বর্বরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে যুগের তার সত্যই একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে যুগে বিদেশি শাসনকর্তারা এই ত্রিভুবনে আমাদের যে কোনও গৌরবস্থল থাকতে পারে সেকথা আদপেই স্বীকার করতে চাইতেন না— শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তাঁরা আমাদের বাহাদুরির শাবাশি দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন, সে নাকি আমাদের কল্পনাশক্তি— উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাপ্রবণতা। এই 'প্রশস্তি' দিয়ে তার পরমুহূর্তেই তাঁরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বলতেন, 'এদের বুদ্ধ, এদের আনন্দ, সারিপুত্ত মৌদ্গল্যায়ন, জনপদকল্যাণী সবই এদের কল্পনাপ্রসূত— অভদ্র ভাষায় গাঁজা-গুল।'

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ইংরেজ পণ্ডিতগণ এ মতে ঠিক সায় দিতেন না বলেই সাঁচির স্তূপ খুঁড়ে এই দুই শ্রমণের দেহাস্থি বের করা হয়েছিল। পেটিকা দুটি না বেরোলে আমাদের আরও কতখানি এবং কতদিন ধরে গালাগাল খেতে হত তার ঠিক হিসাব করা কঠিন।

তার পর এই দুই পেটিকা বিলেতে প্রায় এক শ বছর বাস করার পর বহু দেশে বহু লক্ষ নরনারীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেয়ে আবার সাঁচিতে ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, খোঁড়া না হয় হয়েছিল, কিন্তু পেটিকা দুটি বিলেতে নিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

সেখানেও এঁদের জীবনের মাহাত্ম্য এক অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখায়। এঁদের দেহাস্থি যদি একদা বিদেশে না যেতেন তবে তাঁদের দেশে ফিরে আসার উপলক্ষ নিয়ে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারত না এবং আজ সাঁচিতে তার চরম উৎসব উপলক্ষে এতগুলো দেশের গুণী, জ্ঞানী, সাধু, তাপস একত্র হয়ে তাঁদের জীবন-মাহাত্ম্য কীর্তন করে, এক হয়ে তাঁদের জীবনাদর্শের স্মরণে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তির বাণী প্রচার এবং প্রসার করতে নবীনভাবে অনুপ্রাণিত হতেন না।

এখানে ঈষৎ একটি অপ্রিয় মন্তব্য করে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করি।

এ দেশের সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা যে আজ জাঁকজমক আর বাহ্যাড়ম্বরেই শেষ হয় সেকথা বাঙলা দেশের বিচক্ষণ লোকমাত্রেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই সাঁচির উৎসব যে বাগাড়ম্বরেই শেষ হতে পারে, সে ভয় আমাদের সম্পূর্ণ অমূলক না-ও হতে পারে। তাই প্রশ্ন, সাঁচিতে সমবেত মনীষীগণ যে একবাক্যে শপথ গ্রহণ করলেন, পৃথিবীতে পুনরায় শাক্যমুনির শান্তিবাণী প্রচারিত হোক, তার সম্ভাবনা কতটুকু?

এ আশা দুরাশা যে পৃথিবীতে বহু লোক এখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ পর্বের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিতজি, শ্যামাপ্রসাদ এবং রাধাকৃষ্ণণ বৌদ্ধধর্মের

www.pathagar.com

দীক্ষা কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেননি। তাই আজ যদি আমরা সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা জীবনে সফল করবার চেষ্টা করি তা হলে আমরা কপটাচারী একথা বলা অন্যায় হবে।

আমার মনে হয়, ধর্মপরিবর্তনের যুগ আর নেই। একদা এ পৃথিবীতে অন্য ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে সে ধর্মের ফললাভ করার কোনও পন্থা উন্মুক্ত থাকত না— কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সর্ব ধর্মগ্রন্থ অনায়াসলভ্য, আজ আমরা অন্য ধর্মের সাধুসজ্জনদের সহবাস করতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের দোষগুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য, এ কর্ম সহজ, সরল করে দেওয়াও বটে। সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই; আজ হিন্দু খ্রিস্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।

শান্তির বাণী তো সব ধর্মই প্রচার করেছে : তাই এখন প্রশ্ন, শান্তির বাণীর জন্য বৌদ্ধধর্মের কাছেই হাত পাতবার প্রয়োজন কী!

প্রয়োজন এই, প্রত্যেক ধর্মই কোনও না কোনও এক কিংবা একাধিক নীতির ওপর জোর দিয়েছে বেশি। বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য (কেন দিয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বিজড়িত) এবং তারই ফলে মৌর্যযুগে তাবৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে একদিন অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়েছিল। সারিপুত্ত, মহামৌদ্গল্যায়ন প্রমুখ শ্রমণ যদি আপন প্রাণ হাতে নিয়ে প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে শান্তির বাণী প্রচার না করতেন (জাতকে বারবার দেখতে পাই যে-কোনও দেশ বা প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে যাওয়ার অর্থ সে-যুগে ছিল আপন প্রাণ নিয়ে খেলা করা) তা হলে প্রদেশ-প্রদেশের সীমান্তরেখা বিলীন হত না এবং ফলে ঐক্যবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন ভারত কবে সেরূপ নিত— এবং আদৌ নিত কি না— আজ তার কল্পনা করা যায় না।

এবং এইখানেই তথাগতের প্রেম এবং মৈত্রী অভিযানের শেষ নয়— আরম্ভ মাত্র। পুনরায় বলি, আরম্ভ মাত্র।

তার পর এই বৌদ্ধবাণীর কল্যাণেই সিংহল গমন সহজ হল, দুর্ধর্ষ আফগানিস্তানের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হল, (কাবুলের গ্রিক, বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে গান্ধার শিল্প নির্মাণে সাহায্য করল এবং আজ যে আমরা প্রভু বুদ্ধের মূর্তি দেখে শান্তিরসে পূর্ণ হই, তার গোড়াপত্তন করে এই গ্রিকরাই), দুর্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ অতিক্রম করে বৌদ্ধ শ্রমণরা বামিয়ান পৌঁছলেন (সেখানকার বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর আর যে কোনও বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ মূর্তির চেয়ে উচ্চ), তার পর বর্বর তাতার তুর্কমান পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করল, সর্বশেষে তখনকার দিনের সবচেয়ে সভ্যদেশ চীন পর্যন্ত তথাগতের শরণ নিল!

এ দিকে বর্মা, শ্যাম, মালয়, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ ভূখণ্ড।

www.pathagar.com

ভারতের মতো বিরাট দেশকে চীনের মতো বিশালতর দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এই বৌদ্ধ অভিযান যে মানবসভ্যতাকে কতখানি এগিয়ে দিল তার সুস্পষ্ট ধারণা দূরে থাক, তার কল্পনামাত্রও আজ আমরা করতে পারিনে। জানি পরবর্তী যুগে খ্রিস্টধর্ম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডকে এক করে দিয়েছিল, কিন্তু সে তো অসংখ্য দ্বন্দ্ব অগণিত সংগ্রামের ভেতর এবং আজও তার শেষ হয়নি।

ভারত-চীন, ভারত-তিব্বত এবং ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা প্রধানত বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে। একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, যেদিন ভারত বৌদ্ধধর্ম বর্জন করল (কেন করল, এবং না করলে তার গত্যন্তর ছিল কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ এবং এখানে অবান্তর), সেইদিন থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পেল।

কিন্তু ভারত বৌদ্ধধর্ম বর্জন করেছে একথা ভুল। তথাগতের বাক্য, নীতি, অবদান (প্রাচীনার্থে), ধম্ম সনাতন হিন্দুধর্মের শিরা-উপশিরায় আজ এমনই মিশে গিয়েছে যে, তার বিশ্লেষণ অসম্ভব এবং অপ্রয়োজন।

পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও আজ সেগুলো হিন্দুধর্ম থেকে বর্জন করতে সম্মত হবেন না। তাই আজ ব্রাহ্মণ শ্যামাপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ ও জওয়াহিরলালের শ্রমণাস্থি স্কন্ধে গ্রহণ কিঞ্চিৎমাত্র গুরুভার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এবং শুধু কি তাই? অমিতাভের বাণীতে কী অমিত অমৃত লুকানো রয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেদিন তার বাণী ইয়োরোপে পৌঁছল সেদিন ফ্রান্সের ব্যুর্নফ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ আগ্রহের সঙ্গে সে বাণী গ্রহণ করলেন। ইয়োরোপের জনসাধারণও কী অদ্ভুত সাড়া দিল সে বাণী শুনে! ইয়োরোপ তখন আজকের চেয়ে বেশি ধর্মবিমুখ— বিগত দুই যুদ্ধ ইয়োরোপকে আবার আত্মার সন্ধানে তাড়া দিয়েছে— তবু তারা কী আগ্রহেই না বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ করল!

খোদ পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে, পাদরি-পুরুতের তোয়াক্কা না করেও ধর্মচর্চা করা যায়, একমাত্র নিজের ওপর নির্ভর করে, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করে, তথাগতের উপদেশের সঙ্গে সাধনাগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে, তথাগত যেখানে আগত হয়েছেন সেখানে পৌঁছনো যায়, এ স্বপ্ন ইয়োরোপের কোনও জ্ঞানী কোনও গুণী দার্শনিকই দেখবার সাহস করেননি। বুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বাণী এক মুহূর্তেই ইয়োরোপের সামনে এক নবীন ভুবন আলোক দিয়ে জাজ্বল্যমান করে দিল।

তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে আজ ওই এক মহাপুরুষ-বুদ্ধদেব— যাঁর পায়ের কাছে আজ সর্ব নাস্তিক সর্ব আস্তিক স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়েও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ত্রিশরণ জপ করতে পারে :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥

www.pathagar.com

অ্যার ট্রাভেল

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম অ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম। দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ-সোওয়ারি বা 'জয় রাইড' নয়, রীতিমত দু শ মাইল রাস্তা— পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদীনালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তার পর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়তো পুষ্পরথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন ক্র্যাশে অক্কালাভ করব— তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ তো জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়'। সে কথা থাক।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারই লক্ষ করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-অসুবিধেই' বলা উচিত ছিল, কারণ প্লেনে সফর করার চেয়ে পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকিবহাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত তাই তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাদের এ যাবৎ হয়নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসুন— ব্যস, হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু একথা বলব, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনও গতিকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সিট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার জো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'অ্যার আপিসে'। আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না— কেউ দেবে ঢাকা, কেউ দেবে আসাম, মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লির।

এবং এসব অ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশিরভাগ ট্রাম-লাইন, বাস-লাইনের উপর নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা-গঙ্গার হাওয়া খেয়ে; 'অ্যার আপিসে' যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

অ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে, ভুল করে বুঝি জঙ্গি দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিও-অফিসার তো উর্দি পরে আছেনই, এমনকি টিকিটবাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল সোনালির ব্যাজ-ঝিল্লা-বিরণ-পট্টি, যা-খুশি বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু গার্ড সাহেবরাও উর্দি পরেন, কিন্তু সে উর্দি জঙ্গি কিংবা লস্করি উর্দি থেকে স্বতন্ত্র, অ্যার আপিসে কিন্তু এমনি উর্দি পরা হয়— খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই— যে আমার মতো কুনো বাঙালি সেটাকে মিলিটারি কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে দুম করে একটা স্যালুট করে ফেলে।

তার পর সেই উর্দি-পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরেজিতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধুতি কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালি, তবু ইংরেজি বলা চাই। আপনি না

www.pathagar.com

হয় সামলে নিলেন, বি.এ. এম.এ পাস করেছেন— কিন্তু আমি মশাই পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরেজি বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরেজি বুঝতে পারিনে— কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাংলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্তত তিনি বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে তো ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধা এই যে, পরে যদি মন বদলান তবে রিফান্ড পেতে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন, আপনি ঠিক সময় দমদম উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস্ করলেন। রেলের বেলায় তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকার খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সেটি হচ্ছে না। অথচ আপনি পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সিট ফাঁকা যায়নি, আর এক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সিটে ট্র্যাভেল করেছেন, অ্যার কোম্পানিও স্বীকার করল, কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। অ্যার কোম্পানির ডবল লাভ। এ নিয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা লাগালে কী হবে বলতে পারিনে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই অ্যার কোম্পানির চেয়েও বেশি।

টিকিট কেটে তো বাড়ি ফিরলেন। তার পর সেই মহা মূল্যবান 'মূল্যপত্রিকা'খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেন দমদম থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু অ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়? বলে কী? নিতান্ত থাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও তো আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাইনে— কাছাকাছির সফর হলে তো আধ ঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট, আর যদি ফাস্ট কিংবা সেকেন্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশি— অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে তো আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়।

আপনি হয়তো প্লেনে থাকবেন পৌনে দু ঘণ্টা, অথচ আপনাকে অ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকা দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরও কত সময় যাবে সেকথা পরে হবে)।

এইবারে মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পাউন্ড লগেজ ফ্রি পাবেন। অতএব

"সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারিখান
গুড়ের পাটালি কিছু ঝুনা নারিকেল
দই ভাণ্ড ভালো রাই সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—"

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়তো ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাকবাংলোয়। বিছানা বিশেষ করে মশারি-বিনা কী করে পোয়াবেন দিনরাতিয়া?

www.pathagar.com

বিছানাটা নিলেন কি? না। তার ভেতর যে ভারি জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তা হলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোনও লাভ হত না, কারণ জিনিসটিকে ওজন তো করা হতই— মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

অ্যার ট্র্যাভেল করবেন— মাত্র চুয়াল্লিশ পাউন্ড ফ্রি লগেজ— অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মতো একটি পিচবোর্ডের কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালপত্র পুরে— সেটার অবস্থা কী হবে মোকামে পৌঁছলে পরে বলব—রওনা দিলেন অ্যার আপিসের দিকে, ছাতা বরষাতি অ্যাটাচি হাতে, তার জন্যে ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ!)।

ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু একজন বন্ধু-বান্ধব। যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু দশ মিনিট আগেই রওনা দিলেন আর অ্যার আপিসে পৌঁছলেন বাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে— আমার জাতভাই বাঙালরা যেরকম ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

অ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। যে লোকটা কুলি-চাপরাশি সমন্বয়— তা হোক গে— কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দিতে'— রাষ্ট্রভাষাতে— অর্থাৎ তার অউন, অরিজিন্যাল হিন্দিতে কথা বলবেই— যেরকম তার বসের ইংরেজি বলার বাই অথচ উভয়পক্ষই বাঙালি।

আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞাত, কিন্তু এই বাঙলা দেশের মহানগরী, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের লীলা-ভূমিতেই আপিস আদালতে, রাস্তাঘাটে 'আ মরি বাংলাভাষার' কী কদর, কী সোহাগ!

কলকাতা বাঙালি শহর। বাঙালি বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালিই বুঝি, তাই আমাদের অ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মতো। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুরগি তার পর আলুভাতে আর মশুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের সাথে আপিসগুলো খোলা হয় তখন সায়েবি কায়দায় বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যান্ড, গ্লাস-টপ টেবিল— তার উপরে থাকত মাসিক, দৈনিক, অ্যাশট্রে আরও কত কী! সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়— চাপরাশিগুলোর উর্দিই তো আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশি ধোপদুরস্ত ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো— ক্যাঁচক্যাঁচ করে ছুটির জন্য আবেদন জানাচ্ছে, দেয়ালে চুনকাম করা হয়নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে— সমস্তটা নোংরা এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরেজিতে যাকে বলে ড্রেয়ারি ডিসমেল।

একটা অ্যার আপিসে দেখেছি— ভেতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় আমাদের রান্নাঘরের তেলচিটে-কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না। আসুন একদিন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাসই যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাশা আরম্ভ হয়, তার পর ডবল

www.pathagar.com

সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুস্তাক আলির মতো ট্রিপলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '— মুখুজ্যে' যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুজ্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তার পর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন?।

রবি ঠাকুর কী একটা গান রচেছেন না?

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুর মেলাতে—"

অ্যার কোম্পানির বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নতুন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচুবন থেকে কুড়িয়ে আনা যেসব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম, আমাদের অ্যার কোম্পানির বাস প্রায় সেইরকম। ওদেরই আপিসের মতো নোংরা, নড়বড়ে আর সিটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবিস্তানের উটের পিঠের মতো। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে কোনও একটায় দু দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর খেদ থাকবে না।

মধ্য কলকাতা থেকে দমদম ক'মাইল রাস্তা সে-খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে—

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ!'

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেটবাস, বে-সরকারি বাস এমনকি দু চারখানা সাইকেল রিকশাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ যাত্রীকে এক খেপে দমদম দিয়ে যাবার জন্যে তৈরি এই ঢাউস বাস— প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়, ড্রাইভার করবে কী, আপনিই বা বলবেন কী?

দিল্লি থেকে কলকাতা আসবার সময়ে একবার দেখেছিলুম, যে যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয়নি এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদম পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। সে-ও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুরতো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক অ্যার পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসি মেম থেকে কারও-বোরকায়-সর্বাঙ্গঢাকা পর্দানশিনী হজ-যাত্রিনী সবকিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে একথাও ঠিক, হাওড়ার প্লাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম।

প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই আর হুড়োহুড়ি করার কী প্রয়োজন?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিন কয়েক পূর্বে দমদম অ্যার পোর্ট রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক গ্লাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ফ্রি বিলানো হচ্ছে?

www.pathagar.com

বয় বললে, জলের টাঁকি সাফ করা হয়েছে, তাই জল ঘোলা, এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিল, ও জল না খাওয়াই ভালো।

শুনেছি ইয়োরোপের কোনও কোনও দেশে নরনারী এমনকি কাচ্চা-বাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি টাঁকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাব।

শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্‌ব্যস্ত করে তুলবে না, কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই এখন রুটির বদলে কেক খাব। সেকথা থাক।

কিন্তু দমদম অ্যার পোর্টের সত্যিকার জলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দু বার দেখেছি। ভোর থেকে যেসব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারেনি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে অ্যার পোর্টে।

আরও যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদের প্লেন ছাড়তে পারছে না, করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। একদিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে আসছে; এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য অ্যার কোম্পানির কর্মচারীদের বারবার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ড্যাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানা রকমের গুজব— কোথায় নাকি কোন প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না— যেসব বন্ধুরা 'সি অফ' করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসংবরণ, প্লেন 'টেক অফ' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রি খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানিরা গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত আরও কত কী!

লাউডস্পিকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়েনি। খবর দেবেই-বা কী?

দমদম নর্থ-পোল হলে কী হত জানিনে। শেষটায় কুয়াশা কাটল। হঠাৎ শুনি লাউড স্পিকারটা কুয়াশায়-জমা গলার কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গায় প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কী নম্বর বলল বোঝা গেল না) করে রওনা দিন।'

আমি না হয় ইংরেজি বুঝিনে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেননি। গোবেচারিরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা অ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানির লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে রওনা করে দিল— পাণ্ডারা যেরকম গাঁইয়া তীর্থ-যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক-গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল তো অনেক ইংরেজি না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভি প্লেনে চড়ছে। তব্ বাঙালি জবান মে প্লেনকা খবর বলে কাহে?'

ওই বুঝলেই তো পাগল সারে।

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পর্বত, গৃহ অট্টালিকা

www.pathagar.com

অতিশয় দ্রুত গতিতে তার চক্ষুর সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখনই তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুনরায় জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খ-পোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কী প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমণ মহর্ষি একটানা ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নিচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যেরকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেইরকম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসেছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, 'এখন তো তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমায় একথাটা তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সি প্রবাদবাক্য উল্লেখ করে বলেছিলুম :

"পির্‌হা নমিপরন্দ্‌
শাগিরদান উন্থারা মিপরানন্দ্‌।"

অর্থাৎ 'পির (মুরশিদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)'।

তার কিছুদিন পরে আমি রমণ মহর্ষির পীঠস্থল তিরু আন্নামালাই (শ্রীআন্নামালাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তিরু আন্নামালাই গ্রামে অবতরণ করেন— সাধনার ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমণাশ্রম দ্রৌপদী-মন্দির সবকিছু খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তার পর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কীরকম অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল।

আমার এ অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিন্তু সপ্রমাণ হয় না যে, পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমণ মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হননি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কীরকম বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন, কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে— এ জিনিস অসম্ভব, কারণ দৌড় দিয়ে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় অ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল অ্যারোড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হ্যাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে; কিন্তু সেই প্লেন যখন শ পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছিনে।

উপরের থেকে নিচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকেল গাছ, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি তো ছোট দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সবকিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল পুকুর, ধান-ক্ষেত আর রেল-লাইন দেখে। ঠিক পাখির মতো প্লেনও একবার গা-ঝাড়া দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নিচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

www.pathagar.com

জয় মা-গঙ্গা! অপরাধ নিও না মা, তোমাকে পবননন্দন পদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা তো এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আর তার উপর শুয়ে আছে অগুনতি খুদে খুদে মানওয়ারি জাহাজ, মহাজনি নৌকা— আর পানসি-ডিঙির তো লেখাজোখা নেই। এতদিন এদের পাড় থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কী এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কী দেখি— ' এই যে ছোট ছোট আণ্ডা-বাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য! এদের মতো হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পার।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়ল মা-গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এপার ওপার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু এ আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে।

সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কী সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের— রুদ্রের মুখের দিকে তাকাচ্ছি; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য! কিন্তু এ আমি সইব কী করে? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষণ, আমি উপনিষদের জ্যোতিদ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলব—

'হে পূষণ্, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ কর, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল— হয়তো প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে— এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন, আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরীরা শুধু তাদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা তো রয়েছেন! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পূষণের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, তাই বলেছেন :

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গী দল
রক্ত-আঁখি!'

অস্ট্রিচ পাখি যেরকম ভয় পেয়ে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম— এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যার, স্যার!' এ কী জ্বালা। চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রেতে করে সামনে লজেঞ্জুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি লজেঞ্জুস! লাল, নীল, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা

www.pathagar.com

করছে নাকি— আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী— আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্জুস! তার পর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন, এইটে দোলাও দেখিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইন— আর— বাঁয়ে।'

এদিকে প্রকৃতির রসরঙ্গ, ওদিকে লজেঞ্জুসের রস। আমি মহাবিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা আচ্ছা গবেট তো! শুধালে 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস, অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো।' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশিরভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্জুস নিল এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে ওদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ওই বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায় মালুম।

ও মা, ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙল। ওকে তো আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে :

> 'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
> তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে
> ও-পারে??'

ভাষা ও জনসংযোগ

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দোল সংখ্যায় (১৯৫৩) শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন 'বাংলা-সাহিত্যের অতীত এবং ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত এবং বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। হিন্দি ইংরেজি বনাম বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কৌতূহলী, তাঁদের সকলকে আমি এই প্রবন্ধটা পড়তে অনুরোধ করি— তাঁরা লাভবান হবেন।

আমার আলোচনায় জানা-অজানাতে প্রবোধচন্দ্রের অনেক যুক্তি এসে গিয়েছে এবং আসবে। প্রবোধচন্দ্র না হয়ে অন্য কোনও কাঁচা লেখক হলে আমি আমার লেখাতে পদে পদে তাঁর উদ্ধৃতির ঋণ স্বীকার করতুম— কিন্তু এঁর বেলা সেটার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রবোধবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা যেন তাঁর ন্যায্য হক পায় এবং সেই হক সপ্রমাণ করার জন্য কে তাঁর লেখা থেকে কতখানি সাহায্য পেল, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং আমার বিশ্বাস, দরকার হলে তিনিও অন্য লেখকের রচনা থেকে যুক্তি-তর্ক আহরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার লেখা তাঁকে সাহায্য না-ই করল।

প্রাচ্যে যে বড় বড় আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, সেসব আন্দোলন শুধু যে তার জন্মভূমিতেই সফল হয়েছে তাই নয়, তার ঢেউ পশ্চিমকেও তার সুপ্তিতে জাগরণ এনে দিয়েছে, সেসব আন্দোলনকে আমরা সচরাচর ধর্মের পর্যায়ে ফেলে নবধর্মের অভ্যুদয় নাম দিয়ে থাকি। ভারতবর্ষে তাই বৌদ্ধ ও জৈনদের দুই বৃহৎ আন্দোলনকে আমরা ধর্মের আখ্যা দিয়েছি; সেমিতি ভূমিতে ঠিক ওই রকমই দুই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি জোরালো আন্দোলন সৃষ্ট হয়— তাদের নাম খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম।

www.pathagar.com

আজকের দিনে ধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুঝি, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। পূজা-অর্চনা কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন ধ্যানাদি করে, কী করে ভগবানকে পাওয়া যায় ধর্ম সেই পন্থা দেখিয়ে দেয়, এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একটুখানি ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি চেষ্টা করেছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধ-আতুরের আশ্রয় নির্মাণ করাতে— এক কথায়, এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে মানুষ মাৎস্যন্যায় বর্জন করে, একে অন্যের সহযোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম এইসব কাজেই মনোযোগ করেছে বেশি— ভগবানের সান্নিধ্য এবং তার সাহায্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে।

বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের সংখ্যা সংসারে সবসময়েই কম ছিল বলে বড় আন্দোলনকারী মাত্রই এদের উপেক্ষা করে জনগণকে কাছে আনতে— এমনকি 'খেপিয়ে তুলতে'— চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। তাই তাঁরা বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের ভাষা উপেক্ষা করে যে-ভাষার কথা বলেছেন, সেটা জনগণের ভাষা। তথাগতের ভাষা তৎকালীন গ্রাম্য ভাষা পালি এবং মহাবীরের ভাষা অর্ধ-মাগধী, খ্রিস্টের ভাষা হিব্রুর গ্রাম্য সংস্করণ, আরামেয়িক এবং মুহম্মদের (দ.) ভাষা আরবি। আরবি সে-যুগে এতই অনাদৃত ছিল যে, আরবেরাই আশ্চর্য হল, এ ভাষায় আল্লাহ তাঁর কুরআন প্রকাশ (অবতরণ= নাজিল) করলেন কেন? তারই উত্তর কুরআনে রয়েছে—

আল্লাহ বলেছেন :

"Had we sent as
A Quaran (in a language)
Other than Arabic, they would
Have said : why are not
It's verses explained in detail
What! (a book) not in Arabic
And (a Messenger an Arab?)"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবি ভিন্ন অন্য কোনও ভাষাতে কুরআন পাঠাতুম, তা হলে তারা বলত, এর বাক্যগুলো ভালো করে বুঝিয়ে বলা হয়নি কেন? সে কী! বই আরবিতে নয় অথচ পয়গম্বর আরব?"

আল্লাহ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবি ভাষায় কুরআন অবতরণের ভাষা ব্যবহার করবেন সেই তো স্বাভাবিক, অন্য যে কোনও ভাষায় (এবং সে যুগে হিব্রু ছিল পণ্ডিতের ভাষা) সে কুরআন পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা তো এর অর্থ বুঝতে পারছিনে।'

গণ-আন্দোলন সবচেয়ে বড় কথা— আপামর জনসাধারণ যেন বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারে।

www.pathagar.com

তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চতুর্দিকে যে আন্দোলন গড়ে উঠল, তার ভাষা বাংলা, তুকারামের ভাষা মারাঠি (তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, সংস্কৃতই কেবল সাধুভাষা?— তবে কি মারাঠি চোরের ভাষা), কবীরের ভাষা সে-সময়ে প্রচলিত হিন্দি এবং তিনিও বলেছেন, "সংস্কৃত কূপজল (তার জন্য ব্যাকরণের দড়ি-লোটার প্রয়োজন) কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ চলিত ভাষা) 'বহতা' নীর— যখন খুশি ঝাঁপ দাও, শান্ত হবে শরীর।" রামমোহন, দয়ানন্দ আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, আর রামকৃষ্ণ যে বাংলা ব্যবহার করে গিয়েছেন, তার চেয়ে সোজা সরল বাংলা আজ পর্যন্ত কে বলতে পেরেছেন? এমনকি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর বিপক্ষ দলকে উপদেশ দিয়েছেন সংস্কৃত না লিখে বাংলায় উত্তর দিতে। তিনি নিজেও সংস্কৃত লেখেননি, যদিও তিনি সংস্কৃত জানতেন আর সকলের চেয়ে বেশি।

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পতনের অন্যতম কারণ সেদিনই জন্ম নিল, যেদিন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন। দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল; ওদিকে সংস্কৃতে শাস্ত্রচর্চা করতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য ঢের ঢের বেশি— বৌদ্ধ-জৈনদের হার মানতে হল।

পৃথিবীজুড়ে আরও বহু বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে— পণ্ডিতি ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মাতৃভাষার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে।

এইবারে নিবেদন ইতিহাস আলোচনা করে দেখান তো পৃথিবীর কোথায় কোন মহান এবং বিরাট আন্দোলন হয়েছে জনগণের কথ্য এবং বোধ্য ভাষা বর্জন করে?

এ তত্ত্ব এতই সরল যে, এটাকে প্রমাণ করা কঠিন। স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

আটঘাট বেঁধে পূর্বেই প্রমাণ করেছি, এসব আন্দোলন নিছক ধর্মান্দোলন (অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মাজনিত) নয়; এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অংশ অনেক বেশি গুরুত্বব্যঞ্জক।

তাই ভারতবর্ষ এখন যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে এইসব আন্দোলনের পার্থক্য অতি সামান্য এবং তুচ্ছ। এই যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার সাফল্যের বৃহদংশ নির্ভর করবে জনগণের সহযোগিতার ওপর— এ কথা পরিকল্পনার কর্তাব্যক্তিরা বহুবার স্বীকার করেছেন এবং ক্রমেই বুঝতে পারছেন, উপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে কোনও দেশকে উন্নত করা যায় না— যদি নিচে থেকে জনগণের হৃদয়মন থেকে সাড়া না আসে, সহযোগিতা জেগে না ওঠে।

আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা, সর্ব অর্থব্যয়, সর্ব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি আমরা আমাদের সর্ব পরিকল্পনা সর্ব প্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের সম্মুখে প্রকাশ না করি। এ বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না, শুধু যাঁরা অন্তহীনকাল ধরে ইংরেজির সেবা করতে চান, তাঁরা ভারতের অগ্রগামী গতিকে মন্থর করে দেবেন মাত্র।

এ বিশ্বাস না থাকলে আমি বারবার নানা কথা এবং একাধিকবার একই কথা বলে বলে আপনাদের বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতুম না।

www.pathagar.com

ইংরেজি বনাম মাতৃভাষা

'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'-এ সুপণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'কম্পালসরি হিন্দি— ইট্‌স্ এফেক্‌ট্ অন্ এডুকেশন' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের পূর্বার্ধে তিনি দুটি প্রশ্ন জিগ্যেস করেছেন। প্রথমত, অ-হিন্দি অঞ্চলের আপন ভাষা— যথা বাংলা, মারাঠি, দক্ষিণি ভাষাগুলোর স্থান হিন্দি দখল করে নিয়ে যেসব অঞ্চলে একে অন্যের যোগসূত্রের এবং সাহিত্যে কলাসৃষ্টির মাধ্যম হতে পারবে কি? দ্বিতীয়ত, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতে আমরা যদি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি, তবে এটা কি কাম্য হবে যে, হিন্দি ইংরেজির জায়গা দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠুক?

নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে শ্রীযুত সরকার সপ্রমাণ করেছেন, বাংলা, মারাঠি ইত্যাদির স্থান হিন্দি কখনও দখল করতে পারবে না। আমরাও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন, ইংরেজির স্থলে হিন্দি কাম্য হতে পারে না। শ্রীযুত সরকার তাই ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারতবর্ষে ইংরেজিই চালু রাখতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ইংরেজিকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখতে চান— না হিন্দি, না বাংলা, এবং তাঁর লেখাতে তিনি এমন কোনও ইঙ্গিতও দেননি যে, আজ হোক কিংবা এক শ বছর পরেই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজিই অজরামররূপে চিরকাল আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকবে।

সরকার মহাশয় ইংরেজি ভাষার যে গুণকীর্তন করেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ইংরেজির মতো আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীতে আর নেই, অদ্যকার (বিশেষ জোর দিয়ে আমিও বলছি অদ্যকার) দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা করতে হলে ইংরেজি ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু ইংরেজি চিরকাল এদেশের শিক্ষার মাধ্যম, তথা উচ্চাঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা আমরা কাম্য বলে মনে করিনে।

এ কথা ঠিক যে, আজই যদি আমরা ইংরেজি বর্জন করি তবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু কোনওদিনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে বর্জন করতে পারব না একথা আমরা বিশ্বাস করিনে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচ্যদেশের অবস্থা আজ কী? আরব ভূখণ্ড বিশেষ করে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কি দিল্লি-কলকাতার চেয়ে অনেক কম? মিশরে জ্ঞানচর্চার মাধ্যম আরবি, ইংরেজি না ফরাসি? 'অজহর' মুসলিম শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থল— সেখানে যে আরবি মাধ্যম হবে, তাতে আর কী সন্দেহ। তাই সে দৃষ্টান্ত দেব না, কিন্তু ইয়োরোপীয় ঢঙে নির্মিত বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম তো ফরাসি নয়, ইংরেজিও নয়। অথচ তারা দিব্য আরবির মাধ্যমেই অ্যালোপ্যাথি, ইয়োরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিখছে, তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) আরবিতেই বেরোয়। বিদেশি অধ্যাপকদের আরবি শিখে সে-ভাষাতেই পড়াতে হয়।

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম ফরাসিস্? বা তেহরানে?

www.pathagar.com

এই যে চীনে এতবড় রাজনৈতিক ও সামাজিক নবজাগরণ হয়েছে সে কি রাশানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম করে? না, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশান শিক্ষার মাধ্যম, কিংবা চীনারা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা রাশান ভাষায় আরম্ভ করে দিয়েছেন? পণ্ডিতজি তাঁর চিন্তার ফল ইংরেজিতে প্রকাশ করেন, কিন্তু মাও সেতুঙ রাশানে কেতাব লিখেছেন, এ কথা তো কখনও শুনিনি।

জাপানে শিক্ষার মাধ্যম কি ইংরেজি? জাপানিদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেরোয় কোন ভাষায়?

শ্রীযুক্ত সরকার বলেছেন,— "Even in the Latin Republics of South America, English is fast advancing as the medium of commercial communication and displacing (except for 'petty purely local transactions') Portuguese and in some of the States corrupt Spanish by the people."

লাতিন আমেরিকা সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই, তাই 'পেটি প্যুরলি লোকাল ট্রানজ্যাকশনস্' বলতে শ্রীযুক্ত সরকার কী বলতে চেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি ওইসব অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি? এমন কথা তো কখনও শুনিনি— বরঞ্চ আমার ঠিক ঠিক জানা আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে, জর্মনির ইস্কুলে যারা লাতিন-গ্রিক পড়ত না তাদের বাধ্য হয়ে ইংরেজি, ফরাসি এবং স্প্যানিশের মধ্যে যে কোনও দুটো শিখতে হত এবং লাতিন আমেরিকায় ইংরেজির চেয়ে স্প্যানিশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো চলবে এ তত্ত্ব জানা থাকায় বহু ছেলেমেয়ে স্প্যানিশ শিখত।

লাতিন আমেরিকা অনেক দূরের পাল্লা— এবারে ইংলন্ডের খুব কাছে চলে আসা যাক— ইংরেজি ভাষার গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসেবে যারা সবচাইতে বেশি জানে এবং বোঝে। এরা সংখ্যায় খুব নগণ্য তবু ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করে নেয়নি। হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি, না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে ইংরেজিতে? এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ একটা বড় হিস্যা ইংলন্ডের সঙ্গে, কিন্তু কই, তারাও তো তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য করেনি? আজকের দিনের সঠিক খবর বলতে পারব না, তবে যতদূর জানা আছে, যারা উচ্চশিক্ষাভিলাষী তাদের হয় শিখতে হয় লাতিন-গ্রিক, নয় ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, স্প্যানিশ ইত্যাদির যে-কোনও দুটো ভাষা।

এখন প্রশ্ন, যারা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি কিংবা দুটি ভাষা শেখে তাদের জ্ঞানগম্যি ওসব ভাষাতে কতখানি হয়? পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না, তাঁদের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। জর্মন পণ্ডিতমাত্রই ক্লাসিক্স্ এবং ফরাসি, ইংরেজি, ইতালীয় পড়ে বুঝতে পারেন, ইংরেজ পণ্ডিতদের বেশিরভাগ ফরাসি-জর্মন পড়তে পারেন— বিশেষ করে যাঁরা অর্থনীতির চর্চা করবেন তাঁদের মাসিক পত্রিকায় জমবার্ট, শুমপেটার পড়ার জন্য বাধ্য হয়ে জর্মন শিখতে হত। অ্যাটম-বমের গবেষণা করেছেন আমেরিকাতে বসে জর্মনরাই, কিংবা যাঁরা জর্মন জানতেন।

কিন্তু ইয়োরোপে আর যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখে, ইস্কুল-কলেজ ছাড়ার পর তারা ওই ভাষাতে জ্ঞান-চর্চা করে কতটুকু? উচ্চশিক্ষিত ইংরেজমাত্রই অন্তত আট বছর ফরাসি শেখেন— কিন্তু কলেজ ছাড়ার বছর পাঁচেক পরই এঁরা আর ফরাসি বই কেনেন না।

www.pathagar.com

আমি এঁদের বাড়ির কেতাবের শেল্‌ফ্ মনোযোগ করে দেখেছি— পাঠ্যাবস্থায় যেসব ফরাসি বই তাঁরা কিনেছিলেন তার ওপর আর কিছু কিনবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এঁদের 'দ্বিতীয় ভাষা' সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে সে সম্বন্ধে জেরম কে জেরমের ঠাট্টা-মস্করা পড়ে দেখবেন।

বস্তুত বহু গবেষণা করে শিক্ষকগণ এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতেই এসেছেন যে, মানুষকে ব্যাপকভাবে দোভাষী করা যায় না। গোলামদের কথা আলাদা। তারা যখন দেখে অর্থাগমের একমাত্র পন্থা মুনিবের ভাষা শেখা তখন সবকিছু বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ভাষা শেখে— আমি যেরকম শিখেছিলুম, ফলে আজ না পারি উত্তম বাংলা বলতে, না পারি মধ্যম ইংরেজি লিখতে। কিন্তু আমার ছেলে গোলাম নয়— আমার আশা সে একদিন বাংলাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। আমার ছেলে না পারুক, যদি আপনার ছেলে পারে তাতেই আমি খুশি এবং যদি সেদিন তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ-ফরাসি আপন আপন মাতৃভাষাতে তার কেতাব অনুবাদ করে— আজ যেরকম মাও সেতুঙের চীনা বই বেরুনোমাত্রই ইংরেজ গায়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ব-ভাষায় তার অনুবাদ করে, এখনও যেরকম ইংরেজ 'শকুন্তলা' নাট্যের অনুবাদ করে— তবে আমি অমর্ত-লোক থেকে তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব। অনন্তকাল ধরে আমরা শুধু ইংরেজি থেকে নেবই, কিছু দেবার সময় কখনও আমাদের আসবে না, এ-কথা ভাবতেও আমার মন বিরূপ হয়।

তবে কি বাংলাভাষী লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম যে, আমরা কখনও বাংলাকে ফরাসি কিংবা জর্মনের মতো সমৃদ্ধিশালী করতে পারব না?

ভাষা		ভাষীদের সংখ্যা (হাজার সমষ্টিতে)
বাংলা	...	৬০০০০
আরবি	...	২৫০০০
চীন	...	৪৩০০০০
গ্রিক	...	৫৫০০
জাপানি	...	৫৫০০০
জর্মন	...	৮০০০০
হিন্দুস্তানি (অর্থাৎ হিন্দি-উর্দু মিলিয়ে; না হলে সুদ্ধ হিন্দিভাষীর সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম)		৯০০০০
ওলন্দাজ	...	১০০০০
ইংরেজি	...	১৮০০০০
ফরাসি	...	৪৫০০০
রুশ	...	৮৫০০০
তুর্কি	...	৭০০০

এবারে ভাষার ভিত্তিতে না নিয়ে লোকসংখ্যা নিন; কারণ, যে বর্ষপঞ্জি থেকে এই সংখ্যাগুলো পেয়েছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরইউজিয়ন, সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ভাষীর সংখ্যা দেওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

নরওয়ে	...	২৯৫২
ডেনমার্ক	...	৩৯৭৩
ফিনল্যান্ড	...	৩৭৩৪

আমার যতদূর মনে পড়ছে, চীনা, ইংরেজি, রুশীয়, জর্মন এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।

নরওয়ে, সুইডেন তাদের ২৯,৫২; ৬৫,২৩ নিয়ে আপন আপন ভাষায় দর্শন লেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ডাক্তারি শেখে, ইঞ্জিনিয়ারি করে আর আমরা ৬০,০০০ হয়েও চিরকাল ইংরেজির ধামাধরা হয়ে থাকব?

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি আমরা কল্পনা করতে পারিনি, ফার্সি যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে আমরা রাজকার্য চালাব কী করে! ইংরেজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ইংরেজিতেও চালানো যায়। আজ আমরা কল্পনা করতে পারছিনে, ইংরেজি ছেড়ে আমরা যাব কোথায়?

কিন্তু অধমের বক্তব্য এইখানেই শেষ নয়।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, পণ্ডিতজনের মতের বিরুদ্ধে যেও না, কারণ পণ্ডিতের জ্ঞান আছে, তোমার নেই।

তবে কি মূর্খের বিরুদ্ধে মতানৈক্য প্রকাশ করব? সে তো আরও ভয়ঙ্কর। আমার আপন অজানাতে যেসব অসিদ্ধ যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করব, যেসব ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করব, মূর্খ অজ্ঞতাবশত সেগুলো মেনে নিয়ে আমাকে আরও বিপদে ফেলবে।

তাই আমি শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গেই মতানৈক্য প্রকাশ করছি। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ এবং সুপণ্ডিত; আমার মতো অর্বাচীনের যুক্তি-তর্কে, বিশেষত ঐতিহাসিক নজির পেশ করার সময় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তবে তিনি সেগুলো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করে দেবেন। বাঘা টেনিস-খেলোয়াড় টিল্‌ডেনও বলেছেন, 'সবসময় তোমার চেয়ে ভালো খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবে— না হলে খেলাতে তোমার কখনও উন্নতি হবে না।' ইতিহাসে শ্রীযুত সরকার ভুবন-বিখ্যাত— তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হয়ে আমিই লাভবান হব।

ইংরেজি ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার দেখে আমরা আজ কিছুতেই কল্পনা করতে পারিনে, এ-ভাষা বাদ দিয়ে আমরা চলব কী করে? বাংলায় এরকম ভাণ্ডার নির্মাণ করব কী প্রকারে?

ইতিহাস বলেন, একদা ইয়োরোপের সর্বত্র জ্ঞানচর্চা হত লাতিনের মাধ্যমে। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মনের নামও তখন কেউ মুখে আনত না। ওইসব অপোগণ্ড অর্বাচীন ভাষা যে কখনও জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হতে পারে একথা কেউ বললে তখন নিশ্চয়ই তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হত, কিংবা ডাইনি 'ভর করেছে' ভেবে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত। অথচ এমন দিনও এল যখন ফ্রান্সের লোক লাতিন বর্জন করে ফরাসি ভাষাকেই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম বলে মেনে নিল। জর্মনি তখনও শিক্ষাদীক্ষায় ফ্রান্সের অনেক পিছনে, তাই জর্মন রাজা-রাজড়া, নবাব-সুবেদাররা উত্তম ফরাসি-চর্চা করাটাই জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কাচ্চা-বাচ্চাদের পর্যন্ত ফরাসি 'পার্লিয়েরেন' ('স্প্রেয়েন' ক্রিয়া খাঁটি জর্মন, তার অর্থ 'কথা বলা' কিন্তু জর্মনরা তখন অনুকরণে এমনি মত্ত যে ফরাসি 'পার্লে' ক্রিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে— তুলনা দিয়ে বলি, আমি ছেলেবেলা থেকে ইংলিশ 'স্পিক' করে আসছি) করতে শেখানো হত এবং জর্মন ভাষাটাকে চাকরবাকরের ভাষা (গ্রেজিন্‌ডে-স্প্রাখে) বলে গণ্য করা হত। ফ্রিডরিক দি গ্রেট মাতৃভাষা জর্মনকে হেয় জ্ঞান করে ফরাসিতে কবিতা লিখতেন এবং সেই রদ্দি কবিতা মেরামত করতে গিয়ে গুণী ভলতেয়ারের নাভিশ্বাস উঠত।

তার পর একদিন ফরাসি নিজের থেকেই ব্যাঙাচির ন্যাজের মতো খসে পড়ল। জর্মনই জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হয়ে গেল।

তার পর জর্মন এল ইংরেজির আওতায়। শ্রীযুত যদুনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন—

"The late German Emperor, Wilhelm II, before world-war No. I, had made English a *compulsory* second language in all the secondary schools of his Empire. Was that a sign of his slavery to the British people? No, like a shrewd practical politician he felt that this was the best way of promoting Germany's trade all over the world." (*Hindusthan Standard*, Feb. 1st, '53.)

এবার দেখা যাক এই ইংরেজির প্রভাব খোদ জর্মনরা পরবর্তী যুগে কী চোখে দেখেছে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত য়োহান ভিসনার 'জর্মন-ভাষা শিক্ষা' ('ডয়েচশে স্প্রাখলোরে') নামক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এ পুস্তিকা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির শিক্ষা-বিভাগ (কুলটুস্‌ মিনিস্টেরিয়ুমের) কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচন করেন।

জর্মনের ওপর লাতিন, ফরাসি তথা ইংরেজির প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভিসনার যা বলেছেন সেটি আমি তুলে দিচ্ছি। অনুবাদের সঙ্গে মূল জর্মন এখানে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, অনুবাদে কোনও ভুল থাকলে গুণী পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবেন। (ডবল স্পেস-ওলা শব্দগুলো ইংরেজি— পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি)।

Dem 19 Jhdt war es vorbehalten, unser Deutsch mit englischen Woertern xu ueberfluten. Die weit verbreitete, Kenntnis der englischen Weltsprache, dazu der maechtige Einfluss englischer Sitte und Mode bewirkten, dass der deutsche G e n t l e m a n m S m o k i n g oder S w a t e r wenlgstens bis zum Weltkriege den Dnglaender ebenso nachaeffte wie frueher der deutsche Cavalier den Franzosen, Jede kneipe bis dahin warein B a r, jedes Dampfschiff ein S t e a m e r. jeder. Fahrstuhl ein L i f t (mit einen L i f t b o y) jede Fuellfeder eine F o u n t a i n-p e n. jeder Fuenfuhr-Tee ein F i v e o'c l o c k t e a. Deutsche Fbrikanten schrieben auf ihre fuer Deutschland bestimmten Erzeugnisse k o h -i-n o o r m a d e b y L. & C. H a r d m u t h i n A u s t r i a, B r i t i s h g r a p h i t e d r a w i n g p e n c i l, c o m p r e s s e d l e a d. Am ueppigsten wucherte das englische natuerlich auf dem Gebiete des S p o r t s;

www.pathagar.com

deutsehe Mittelschulen verdnstalten F o o t -b a l l m e e t i n g s und l a w n-t e n n i s-m a t c h e s wobci alles englisch war, auch das Zaehlen, nur nicht die Auesprache. Wie leichtfertin der Deutsche sein Volkstum vollends preisgibt, wenner mit dem Auslande in unmittelbare Beziehung tritt, sieht man an der g e m i x t e n Sprache des Deutsch-Amerikhaners; immer bissitg (busy), kauft sich dieser ein goldene W a t s h e n (w a t c h) s t a r t e t f o r h o m (geht nach Hause) und r i ng t die B e l l (laeutet die Glocke) order b e l l t (laeutet einfach)

— ভিসনার, *ডয়েচ্‌শে স্প্রাখলেরে*, পৃ. ৮৫।

"আর ঊনবিংশ শতাব্দী রইলেন আমাদের জর্মন ভাষা ইংরেজি শব্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার জন্য। বিশ্বভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রসার এবং ইংরেজি রীতিনীতির প্রভাব হওয়ার ফলে বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) না লাগা পর্যন্ত জর্মন Gentleman Smoking কিংবা Sweater পরে পরে বাঁদরের মতো ইংরেজের অনুকরণ করেছিল— একদা যেরকম জর্মন Cavalier ফরাসির অনুকরণ করেছিল। স্নাইপেকে বলা হত bar, ডামপফশিফকে বলা হত steamer, ফারস্টলকে lift (এবং তার ভেতরে থাকত lift-boy), ফ্যুলফেডারকে Fountain-pen, ফ্যুনফউরটিকে five O' clock tea. জর্মন কারখানাওয়ালারা জর্মনিরই জন্য নির্মিত মালের উপর লিখতেন, Koh-i-noor made by L. &. C. Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed lead. এই (শব্দের) আগাছা অবশ্য সবচেয়ে বেশি পল্লবিত হল Sports-এর জমিতে। জর্মন হাইস্কুলগুলো football meetings এবং Lawn-Tennis-matches-এর ব্যবস্থা করল এবং সেখানে সবই ইংরেজিতে চলত, এমনকি, সংখ্যা গোনা পর্যন্ত— একমাত্র উচ্চারণটি ছাড়া (লেখক ব্যঙ্গ করে ইঙ্গিত করেছেন— ওই কর্মটি সরল নয় বলেই)। বিদেশির সঙ্গে সোজা সংস্পর্শে এলে জর্মন কী অবহেলায় তার জাত্যাভিমান বর্জন করে তার উদাহরণ দেখা যায় তার খিচুড়ি জর্মন-মার্কিন ভাষাতে, 'বিজিক' (Busy) ঘড়ি কিনলে সেটা Watschen (Watch) startet for hom (বাড়ি রওনা দিল) এবং ringt die bell (ঘণ্টা বাজায়)— কিংবা শুধু belt (এখানে লেখক একটু রসিকতা করেছেন, শুদ্ধ জর্মনে belt অর্থ 'ঘেউ ঘেউ করা')।"

তার পর লেখক দুঃখ করেছেন যে, এই করে করে জর্মন ভাষা একটা জোব্বার মতো হয়ে উঠল যার সর্বাঙ্গে রঙিন তালি এবং সে তালির টুকরোগুলো নানা রঙের নানা জামা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া!

আমি অধ্যাপক ভিসনারের সঙ্গে ষোল আনা একমত নই। বাংলা এখনও অতি দুর্বল ভাষা; তাকে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচুর বিদেশি শব্দ নিতে হবে। আমি যে এই নাতিদীর্ঘ উদাহরণটি অতি কষ্টে নকল এবং অনুবাদ পেশ করলুম (ভুল করলুম, অ্যাদ্দিন বাজারে জোর ঢোল বাজিয়েছি, আমি খুব ভালো জর্মন জানি, এইবারে অনুবাদের বেলায় ধরা পড়ব) তার উদ্দেশ্য এই যে, জর্মন যদি সুসময়ে এই পাগলামি বন্ধ না করত তবে সে এতদিনে কথামালার চিত্রিতা গর্দভী হয়ে যেত।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমরা যদি অনন্তকাল ধরে ইংরেজিরই সেবা করি, তবে আমাদের বাংলাভাষাটি বিত্রিতা মর্কটী হয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু এতখানি লেখার পর আজ সকালের (রবিবারের) কাগজ এসে পৌঁছল। সে কাগজ পড়ে আমি উল্লাসে মুক্তকচ্ছ হয়ে নৃত্য করেছি। বাংলাভাষার প্রতি দরদী-জন মাত্রই খবরটি পড়ে উল্লসিত হবেন। খুলে কই।

আশা করি আমার পাঠকেরা বিজ্ঞানে শ্রীযুত সত্যেন বসু এবং শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যে কোনও প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। যেসব গুণী আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলজাত প্রশ্ন এক লহমায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন, তাঁরাই দেখছি, এই দুই পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হলেই মাথা নিচু করেন।

শ্রীযুত বসু বলেন (আমি খবরের কাগজ থেকে তুলে দিচ্ছি, সভাতে যাবার আমার অধিকার নেই— তাই প্রতিবেদনে ভুল থাকলে বসু মহাশয় যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন), কেউ কেউ এই ধারণা পোষণ করেন যে, অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিতেই হবে, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস (confident) যতদিন-না বাংলাতে বিজ্ঞানের চর্চা হয় ততদিন পশ্চিম বাঙলায় বিজ্ঞানের প্রসার হতেই পারবে না।

তাঁর বিশ্বাস বাংলাতেই প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ কিছুটা আছে, কিছুটা বানানো যেতে পারে, এবং বাদবাকি বিদেশি ভাষা থেকে নিতে কোনও সংকোচ করার প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা নির্মাণের সময় হয়ে গিয়েছে।

এরপর আর কী চাই? আমি যে জিনিস অন্ধভাবে অনুভব করেছি, আমার যেসব দরদী পাঠক আমার সঙ্গে এতদিন মোটামুটিভাবে একমত, তাঁরা কি এই দুই পণ্ডিতের উক্তি শুনে উল্লসিত হলেন না?

একটা জিনিসকে আমি বড্ড ডরাই, আপনাদের অনুমতি নিয়ে সেটি আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

গণআন্দোলন বাদ দিয়ে কোনও দেশেই কোনও বড় কাজ করা সম্ভব হয় না। যতদিন পর্যন্ত শুধু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই স্বরাজ-আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন ততদিন ইংরেজ আমাদের থোড়াই পরোয়া করেছিল, কিন্তু যখন ভারতের জনগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল— অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের ফলেই সম্ভবপর হল— তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হল। তাই, আবার বলছি, গণজাগরণ, গণআন্দোলনের শক্তিই আমাদের স্বরাজ এনে দিয়েছে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজ যদি ভারতীয় রাষ্ট্র তার স্বরাজ্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চায় তবে তার দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরাজ্যলাভ। রাজনৈতিক স্বরাজ্যের আপন মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্যের দিকটা ভুললে চলবে না— রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে আমাদের হাতে যে শক্তি এল তারই প্রয়োগ করে এখন আমাদের জয় করতে হবে অন্য সর্ব-স্বাধীনতা। এককথায় এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য, নবীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

আমরা ভাবি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য 'চাষাভুষো'কে 'খ্যাপাবার' দরকার ছিল; এখন যখন স্বরাজ হয়ে গিয়েছে, তখন এদের দিয়ে আর কোনও দরকার নেই, এরা ফিরে যাক ক্ষেতে-খামারে, ফলাক ধানচাল, আর মধ্যবিত্তশ্রেণি, আমরা শহরে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করব আর তাই দিয়ে নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলব! তাই আমরা সে-চর্চা ইংরেজিতে করব, বাংলায় করব, না বান্টু ভাষায় করব তাতে কিছু আসে-যায় না, আমরা বুঝতে পারলেই হল, ওরা ওদের কম-জোর মাতৃভাষা নিয়ে পড়ে থাক। ভাবতেই আমার সর্বাঙ্গ ঘেন্নায় রী রী করে ওঠে।

বহু দেশ ভ্রমণ করে, বহু গুণীর সাহচর্যে এসে, আপন মনে নির্জনে বসে বহু তোলপাড় করে আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, এ বড় ভুল ধারণা, এ অতি মারাত্মক বিশ্বাস। আমার মনে আজ কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না। আমি আমার সহৃদয় পাঠক-সম্প্রদায়কে কখনও কোনও তত্ত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্থাপন করতে অনুরোধ করিনি— তার পক্ষে, স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক পেশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছি— কিন্তু আজ যুক্তিতর্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করেও বলছি, সাহস দিচ্ছি, জনগণের ভেতর বিশ্বাস অনুপ্রাণিত করুন, তাদের সহযোগিতা আহ্বান করুন— আপনারা লাভবান হবেন। এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

এখন প্রশ্ন জনগণের সহযোগিতা, জনগণমন আমরা জয় করব কী প্রকারে?

বিদেশি প্রবাদ : সব লোককে কিছুদিন ঠকাতে পার, কিছু লোককে সব দিন ঠকাতে পার, কিন্তু সব লোককে সব দিন ঠকাতে পারবে না। আমাদের অধঃপতনের যুগে আমাদের সব লোককে— অর্থাৎ জনগণকে— আমরা অন্ধানুকরণ করতে শিখিয়েছিলুম, কিন্তু আজ আর সে কর্ম সম্ভবপর নয়। আমরা চাইও না। আজ আমরা চাই, জনগণ যেন আমাদের আদর্শ বুঝতে পেরে, সেই মর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণে আমাদের সহায়তা করে।

তাই প্রশ্ন, জনগণ আমাদের আদর্শ বুঝবে কী প্রকারে? আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করে যদি তাবৎ বস্তু ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করে সপ্রমাণ করি, আমাদের পক্ষে এই কর্ম কাম্য, আমাদের পক্ষে ওই নীতি প্রয়োজনীয়, আমাদের পক্ষে আরেক পন্থা সুধর্ম, তবে তারা এ-সব বুঝবে কী করে?

চট করে আপনি উত্তর দেবেন, মাতৃভাষাতে লিখলেই কি তারা সবকিছু বুঝতে পারবে?

এর সদুত্তর দিতে হলে আপনাকে আবার একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ইউরোপে যেতে হবে।

ফ্রান্স, জর্মনি, হল্যান্ডে বেশিরভাগ লোক শিক্ষা সমাপন করে ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে। এবং ওদের ম্যাট্রিক আমাদের ম্যাট্রিকের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে তারা আর কিছু শিখুক আর না-ই শিখুক, মাতৃভাষাটা অতি উত্তমরূপে শেখে। তার পর টাকা-পয়সা রোজগারের ধান্ধার ভেতর কেউ করে সাহিত্যের চর্চা, কেউ করে ইতিহাসের, কেউ দর্শনের— ইত্যাদি। এবং তাই প্রায়ই দেখা যায়, বহু সুসাহিত্যিক উত্তম উত্তম পুস্তক লিখে যাচ্ছেন অথচ তাঁরা শুধুমাত্র ম্যাট্রিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়াননি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই ধরনের— রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ধরনের। কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্র-শরতের গোষ্ঠী বৃহত্তর।

www.pathagar.com

এ তো হল সৃষ্টিকর্ম— এ অনেক কঠিন কাজ— এর চেয়ে অনেক সোজা, বই পড়ে বোঝা এবং সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সুসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক অধ্যয়ন করে করে দেশের উচ্চতম আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। এ জিনিসটি ইয়োরোপে অহরহ হচ্ছে এবং তাই ইয়োরোপের যেকোনো দেশে গুণীজ্ঞানী যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই পাওয়া যায় তা নয়, জনসাধারণের ভেতরেও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় যাঁরা অনায়াসে অধ্যাপকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

আমাদের দেশের বাংলা দৈনিকগুলো যে ইংরেজির তুলনায় পিছিয়ে আছে সেকথা আমরা সবাই জানি, তবুও দেখেছি, একমাত্র 'আনন্দবাজার'-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালি অনেক সময় ওই মারফতে এতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে যে, ইংরেজি-জাননেওলা শহুরেকে তর্কে কাবু করে আনতে পারে।

আমার তখন বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা ইংরেজিতে না লিখে যদি বাংলা কাগজে লিখতেন, তবে আমার গাঁয়ের পড়ুয়া জ্ঞান-লোকে আরও কত দিগ্বিজয় করতে পারত।

মিল্টন বলেছেন :

'ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে চায় এরা কে দেবে এদের খাদ্য!'

আমাদের পণ্ডিতেরা এতদিন এদের বঞ্চিত রেখেছেন; স্বরাজ পাওয়ার পরও এঁরা তাদের জন্য কিছু করতে চান না। (আমি অবশ্য এঁদের দোষ দিইনে— এঁদের কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী— কিন্তু এঁরা অন্য যুগের লোক, ইংরেজি লেখাতে তাঁরা এত অভ্যস্ত যে, আজ বাংলা লিখতে এঁদের সত্যই কষ্ট হয়।)

মুসলমানেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন সেকথা আমরা জানি, ক্রিশ্চান মিশনারিরাও তাই করেছিলেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, মুসলমানরা ফার্সি এবং ইংরেজ ইংরেজিকেই সম্মানের স্থান দিয়েছিল। ফলে মুসলমান-যুগে যাঁরা ফার্সি জানতেন তাঁরা ছিলেন 'শরীফ' অর্থাৎ 'ভদ্র' আর ব্রিটিশ যুগে (বলা উচিত 'ক্রিশ্চান যুগে' কারণ ভারতের ইতিহাসের প্রথম দুই যুগ যদি 'হিন্দু পিরিয়ড' এবং 'মুসলিম পিরিয়ড' হয়, তবে তৃতীয় যুগ 'ক্রিশ্চান পিরিয়ড' হবে না কেন?— এ তত্ত্বটির প্রতি আমার ক্ষীণদৃষ্টি জ্যোতিষ্মান করেছেন ছন্দ-সম্রাট শ্রীপ্রবোধ সেন) যাঁরা ইংরেজি জানতেন, তাঁরা ছিলেন 'ভডরোলোগ্ ক্লাস', অর্থাৎ 'শরীফ' অর্থাৎ 'ভদ্র'।

অথচ, ভদ্র, 'ভদ্র' বলতে আমরা আবহমানকাল এমন কিছু বুঝেছি যার সঙ্গে ফার্সি কিংবা ইংরেজি জানা-না-জানার কোনও সম্পর্ক নেই।

মুসলমান-যুগে বরঞ্চ ভদ্রে-গ্রাম্যে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল, কারণ মুসলমান-যুগে আমাদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্য, অর্থাৎ জনপদ সভ্যতা; কিন্তু ক্রিশ্চান আমলে সভ্যতা ইংরেজি-অভিজ্ঞ এবং ইংরেজি-অনভিজ্ঞের মাঝখানে এমনি এক বিরাট, নিরেট পাঁচিল তুলে দিল যে, আজও আমরা সে দেয়াল ভাঙতে পারিনি, এবং ভাঙবার চেষ্টা করতে চাইনে। আমরা এখন ইংরেজি-জাননেওলা আর ইংরেজি-না-জাননেওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর, অচলায়তন খাড়া রাখতে চাই।

এই ব্যবস্থাটাকেই আমি ডরাই, বড্ড ডরাই। এ ব্যবস্থা মেনে নিলে আপনারা একদিন আবার পরাধীন হবেন। সেকথা আরেক দিন হবে।

www.pathagar.com

টুকিটাকি

দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায়?

দাবা খেলার ইতিহাস সম্পর্কে নানা মুনি নানা কথা কয়ে থাকেন। দাবার শেষের দিকের ইতিহাস সুস্পষ্ট এবং যেখানে তর্কাতর্কির অবকাশ নেই। ইরান জয় করার পরে আরবরা সেদেশে প্রথম দাবা খেলা শেখে। সকলেই জানেন, কোনও খেলা সম্পূর্ণ আপন করে নেওয়ার পরও তার মূল পরিভাষা অনেক সময় আগাগোড়া পরিবর্তিত হয় না। তাই আরবরা ইরানি দাবা খেলা শেখার পরও দাবার রাজাকে ইরানি শব্দ 'শাহ্' (রাজা) দিয়ে চিহ্নিত করে, এবং 'তোমার শাহ্ বিপদে' বলার সময়, অর্থাৎ কিস্তি দেওয়ার সময় শুধু 'শাহ্' বলত।

এরপর ক্রুসেড লড়াইয়ের সময়ে বন্দি ইয়োরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে দাবা খেলা শেখে এবং তারাও কিস্তি দেওয়ার সময় 'শাহ' বলত। সেই 'শাহ্' লাতিনের ভেতর দিয়ে ইংরেজিতে রূপ নেয় 'শেক' এবং সর্বশেষ 'চেক্' রূপে (ব্রিটিশ 'এক্সচেকারে'র নাম ওই 'চেক্' থেকে এসেছে)।

কিস্তিমাতের 'মাত' কথাটা ওইভাবেই আরবি 'শাহ্ মাতা' অর্থাৎ 'তোমার রাজা মারা গিয়েছে' ইংরেজিতে রূপ নিয়েছে 'চেক মেট' হয়ে।

এখন প্রশ্ন, ইরানিরা দাবা খেলা শিখল কার কাছ থেকে? দাবা ইরানি খেলা এ দাবি পারস্যদেশে কখনও করা হয়নি। বরঞ্চ সে দেশে কিংবদন্তী প্রচলিত যে, এ খেলা 'পঞ্চতন্ত্র' পুস্তকের মতো ভারতবর্ষ থেকে ইরানে গিয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে গজনীর পণ্ডিত আল-বিরুনি তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে দাবা খেলার ছক এঁকে দিয়েছেন ও ঘুঁটির বর্ণনা করেছেন। তবে আজকের দাবা আর সে দাবার পার্থক্য প্রচুর। তখনকার দিনে দাবা খেলা হত চারজনে— ছকের চারকোণে চার খেলোয়াড় আপন আপন ঘুঁটি নিয়ে বসতেন এবং চালও দিতে হত পাশা (ডাইস বা অক্ষ) ফেলে।

তাই নিয়ে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আজ ভারতীয় দাবা ও বিলিতি দাবা হুবহু এক খেলা নয়।

কাজেই সম্পূর্ণ নতুন কোনও প্রমাণ উপস্থিত না হলে ভারতবর্ষ যে দাবা খেলার জন্মভূমি তা নিয়ে তর্ক করবার কোনও কারণ নেই।

খেলাচ্ছলে

কিছুকাল আগে পার্লিমেন্টে জনৈক সদস্য যে প্রশ্ন শুধান তার সারমর্ম এই :

হেলসিন্কিতে যে ওলিম্পিক খেলা হয় সেখানে খেলার শেষে যখন সব দেশ আপন আপন জাতীয় পতাকা নিয়ে পরিক্রমা করে তখন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য কোনও ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে নাকি এক ফিন যুবক ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

www.pathagar.com

প্রশ্নকর্তা কোনও কোনও ভারতীয়কে এই ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দাও করেন।

উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, তিনিও এইরকম কথা শুনেছেন।

আমাদের মনে হয়, এর একটা কড়া তদন্ত হওয়া উচিত।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতীয়রা অন্যান্য জাতির তুলনায় অভদ্র নয়। এককালে ভারতীয় সৌজন্য-শালীনতা বিদেশি বহু পর্যটককে মুগ্ধ করেছিল বলে তাঁরা তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে ভারতবাসীদের উদ্দেশে বিস্তর প্রশস্তি গেয়ে গিয়েছেন। মেগাস্তেনেস থেকে এ ইতিহাস আরম্ভ হয় এবং যদিও কোনও লেখক আমাদের কোনও কোনও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু আমরা অভদ্র, একথা কাউকে বড়-একটা বলতে শোনা যায়নি। বিদেশে ভারতীয়েরা আরও সাবধানে চলে বলে সেখানেও তারা প্রচুর খাতির যত্ন পায়।

তবে হঠাৎ আজ এরকম একটা পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটল কেন?

আমার মনে হয়, আমাদের টিমের কর্তাব্যক্তিরা পরবটার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন, কিংবা ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে যাচাই করতে পারেননি বলে সবাই মিলে রঙ্গভূমি ত্যাগ করে শহরে ফুর্তিফার্তি করতে চলে গিয়েছিলেন আর তাই চ্যাংড়ারাও যে চলে যাবে তাতে আর কী সন্দেহ!

কর্তারা শহরে বেড়াতে যাননি, চ্যাংড়াদের তাঁরা যেতে বারণ করলেন, তবু তারা বে-পরোয়া চলে গেল, একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এ টিমে যারা গিয়েছিল তাদের দু একজনকে আমি চিনি। পতাকা তোলার জন্য তাদের আদেশ করলে তারা নিশ্চয়ই, অতি অবশ্যই, শহরে চলে যেত না— সেখানে শেষ পর্বের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করত।

বিদেশে আপন দেশের পতাকা উত্তোলন করার জন্য নির্বাচিত হওয়া কি কম শ্লাঘার বিষয়?

কাজেই মুরুব্বিদের প্রশ্ন শোধানো উচিত, তাঁরা তখন ছিলেন কোথায়, তাঁরা কাকে কী আদেশ দিয়েছিলেন, কেউ সে আদেশ অমান্য করেছিল কি না?

এরই পিঠে-পিঠে সংবাদপত্রে আরেকটা খবর পড়লুম।

পার্লিমেন্টে যেদিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেদিনই শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশান ক্লাবে বক্তৃতা দেবার সময় বলেন, ভারতের খেলোয়াড়রা যখন বিদেশে খেলতে যান তখন তাঁরা প্রায়ই অভদ্র ভাষায় লেখা বেনামি চিঠি পান এবং তাঁরা যে মন না দিয়ে ফুর্তি ফার্তি আরাম-আয়েশ করে বিলেতে দিন কাটাচ্ছেন সে কটুবাক্যও চিঠিগুলোতে বর্ষিত থাকে।

গুপ্তমহাশয় বলেন, এ ধারণা ভুল এবং এ অভিযোগ কখনও সম্ভবপর হতে পারে না, কারণ প্রতি সপ্তাহে একনাগাড়ে ছ দিন জীবন-মরণ পণ করে খেলা প্র্যাকটিস করতে হয়, এ সময় ঢলাঢলির ('ইজি লাইফ') কথাই উঠতে পারে না।

এ অতি হক কথা— বিদেশে নানা শ্রেণির খেলোয়াড়দের সংস্রবে এসে আমারও ওই একই ধারণা হয়েছে। তবে সব অভিজ্ঞতারই আরেকটা সাবধান হওয়ার দিকও আছে, অর্থাৎ ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার রাশে ঢিল দেওয়া বিচক্ষণের কর্ম নয়।

এ সংসারে দুষ্টু লোকের অভাব নেই। দেশবিদেশের বহু জায়গায় এরা ওই সন্ধানে থাকে, খেলোয়াড়দের খেলার মাঠের বাইরে এমনভাবে বেকাবু করা যায় কি না, যাতে করে পরের দিন তারা ভালো করে খেলতে না পারে। তাই তারা খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং যে কদিন খেলা

www.pathagar.com

হচ্ছে সে-কদিন রোজ সন্ধ্যায় নেটিভ-স্টেট স্টাইলে জব্বর জব্বর ককটেল পার্টি দেয় এবং দেশবিদেশের এমন সব হোমরা-চোমরাদের নেমন্তন্ন করে যে, সেখানে বিদেশি খেলোয়াড়দের, ওদের সম্মান রক্ষার্থে ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়। তার পর নানা কায়দায়-কৌশলে খেলোয়াড়দের মদ খাওয়াবার চেষ্টা সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলে। যারা পালা-পর্বে নিতান্ত অল্প খায় তাদের নিস্তার নেই, আর যারা খেতে ভালোবাসে তারা অনেক সময় প্রলোভন সামলাতে পারে না। দলের ম্যানেজার এবং কাপ্তেন অবশ্য মুরগির মতো চিলের ছোঁ থেকে বাচ্চাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু অনেক সময় পেরে ওঠে না, তাই ওদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

কোনও কোনও সময় এমন প্রলোভনও রাখা হয় যে সম্বন্ধে লিখতে আমার বাধো বাধো ঠেকছে। ফার্সিতে বলে 'দানিশমন্দরা ইশারা বশ অস্ত'— অর্থাৎ বুদ্ধিমানকে ইশারাই যথেষ্ট।

ফলংঃ পরের দিন তারা এমন খেলা খেলে যে, দেখে মনে হয় এরা নিতান্তই খেলাধুলো করতে এসেছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আমার ভয় হয়তো অমূলক, হয়তো আমি খামখাই ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখছি, হয়তো আসলে ওটা কুমির নয়, ফুসকুড়ি, কিন্তু ওকিবহাল হওয়ার জন্য বলতে হয়,

সাবধানের মার নেই
(যদিও জানি
'মারেরও সাবধান নেই')।

মনে করুন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জাম সাহেব, ব্র্যাডম্যান, লারউড, অমরনাথ, অমর সিং, মুশতাক, ওয়াজির আলী এবং একমাত্র এঁদের মতো পয়লা নম্বরওয়ালারা যদি আজ ইহলোক পরলোক ছেড়ে দিল্লিতে একখানা সরেস ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আসেন, তবে আপনার মানসিক চাঞ্চল্যটা কীরকমের হয়?

স্বীকার করি, গেল শনিবার দিন এখানে 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড ও প্রেসিডেন্টস এস্টেট ক্লাবে'র যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়, তাতে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে এঁদের কোনও মহারথীই উপস্থিত হতে পারেননি। তাই বলেই যদি আপনারা ভাবেন খেলা উচ্চাঙ্গের হয়নি, তা হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' দিল্লির রীতিমতো পুরাদস্তুর কেউকেটা কাগজ, এবং রাষ্ট্রপতির আপন এস্টেট ক্লাবও তো আমাদের শ্লাঘার প্রতিষ্ঠান। অতএব বিবেচনা করুন, এ খেলার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কি অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধান করছিনে?

কিন্তু হায়, আমাদের দারুণ দুর্ভাগ্য, এ খেলার মল্লীনাথরূপে আপনাদের সমীপে কোনও নিবেদন করার উপায় আমার নেই। কারণ ও খেলাতে আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারিনি, যদিও আমার চিত্ত, হৃদয়, চৈতন্য, আত্মা, সর্ব অস্তিত্ব ওই খেলাতে উপস্থিত ছিল। দরদী পাঠক শুধাবেন, কেন উপস্থিত হতে পারনি?

অভিমান।

এই যে আমি 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে'র এত বড় অসম্ভ্রান্ত দৈনন্দিন পাঠক, ওই কাগজের গুণী কর্মচারীগণের সঙ্গে আমার বহু যুগের হৃদ্যতা, তাঁরা আমার মতো একটা ওস্তাদ ক্রিকেটিয়ারকে ওই পর্বের দিনে বেবাক ভুলে গেলেন। কেন, আমি কি রান্নাঘরের পিছনে

www.pathagar.com

বাতাবি নেবু দিয়ে ঘন ঘন সেঞ্চুরি করিনি? অবশ্য স্বীকার করি উইকেট ছিল না— কিন্তু উইকেট তো থাকে ক্লান্ত হলে বসবার জন্য, আমি তো ক্লান্ত হইনে।

ম্যাচ ড্র গেছে। যাবে না? আমাকে না নিলে!!

পিকনিকিয়া

গল্প শুনেছি, এক ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন এবং স্কট নাকি বারোয়ারি চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করে। কথা ছিল সবাই কিছু কিছু সঙ্গেই আনবেন। ইংরেজ আনল বেকন-আণ্ডা, ফরাসি এক বোতল শ্যাম্পেন, জর্মন এক ডজন সসেজ আর স্কট নিয়ে এল তার ভাইকে।

দিল্লিতে কিন্তু পিকনিকিয়ারা শুধু ভাইকে সঙ্গে আনেন না, আনেন ভাইয়ের শালী-শালাদের, তারা আনে তাদের কাকা-মামাদের এবং তারা ফের কাদের নিয়ে আসে তার হদিস এখনও পাইনি। সঙ্গে আনে ক্রিকেট, ফুটবল, গ্রামোফোন, পোর্টেবল রেডিও, মণ তিনেক পুরি, তদনুপাতের তরকারি এবং মাংস, গোলগাপ্পা (ফুচকা) এবং মিঠা পান।

এঁদের পীঠস্থল কুতুবমিনার, হাউজ-খাস এবং লোধি গার্ডেন্‌স্‌। পাঁচ-সাত জনের পিকনিক হেথা-হোথা ছড়ানো থাকলে যত না গোলমাল আর উপদ্রব হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি পীড়াদায়ক হয় এইসব পাইকিরি পিকনিকে। বেখেয়ালে থাকলে হঠাৎ যে কখন দুম্‌ করে ক্রিকেট-বলটা আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

এঁরা আনন্দ করুন, আমার তাতে কী আপত্তি, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ মরুভূমিসম দিল্লি শহরে এত তকলিফ বরদাস্ত করে বহুত মেহন্নত করে ঘাস গজানো হয়, তারই উপর যখন অত্যাচার চলে তখন আমার মতো শান্ত লোকেও এই দিল্লির শীতে উষ্ণ হয়ে ওঠে। লনে খোলা আগুন জ্বালানো বারণ, তাঁরা জ্বালাবেনই এবং চৌকিদার আপত্তি জানালে তাঁরা ঝগড়াকাজিয়া লাগিয়ে দেন। কিংবা দেখি, চৌকিদার আর কোনও আপত্তি করছে না, যেন সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রৌপ্যচক্র অস্বচ্ছ, তার ভেতর দিয়ে দেখবেই-বা কী করে!

তাই দিল্লিতে আগমনেচ্ছু রসিকজনকে সাবধান করি, যদি শান্ত সমাহিত চিত্তে স্থাপত্যানন্দ উপভোগ করতে চাও তবে রবির সকালে কদাচ কুতুব, হাউজ-খাস এবং লোধি উদ্যান দেখতে যেও না।

নিতান্তই যদি যেতে চাও তবে যেও সরযূকুণ্ডে। অতি চমৎকার স্থল এবং ভিড় নেই বললেও চলে ॥

সাহিত্যিকের মাতৃভাষা

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী তাঁর 'অজানা ভারতীয়ের আত্মজীবনী' লিখে দেশবিদেশে সুনাম (কারও কারও মতে কুনাম) অর্জন করেছেন। বইখানা পাঠ করবার সুযোগ— কিংবা কুযোগ— আমার এখনও হয়নি, তবে পুস্তকখানার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী, সেকথা আমি চৌধুরী মহাশয়ের

www.pathagar.com

নিজের মুখেই শুনেছি এবং তিনি তাঁর ভুবনবিখ্যাত পুস্তক থেকে গুটিকতক অধ্যায় আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। ওহ্! সে কী ইংরেজির বাহার— তার ভেতর কত ভাষা থেকে, কত কেতাব থেকে কত রকম-বেরকমের আলপনা, কত ব্যঙ্গ, কত হুঙ্কার, কত বাকচাতুরী— ছত্রে ছত্রে হাউই উড়ছে, পটকা ফাটছে— মূল বিষয়ের দিকে ধ্যান দেয় কার ঠাকুরদার সাধ্যি!

তা সে বইয়ের কথা যাক। ওরকম বই পড়ার বয়স আমার বহুকাল হল গেছে। এ ধরনের বই আনাতোল ফ্রাঁস কেন পড়েন না, তাঁকে জিগ্যেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সে বয়স গেছে, যখন মানুষ যা বোঝে না তাই ভালোবাসে।' 'আমি আলো ভালোবাসি।' নীরদ চৌধুরী যেরকম এ যুগের ভলতেয়ার, আম্মো এ যুগের ফ্রাঁস!!

শ্রীযুত চৌধুরী পত্রান্তরে একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি এককালে বাংলায় লিখতেন এবং ইচ্ছে করলেই বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন হতে পারতেন।

চৌধুরী মশাই মানুষ; তাঁরও নানা দোষ আছে। কিন্তু তিনি যে অত্যধিক বিনয়-ভারে অবনত একথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না।

ইংরেজি লেখক হিসেবে মি. চাওডরি কতখানি নাম করেছেন জানিনে— জানার প্রয়োজনও বোধ করিনি। বিবেচনা করি অ্যাদ্দিনে তিনি ল্যাম, রাসকিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি 'হেলায় লঙ্কা করিত জয়' শুনে আমার মনোরাজ্যে নানাপ্রকারের খণ্ড বিদ্রোহের সৃজন হয়েছে।

তাঁর বাংলা লেখা আমার কিছু কিছু পড়া আছে। বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সাধনা আমিও করেছি, যদিও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম হওয়ার চেষ্টায়, দিল্লি আমার জন্য এখনও বিলক্ষণ দূর অস্ত। তিনি কাঁচা বা নিকৃষ্ট বাংলা লিখতেন একথা আমি বলব না, কিন্তু তিনি যে কিট্‌সের মতো কোনও ভয়ঙ্কর অমৃতভাণ্ড নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নামেননি সে-কথাও আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।

তবে এ দম্ভ কেন? সোজা অর্থ কি এই নয়; ওহে বাঙালি গ—ভ-গণ, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সাহিত্যের যে এভারেস্টে উঠতে পারছ না, আমি ইচ্ছা করলে পবননন্দন পদ্ধতিতে এক লম্ফেই সেখানে উঠতে পারতুম।

দ্বিতীয়ত, ছোঃ, বাংলা আবার একটা সাহিত্য, তাতে আবার নাম করা! মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। নাম করতে হয় তো ইংরেজিই সই।

অর্থাৎ আপন মাতৃভাষাকেও তাচ্ছিল্য।

বৃথা তর্ক। আমি শুধু শেষে প্রশ্ন শুধাই— স্বজাতীয় লেখক, আপন আপন মাতৃভাষাকে তাচ্ছিল্য করে কে কবে সত্য বড় হয়েছে?

আসা-যাওয়া

পুব ও পশ্চিম দেশবাসীদের ভেতর মেলা মিল আর গরমিল দুই-ই রয়েছে বলে কেউ বলেন (কিপলিং), এ দুয়ে মিল অসম্ভব, আর তার বহু পূর্বে গ্যোটে বলে গিয়েছেন 'পুব পশ্চিম এখন আর আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না।'

www.pathagar.com

যেখানে কিপলিং, গ্যোটে, রবিঠাকুর, লিন্‌ য়ুটাং একমত হতে পারছেন না সেখানে আমি কথা কইতে যাব কোন সাহসে? যেখানে ফৈয়াজ খানে আর হীরু গাঙ্গুলিতে লড়াই লেগে গিয়েছে সেখানে আমি বেমক্কা বে-সমে হাততালি দিয়ে মরি আর কী?

তবু সামান্য একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

পশ্চিমের লোক এখনও কারও সঙ্গে কথা ঠিক না করে, অর্থাৎ পাকাপাকি এনগেজমেন্ট না করে দেখা করতে আসে না। এবং টম যদি ডিকের বাড়িতে কিংবা আপিসে আসতে চায় তবে ডিকের অনুমতি না নিয়ে কখনও আসবে না। কিন্তু, পশ্য, টম ডিকের অনুমতি নিয়ে এল বটে— কটার সময় ভেট হবে— কিন্তু সে যখন খুশি চেয়ার ছেড়ে বলতে পারে, 'তবে এখন চললুম'— তার জন্য ডিকের কোনও অনুমতি প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইয়োরোপে কারও বাড়িতে যাওয়াটা তার হাতে, বেরিয়ে আসাটা আপনার হাতে।

প্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই ব্যবস্থাটা উল্টো। আপনি যখন খুশি রায় মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। 'এই যে রায় সাহেব' বলে হুঙ্কার দিয়ে আপনি রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় ঢুকবেন, আর রায়ও 'এই যে চৌধুরীমশায়, আসতে আজ্ঞে হোক, বসতে আজ্ঞে হোক' বলে কোল-বালিশ আর হুঁকোর নলটা আপনার দিকে এগিয়ে দেবেন। আপনি বালিশটা জাবড়ে ধরে ফুরুৎ ফুরুৎ করে আলবোলায় দম টানতে টানতে মৃদু মৃদু পা দোলাতে থাকবেন।

কিন্তু যখন বলবেন 'এবারে উঠি?' তখন কিন্তু রায়ের পালা। আপনি যে দুম করে চলে আসবেন সেটি হচ্ছে না, সে অধিকার আপনার নেই। রায় বলবেন, 'আরে, বসুন, স্যার। এত তাড়া কিসের!' আপনার তখন জোর করে চলে আসাটা সখ্‌ৎ বে-আদবি।

এর গুহ্য কারণ, হয়তো আপনি বহুদিন পরে এসেছেন, হয়তো কাশীবাস সেরে ফিরেছেন, রায়-গৃহিণী খবর পেয়ে আপনার জন্য সিঙারা ভাজবার তোড়জোড় করেছেন, আপনি হট্‌ করে চলে এলে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন, অতএব আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে।

অর্থাৎ বিদায় নেবার বেলা আপনাকে অনুমতি নিতে হবে।

বিশেষ করে ইরান-আফগানিস্তানে এ নিয়ম অলজ্ঘ্য। ভেবেছেন কি, আপনার নামে গোটা পাঁচেক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখা হয়ে যাবে। মাহমুদকে নিয়ে ফিরদৌসির ব্যঙ্গ-কবিতা তার সামনে লজ্জায় বোরকা টানবে।

রুশ-দেশ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যিখানে। তাই তারা খানিকটে এদের মানে, খানিকটে ওদের মানে। শার্ট তারা সায়েবদের মতো পাতলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু তারা যখন আপন 'ন্যাশনাল ব্লাউস' জাতীয় কুর্তা পরে, তখন সেটা আমাদেরই পাঞ্জাবির মতো সামনে পিছনে ঝুলিয়ে দেয়।

তারা দেখা করতে আসে খবর দিয়ে, না দিয়ে, দুই-ই। বিদেয় নেবার সময় তারা কিন্তু তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করে। গাল-গল্পের মাঝে একটুখানি মোকা পেলে বলে, 'এইবার ভাই, তোমার সঙ্গে আরেকটি পাপিরসি খেয়ে বাড়ি যাব।'

এ বড় উত্তম পন্থা। আন্তোন যদি ভ্যাচোর ভ্যাচোর করে আপনার প্রাণ এতক্ষণ অতিষ্ঠ করে তুলে থাকে, তবে আপনি তদ্দণ্ডেই উল্লসিত হয়ে উঠবেন, 'যাক, লক্ষ্মীছাড়াটা তা হলে আর বেশি ভোগাবে না।' আপনার তখন উপেক্ষার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে খুশি মুখে দু চারটি

www.pathagar.com

কথা বলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে আন্তোন যদি আপনার দিলের দোস্ত হয় তবে আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনাটার জন্য আপনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিতে পারবেন।

এবং দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপে দেখা হওয়ামাত্রই প্রথম প্রয়োজনীয় কথা পাড়া হয়, পরে গাল-গল্প। প্রাচ্য দেশে তার উল্টো— পাঁচটি টাকা ধার চাইবার হলে বিদেয় নিয়ে দোরের গোড়ায় এসে তখন আমতা আমতা করে চাইতে হয়, বাড়িতে ঢুকেই হুঙ্কার দিয়ে নয়।

রুশ দেশে ওই শেষ সিগারেটের সময় যা কিছু 'বিজিনেস talk' এবং শিবরাম চক্রবর্তী অনু pun এ 'টক বিজিনেস' ॥

দেহলি-প্রান্ত

দিল্লি ছাড়ার সময় আমার ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণজন দিল্লিতে বেশিদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয়-মুখো রওনা দেন। এমনকি সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকেনি।

তবে কি যাঁরা এখানে পড়ে থেকে শেষটায় শিব হয়ে যান, তাঁরা অবিবেচক? আদপেই না। এই দুশমনের ভূমি, গরমে শিককাবাব-বানানেওলা, শীতে কুলফি-জমানেওলা, সেক্রেটারি-জয়েন্ট নুসস্ক্রু-আন্ডার-তস্য-আন্ডারকাভার, জাত-বেজাতের কর্মচারী কণ্টকিত এই ভূমিতে যে ব্যক্তি 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' পরলোকগমন করে সে 'পরশুরামি' স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দু দণ্ড রসালাপ করতে পারুক আর নাই পারুক, তাকে অন্ততপক্ষে নরকদর্শন করতে হয় না। কারণ এক নরক থেকে বেরিয়েই অন্য নরকে যাবার ব্যবস্থা কোনও ধর্মগ্রন্থই দিতে পারে না। আমি বিস্তর ধর্মের ঘাটে মেলা জল খেয়েছি— এ কথাটি আপনারা প্রায় আপ্তবাক্যরূপে মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু এসব নিছক রাগের কথা।

এই যে আমি দেহলি-বাসীদের সঙ্গে রাশানদের মতো শেষ একটা (না, দু-তিনটে) সিগারেট খাওয়ার হুমকি দিচ্ছি শুধু তাঁদের আপনজন ভেবে অভিমানবশত।

আপনারা আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কদর করলেন না, আমার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আপনাদের সাহিত্য-সভায় পড়তে দিলেন না, যদি বা প্রধান বক্তা কোনও আন্ডার সেক্রেটারির নেমন্তন্ন পেয়ে শেষ মুহূর্তে কামাই দিলেন বলে আমাকে রচনা পড়তে দিলেন, তখন আবার আমার গুরুগম্ভীর রচনা শুনে আপনারা হাসলেন, যখন রসরচনা (আহা, আজকাল রসরচনা লিখে কত লোক রাতারাতি নাম কিনে নিল) পড়লুম তখন আপনারা গম্ভীর হয়ে গেলেন, যখন সেক্রেটারিদের মস্করা করে কবিতা পড়ে শুনালুম— আপনারা সভয়ে গোপনে এক একে সভাস্থল ত্যাগ করলেন, যখন তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে রচনা পাঠ করলুম তখন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আপনারা ফিসফিস করে বলছেন আমি তেলমালিশের ব্যবসা (ম্যাসাজ ইন্সটিটিউট নয়) খুলেছি, কিছু না পেয়ে শেষটায় যখন গান গাইলুম তখন পাড়ার ছোঁড়ারা ঠিক সেই সময় গাধার লেজে টিনের কেনেস্তারা বেঁধে তাকে পাড়াময় খেদিয়ে বেড়াল, ভরতনৃত্যম্ নাচিনি— তা হলে বোধহয় আপনারা

www.pathagar.com

হনুমানের ছবি এঁকে তার তলায় আমার নাম লিখে বছরের শেষে 'নরসিং দাস' প্রাইজের বদলে এই প্রাইজ দিতেন।

তবু আমি আপনাদের ওপর এক ফোঁটাও রাগ করিনি। বরঞ্চ আমি আপনাদের কাছে উপকৃত হয়ে রইলুম। আপনাদের সংস্রবে না এলে এই যে সাহিত্যরচনার মামদো ভূত আমাদের কাঁধে ছিল সে কি কস্মিনকালেও নামত?

বিবেচনা করি এখন কলকাতা ফিরে গেলে পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে দেখামাত্রই পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাবে না, তরুণীরা হয়তো কিঞ্চিৎ ঘাড় বেঁকিয়ে 'এই যে' বলে একটুখানি মিঠে হাসিও জানাবেন, 'ওইরে, আবার এসেছে' বলে দুদ্দাড় করে দরজা জানালা বন্ধ করবেন না।

ব্যালাটা বেচে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো কাঞ্জিলালকে 'অবদান' করেছি। তার বন্ধু পরিমল দত্ত নাকি গাঁটের পয়সা খরচা করে সেগুলো ছাপাবে। তা ছাপাক; আপনারা শুধু নজর রাখবেন সে যেন অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে বদলি না হয়— ছোকরা তা হলে তহবিল তছরুপের দায়ে পড়বে। পরিমলকে আমি স্নেহ করি।

যতই ভাবছি, ততই দেখি দিল্লি খারাপ নয়।

দিল্লির গরম অসহ্য। কিন্তু বিবেচনা করুন সেই গ্রীষ্মের শেষে যখন কালো যমুনার ওপার থেকে দূর-দিগন্ত পেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিয়ে বিজয় মল্লের মতো গুরুগুরু করে নবীন মেঘ দেখা দেয়, তারই আবছায়া অন্ধকারে আপনি খাটিয়াখানা বাইরে পেতে নব বরিষণের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন, আপনার ত্রিযামা যামিনীর সখা তারার দল একে একে ম্লান মুখে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়, অল-ইন্ডিয়া-রেডিয়োর ঘড়িটা আবার তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করেই আপনারই চারপাইখানার কাছে এসে আপনাকে সঙ্গসুখ দেয়, দূর বৃন্দাবনের প্রথম বর্ষণে ভেজা মিঠে হাওয়া এসে আপনার গালে চুমোর পর চুমো খেয়ে যায়, হঠাৎ আকাশের এস্পার-ওস্পার ছিঁড়ে-ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে নিজাম প্রাসাদের চূড়ো, রাশান রাজদূতাবাসের ফটক, নিমগাছে এর গায়ে ওর বুকে মাথা কোটা এক ঝলকের তরে দেখিয়ে দেয় এবং তার পর সর্বশেষে অতি ধীরে ধীরে রিমঝিম করে বৃষ্টিধারা যখন আপনার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়— তখন আপনি খাটিয়া ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে যাবার চিন্তাটি পর্যন্ত করেন না, ভিজে মাটির গন্ধ দিয়ে বুকের রন্ধ্র ভরে নেন, ইতোমধ্যে শুনতে পান— আরকিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দারোয়ান রামলোচন সিং তুলসীদাসকৃত রামায়ণ সুর করে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আর আপনার প্রতিবেশী সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে ভৈরবীতে গান ধরেছে।

দিল্লি কি সত্যিই খুব মন্দ জায়গায়?

কিংবা এই শীতকালের কথাটাই নিন। নিতান্ত যদি সন্ধের পর আপনাকে না বেরুতে হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করুন...

এরকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন? সকালবেলায় সোনালি রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে লেপ কাঁথা গরম হয়ে উঠল, নাকে টোস্ট স্যাঁকার সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে, এইবার ছ্যাঁৎ করে ডিম-ভাজার শব্দ আর গন্ধ আসবে, আপনি ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

www.pathagar.com

আহা! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শান্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বুগনভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তার পর ধীরে ধীরে প্রখর হতে প্রখরতর রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো-সবুজের স্নেহ-চিক্কন আলিম্পন, আপনার আমার মতো গরিবের ফালি অঙ্গনটুকু নন্দনকানন হয়ে উঠল— আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দঘন দিন স্বর্ণরৌদ্রে চক্ষু মুদিত করে কাটালেন—

এ শুধু দিল্লিতেই সম্ভব।

দিল্লি ত্যাগ তাই সহজ কর্ম নয় ॥

www.pathagar.com

চতুরঙ্গ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রবি-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রচুর বক্তৃতা প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অল্প-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা এদেশের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকেও স্মরণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা আমার কল্যাণ কামনা করেন; সরল জনের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজনসমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, 'দেখো, এ লোকটা কত বড় গণ্ডমূর্খ; কবিগুরুর সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না।' সাধে কি আর তুলসীদাস রামচরিতমানসে বলেছেন,

'মূরখ হৃদয় ন চেৎ, যদপি মিলয়ে
গুরু বিরিঞ্চি শত'
'শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূর্খের
হৃদয়ে চেতনা হয় না'

আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারব না।

তাই ওই সময়টায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারও সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্‌জাইনা থ্রম্‌বোসিস হয়েছে। এন্‌জাইনা পিক্‌টরিস্‌ কিংবা করোনারি থ্রম্‌বোসিস-এর যে-কোনও একটার নাম শুনলেই সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম করে— আমার ওই দ্বন্দ্বসমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ঘ্যাঁটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তা-ও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিংবা জীবনদর্শন সম্বন্ধে নয়। অতখানি কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেনস্‌ আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরেজিতে যাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজব করতে ভালোবাসতেন কি না, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কি না, ডাইনিঙ-রুমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরিকাঁটা দিয়ে ছিমছামভাবে সায়েবি কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দায় হাপুস-হুপুস শব্দে মাদ্রাজি স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলি কায়দায় ঘোঁতঘোঁত করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বাঙালি কায়দায় চটি ফটফটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরোতেন? কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কী করতেন? কিংবা ডিহি শ্রীরামপুর দুই নম্বর বাই লেন তাদের

www.pathagar.com

কম্বল-বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্য ঝুলাঝুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতেন? কিংবা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

'দেহলী'র উপরে থাকতেন তিনি, নিচের তলায় তাঁর নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরফে দিনুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা-পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠল। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বুঝলি দিনু, আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশ টাকা ধার নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলল, 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম।' সভায় যারা ছিলেন তাঁরা পয়েন্টটা ঠিক কী বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আফ্‌টার অল্‌, গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কস্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব না-ও হতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন, 'লোকটার শত-দোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।'

শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরুব্বিরা অট্টহাস্য করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্‌ করেছিলুম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফত পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন। এবং গল্পটি আদৌ তাঁর নিজের বানানো না অন্যের কাছ থেকে ধার-নেওয়া সেকথাও হলফ করে বলতে পারব না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, 'নাস্ত্য চৌরঃ কবিজন নাস্ত্য চৌরো বণিক্‌জনঃ'— অর্থাৎ 'বড় বিদ্যাটি বিলক্ষণ রপ্ত আছে স্যাকরার এবং কবি মাত্রেরই।'

তা হোক। মহাকবি হাইনরিষ্‌ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, 'যারা কবির রচনাতে "নির্ভেজাল" অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, ষোল আনা অরিজিনাল; আমি কিন্তু খেতে ভালোবাসি মধু, যদিও বেশ ভালোভাবেই জানি মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে 'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী! অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সৎকর্মের ওপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালা আদমির কেরদানি বরদাস্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করল 'আইনস্টাইন-বোস থিয়রি'। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, ওটার নাম হয় হবে শুধুমাত্র 'বোস থিয়রি' নয় 'বোস-আইনস্টাইন থিয়রি'। এসব অবশ্য আমাদের শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধরে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করত না বলে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি সূক্ষ্ম গুজব বাজারে ছড়ায়— শান্তিনিকেতনের স্কুল আসলে রিফরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

খুব সম্ভব তারই ফলে আশ্রমে মারাঠি ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

স্কুলের মধ্য বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সিট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই, তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই একপ্রান্তে লাইব্রেরি, অন্যপ্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরির দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটল তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুধিয়ে ছুটল গুরুদেবের দিকে।

আড়াল থেকে সবাই দেখল ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কী যেন একটা বলল। গুরুদেব মৃদুহাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কী একটা গুঁজে দিল। গুরুদেব আবার মৃদু হাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন। ভাণ্ডারে একগাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধাল, 'গুরুদেবকে কী দিলি?'

ভাণ্ডারে তার মারাঠি-হিন্দিতে বলল, 'গুরুদেব কৌন্? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কী রে, ও তো গুরুদেব হ্যায়!'

'ক্যা "গুরুদেব" "গুরুদেব" কর তা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নি দিয়া।'

বলে কী? মাথা খারাপ না বদ্ধপাগল? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে!

জিগ্যেসাবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী-দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামতো দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজি প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছোকরা, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, এ একটি পুরি অঠন্নি!

চল্লিশ বছরের আগের কথা। অঠন্নি সামান্য পয়সা, একথা কেউ বলেনি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল, আশ্রম পুরাণ এ বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এস্থলে অবান্তর।

ইতোমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেডমাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্মৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ-রে, ভাণ্ডারে, এ কী কথা শুনি?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, শেষপর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি? তোর মতো ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি

www.pathagar.com

এমন সব জিনিস যার জন্য সক্কলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কীরকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি? আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল-গেল, কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?'

* * *

তার দু এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠি সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক লিড করতেন। তার কিছুদিন পর শ্রীযুত অনাদি দস্তিদার। তার পর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনও যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিকে গাইছে,

এ দিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনও সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনও বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে! এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবত এবং ঐতিহ্যবশত ধর্মানুরাগী। তার কোনও বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যেসব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোনও চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনও জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনও উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালি ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করল তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হল। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

---

১. বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্য মুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

www.pathagar.com

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বারবার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। গরিব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ওই ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশি ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং ওই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক, আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালি সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজি শিখে ফেলেছেন এবং খ্রিস্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বারবার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে— তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কী, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবনযাপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এসব কিছু নতুন তত্ত্ব নয়। বস্তুত জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ— এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কী প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গেছেন।

কিন্তু এসব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেননি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদ তাঁদের কানে এসে পৌঁছয়নি!

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এইসব 'টোলো' 'বিটলে বামুন'-রা যে শুধু পাদ্রি সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ন রাখতে পারত তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেল-এর চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল— এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লি শহর' লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণীজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

---

২. শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি :

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ.।

www.pathagar.com

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হল। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালি জাতির কী পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যে কী পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনও শেষ হয়নি। বাঙালি সাধক, বাঙালি লেখক, বাঙালি পাঠক সকলেই সেকথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম যায় ছড়াছড়ি
তাহারেও বারবার নমস্কার করি ॥

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও নমস্কার করেছেন।

রাজা রামমোহন খ্রিস্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলভি' ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমনকি অন্তরায়, সেই হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খ্রিস্টান মিশনারির সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি[৩] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না— খুব বেশি হলে, ভদ্র মিশনারি হয়তো তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদবেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন কোন সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সেকথা বলা শক্ত; কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলোই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খ্রিস্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ-সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে— অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কি পণ্ডিত অলবিরুনি, মোগল সুফি দারাশিকুহ, (ঔরঙ্গজিবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যেসব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে

৩. শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

৪. দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে : 'হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্‌র্ (অবিদ্যা) কিংবা ইমান (বিদ্যা) দু পাশের কোনো অলকগুচ্ছ (জুলুফ) দিয়ে ঢেকে রাখনি।' এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহ বিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥'-রই অনুবাদ

www.pathagar.com

সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই। এস্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানত ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনের যেরকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাংলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালিদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এসব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে-যে বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি এসব বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধমাগধী। হজরত মুহম্মদের কৃপায় আরবি গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মন গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিংবা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়;[৫] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণ-ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভঙ্গি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলো জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন, আজও যদি কেউ ব্রাহ্মমন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্ম-সাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনও প্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমনকি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, পুরাণের কথা প্রায় কখনওই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনও ব্রাহ্ম কখনও কোনও দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু-ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বারবার নমস্কার করি।

---

৫. বস্তুত, সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেননি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রিস্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেননি— তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। হজরত মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুত এঁদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬. একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কী ধারণা পোষণ করতেন।

www.pathagar.com

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ব্রাহ্ম পরিবারের হিন্দু চাকর-বাকরদের ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান-খ্রিস্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সার্বজনীন কিন্তু একথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যেকোনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেননি। মুসলমানের সমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশি, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্ন শ্রেণি'র প্রচুর হিন্দু আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনও স্বীকার করব না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানত সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মতো বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই যে হিন্দু-ধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন কিংবা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরিব জাত-ভাই কী ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিতজনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিতজনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।[৭]

* * *

ঠিক সেই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সবকিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে— যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধি-বৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশিরভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

৭. রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কী কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এস্থলে অবান্তর।

www.pathagar.com

যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব— একাধিকবার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কী হবে?[৯]

তাই মাভৈঃ। যারা বলে আমাদের মতো পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মতো মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার— তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই— এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'— চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরি হয়েছে কাঁসার ঘটিটি— কোনও জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনও কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য খ্রিস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। এর অর্থ শুধু এই নয় যে কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমাদের মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা— সেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনও বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেল না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মতো ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমনকি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কী ধরনের 'বেগে'র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটি উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা— সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায়-অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে শুধুমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপ-দুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনও প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সে-দিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা

---

৮. আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবল, সখী, তার কী আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন 'ডোব ডোব, ডোব।'

৯. এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ্ ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অফনার।'

www.pathagar.com

পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় প্যুরিটানিজ্‌ম থেকে— তখন কে জানত পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন।[১০]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালি সেই সাকারের পূজা করে প্রধানত কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমতো ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, এ তিন মার্গ তিনি আস্থাভেদে একে-ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সবকিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সবকিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারনি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

'কীরকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকি থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকি থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন "আমি" "তুমি", "জগৎ", এসবের খবর থাকে না।'

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলেছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী'। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকার'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।[১১] আর একটি কথা— তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস কর কিন্তু মতুয়ার (dogmatism)

---

১০. বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দু রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবাবিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাই-পোষ্য' এই বেনামিতে, 'ফাজিল-চালাক', 'দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার', 'তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি', 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে অকুফের শিরোমণি'। ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যেসব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনো সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

১১. শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপে কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

মৃত্যুরূপা মাতা

'নিঃশেষে নিবিছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্যবায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান বহির্গত বন্দিশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, ওঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিত চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,

www.pathagar.com

বুদ্ধি কর না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বল না যে তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বল আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কী হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।[১২]

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়— এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ করলেন না?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বারবার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুত একটি চরম সত্য আমাদের বারবার স্বীকার করা উচিত : যেইখানেই যেকোনো মানুষ যেকোনো পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমনকি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতী পূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক)

প্রকাশিছে দিকে দিকে তাঁর মৃত্যুর কালিমামাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!— দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তো নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে
কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়— মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ— মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।'

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজিতে এর প্রথম ছত্র 'The Stars are blotted out!'— আশ্চর্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

১২. ডগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা— এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ *কেনোপনিষদে* :

'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥'

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অর্থাৎ "জানি না" ইহাও মনে করি না, এবং "জানি" ইহাও মনে করি না। "জানি না যে তাহাও নহে— এবং জানি যে তাহাও নহে' আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'— গম্ভীরানন্দ।

www.pathagar.com

তাকেও মানতে হয়— গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তার বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কী? বাঙলা দেশে আজ আর কজন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত— কারণ সে পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারি সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙলার কত গুণীজ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে— তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কী ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এস্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি।'

সাকার-নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কী?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালি সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রিস্টান মাইকেল, মুসলমান মুশররফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীম উদ্‌দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ্ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানত হিন্দুরাই।[১৩]

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যেকোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি— 'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালি সমাজের হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ন হয়নি? তবে কেন ওই কারণেই ব্রাহ্মে-হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেননি। তাই বারবার দেখি; তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বারবার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালীকাল্টে' কন্‌ভার্ট করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[১৪]

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

---

১৩. পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মতো মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা *মহাভারত* অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ* এ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

১৪. এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

www.pathagar.com

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন এ কখনওই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজন বিদিত— কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ সমস্যা আপন সত্তায় (Per se) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়নি। যারা মুখ্যত অর্থ কামনা করে রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যত ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ'। এর অর্থ আর কিছুই নয়— এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোনও চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নেই। যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বারবার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কী?'

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে, জগৎ মায়া-মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখির মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যেসব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বারবার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই একথা বলেছেন, এই জন্যেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছতে চায়— রাখাল, নরেন্দ্রের মতো যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের কজন বাদ দিলে, আর কটি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল— তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। একথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলব, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ— পরম পুরুষ। কোনও মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করব। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোনও চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

*   *   *

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশত স্বতই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা— তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, 'তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

www.pathagar.com

এর উত্তরে বলব, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারওরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষজনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনোর পরও কোনও কোনও মানুষ লোকহিতার্থে সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।' একথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, একথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এরকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এযাবৎ কেউ নির্মাণ করেননি।

*   *   *

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গির মতো পরে আল্লা-আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রিস্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সেকথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষত যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সেই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সম্যুলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন— 'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমি প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই— 'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সম্যুলার এর নতুন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্য-ধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্পন্ন পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনও বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সবকিছুর অবহেলা করেননি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এযুগের হিন্দু সম্বন্ধে একথা হয়তো খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনও গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালি পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

www.pathagar.com

পুষ্পধনু

রস কী?

অর্থাৎ যখন কোনও উত্তম ছবি দেখি, কিংবা রসের সঙ্গীত শুনি অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিংবা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কী, সৃষ্ট হয় কী প্রকারে?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম সূর্যোদয় দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যেসব রসের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোল্লিখিত রসের কোনও মিল নেই সেকথা জোর করে বলা চলে না। এমনকি— শোনা কথা— বার্ট্রান্ড রাস্‌ল্‌ নাকি বলেছেন, গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটি নাকি হুবহু কলারসের মতোই। কিন্তু এসব রসে এবং অন্যান্য রসে পার্থক্য কী সে আলোচনায় এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তা হলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জমায়েত হয়েছেন; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন— আমিও নই— অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মতো বে-পেশাদারি— নন-প্রফেশনালই— করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাফাই হয়তো ঠিক মানানসই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার ওপর অহমিকা দোষ আরোপন করেন তাই সভয়ে এ ক'টি কথা কইতে হল)।

রস কী সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকারণ আলোচনা করতে হলে অন্তত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অন্যদিক দিয়ে রসকষহীন বিচার-বিবেচনা যুক্তি-তর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটি দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনও আলঙ্কারিকের অনটন হয়নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দণ্ডিন মন্মট ভামহ হেমচন্দ্র অভিনবগুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নির্ঘণ্ট বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাস্‌ল্‌ প্রশ্ন শোধান, রস কী, হোয়াট ইজ আর্ট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাস্‌ল্‌কে প্রচুর নতুন তত্ত্ব শোনান। অন্য লোকের মুখে শুনেছি, রাস্‌ল্‌ রীতিমতো হকচকিয়ে যান।

বিদেশি আলঙ্কারিকদের ভিতর জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেননি। জর্মন কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কী তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কী তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফত, গল্পচ্ছলে সবকিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর

www.pathagar.com

রামকৃষ্ণ যেরকম কোনওকিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন— অনেকটা সেইরকম!

বাগদাদের শাহ্ ইন্-শাহ্ দিনদুনিয়ার মালিক খলিফা হারুন-অর্-রশিদের হারেমের সর্বশ্রেষ্ঠা, সুন্দরী, খলিফার জিগরের টুকরো, চোখের রোশনী রাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচারিণী,' অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন।

গভীর নিশীথে একদা তিনি নিদ্রার আবেশে মৃদু পদসঞ্চারণে চলে গিয়েছেন প্রাসাদ-উদ্যানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। রাজকুমারী নিদ্রার ঘোরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূর্ণ মোহাবস্থায় ফুল আর লতা-পাতা কুড়োতে আরম্ভ করলেন আর মোহাবস্থায়ই সেগুলো অপূর্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আর সে সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নতুন ভাষা। মোহাবস্থায়ই রাজকুমারী তোড়াটি পালঙ্কের সিথানে রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতে রাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, এটি তাঁরই হাতে তৈরি। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এমনকি ফুলপাতার সামঞ্জস্যে যে ভাষা যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না— আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূর্ব সেই পুষ্পস্তবক। এটি তা হলে কাকে দেওয়া যায়? যাঁকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। খলিফা হারুন-অর্-রশিদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আর্যপুত্রকে (খলিফাকে) দিয়ে এস।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'ও হো হো, কী অপূর্ব কুসুমগুচ্ছ! কী সুন্দর গন্ধ, কী সুন্দর রঙ! হয় না, হয় না, এরকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আর কোনও হাতে হতে পারে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সে সেটি বুঝতে পারল না। সখীরাও বুঝতে পারেননি।

খলিফা কিন্তু দেখামাত্রই বাণীটি বুঝে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহরিত হল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। অভূতপূর্ব পুলকে দীর্ঘ দাড়ি বেয়ে দরদরধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনরিষ হাইনে বলেছেন, 'হায় আমি বাগদাদের খলিফা নই, আমি মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর নই, আমার হাতে রাজা সলমনের আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সর্বভাষা, এমনকি পশুপক্ষীর কথাও বোঝা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বুঝতে পেরেছি।'

এস্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী = কবি; ফুলের তোড়া = কবিতা; ফুলের রঙ পাতার বাহার = তুলনা অনুপ্রাস, খোজা = প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিস্ট্রিব্যুটর (তাঁরা সুগন্ধ সুবর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না); এবং খলিফা = সহৃদয় পাঠক!

www.pathagar.com

মরহুম মৌলানা

মরহুম (স্বর্গত) মৌলানা আবুল-কালাম মহী-উদ্দীন আহ্‌মদ আল্ আজাদ্ সম্ভ্রান্ত বংশের যোগ্য সন্তান। এ বংশের পরিচয় এবং বিবরণ বাদশা আকবরের আমল থেকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এঁর পিতা জড়িয়ে পড়েন। দিল্লির ওপর ইংরাজের বর্বর অত্যাচার আরম্ভ হলে পর তিনি তাঁর অন্যতম ভক্ত রামপুরের নবাবের সাহায্যে মক্কা শরিফে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এক আরব কুমারীকে বিবাহ করেন। আবুল কালাম এই বিবাহের সার্থক সন্তান।

তাঁর মাতৃভাষা আরবি, পিতৃভাষা উর্দু। পরবর্তী যুগে তিনি ফারসি এবং তুর্কিতেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করেন। ইংরেজি থেকেও তিনি সে সঞ্চয়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে এদেশে ফেরার পর তিনি উর্দু সাহিত্যের এমনি একনিষ্ঠ সাধক ও প্রেমিক হয়ে যান যে শেষের দিকে আরবি বা ফারসিতে নিতান্ত বাধ্য না হলে কথাবার্তা বলতেন না।

তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর পিতা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। এই কলকাতা শহরেই তাঁর প্রচুর অনুরাগী শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুরোধে তিনি এখানে স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। পুত্র আবুল কালাম এখানেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর বেতারে যে একাধিকবার বলা হয়, তিনি মিশরের অল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সে সংবাদ ভুল। উপরন্তু মৌলানা সাহেব নিজেকে সবসময়ই কলকাতার অধিবাসী ও বাঙালি বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা তিনি বলতেন না, কিন্তু বাঙলা কথোপকথনের মাঝখানে তিনি উর্দুতে প্রশ্নোত্তর করতেন এবং কিছুক্ষণ পর কারওই খেয়াল থাকত না যে তিনি অন্য ভাষায় কথা বলছেন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি 'লিসান উল্-সিদ্‌ক্' (সত্য-বচন) নামক কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর 'অল্ হিলাল' (অর্ধচন্দ্র) পত্রিকা ইংরেজের মনে ভীতির সঞ্চার করতে আরম্ভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর কাগজ ইংরেজের শত্রু তুর্কি এবং মুসলিম বিশ্ব-আন্দোলনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করার ফলে তাঁকে অন্তরীণ হতে হয়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সে আন্দোলনের সঙ্গে সাদ্ জগলুল্ পাশার মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গাজী মুস্তফা কামাল পাশার তুর্কির নবজাগরণের সঙ্গে সেতু নির্মাণ করেন।

এরপরের ইতিহাস ভারতীয় মাত্রই জানেন।

শ্বেত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিশ্ব-মুসলিম প্রেম মৌলানা আজাদের পরিবারের অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে গণ্য করা হত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কায়— যেখানে হজ্ উপলক্ষে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম প্রতি বৎসর সম্মিলিত হয়ে প্রাচ্যভূমি থেকে কী করে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেত-স্বৈরাচার দূরীভূত করা যায় তার পরিকল্পনা করত এবং ভারত, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে আপন কর্তব্য ও জিম্মাদারি ভাগ করে দেওয়া হত। এ পরিকল্পনা কোনও বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে একে ন্যাশনালিজম না বলে প্যান্‌ইস্‌লামিজম্

www.pathagar.com

(বিশ্ব-মুসলিম-সংহতি) নামে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌলানা এ মন্ত্রই অহরহ্ শুনেছিলেন।

কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলানার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। একথা সত্য যে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি তাঁর দরদ কখনও শুকিয়ে যায়নি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে উঠল স্বদেশপ্রেম। উর্দু ভারতবর্ষের ভাষা। তাঁর মাতৃভাষা আরবিকে তাঁর জীবনাদর্শ এবং রাজনৈতিক সাধনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করে তিনি সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিলেন উর্দুকে। এ বড় সহজ কুরবানি বা আত্মবিসর্জন নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই শুধু নয়, আজও দেখতে পাই বহু লোক স্বার্থলাভের জন্য স্বদেশি ভাষা বর্জন করে বিদেশি ভাষার সাধনা করেন এবং আমাদের মতো বাঙালি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না বলে আমাদের প্রতি রুষ্ট হন।

এবং সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, এই উর্দু গ্রহণের জন্য জীবনসায়াহ্নে মৌলানাকে আবার অকরুণ কটুবাক্য শুনতে হল সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকমণ্ডলীর কাছ থেকে। হিন্দি ভাষা কেন রাতারাতি ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার কণ্ঠরুদ্ধ করে 'জাতীয় ভাষা' রূপে জগদ্দল প্রতিমার মতো ভারতের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন না, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শিশু ভাষাগুলোকে কেন কচি কচি পাঁঠার মতো তাঁর সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ অনুসন্ধান করে তাঁরা আপন 'বুদ্ধি'তে আবিষ্কার করলেন 'হিন্দি-বিদ্বেষী' 'হিন্দি-ভাষাকা কট্টর দুশ্‌মন্' মৌলানা আজাদকে। যেহেতু মৌলানা উর্দু-ভাষী তাই তিনি শিক্ষামন্ত্রীরূপে হিন্দির প্রচার এবং প্রসার কামনা করেন না— এই হল তখন তাঁদের 'যুক্তি'। হিন্দি যে দুর্বল, কমজোর ভাষা সেকথা স্মরণ করবার অস্বস্তিকর প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। পণ্ডিত নেহরুও যে উর্দুভাষী একথা বলতে তাঁরা সাহস পেলেন না— একথা বললে উভয়ের হৃদ্যতা বেড়ে যাবে যে!

মাত্র একবার মৌলানা লোকসভায় তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এবং যাঁরা সেদিন এই সভায় ছিলেন তাঁরা সবাই দেখেছিলেন মৌলানার আবেগময়ী আন্তরিক বক্তৃতার ফলে প্রতিপক্ষ কীরকম লজ্জায় আধোবদন হয়েছিলেন— শত্রু-মিত্র কারও দিকেই মুখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত সেদিন তাদের আর হয়নি।

জগলুল্ পাশা, কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে মৌলানার পত্রবিনিময় সবসময়ই ছিল, কিন্তু মৌলানা ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। সেই ইতিহাস লেখবার শক্তি আমার নেই; আমি শুধু এস্থলে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মক্কা শরিফের প্যান-ইসলামি বালক যৌবনে পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল। মৌলানার যেসব বিপক্ষ দল একদা মুসলিম জাহানের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পর্যন্ত আজ কঠিন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে বুঝতে পেরেছেন, সে স্বপ্ন গেছে— এখন তাঁরা পুরো পাকিস্তানি হয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শই বরণ করেছেন। দুঃখ এই, তাঁরা এ আদর্শটি কয়েক বৎসর আগে বরণ করে নিলেই তাঁদের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল, সকলেরই মঙ্গল হত।

এস্থলে কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষ করা উচিত।

স্বরাজলাভের পর মৌলানা তাঁর জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-মানবের কল্যাণে নিয়োগ করেছিলেন। দেশপর্যটন মৌলানা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, কিন্তু বিশ্বজনের সঙ্গে সক্রিয় যোগস্থাপনার জন্য তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তান-ইরান হয়ে ইয়োরোপে যান— পূর্বে বহুবার বহু

www.pathagar.com

দেশে নিমন্ত্রিত হয়েও যাননি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, জাতিসঙ্ঘ সম্মেলন (ইউ.এন.ও.) এবং তার ভিন্ন ভিন্ন শাখার যে প্রতিনিধি ভারতে এসেছেন তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম সখারূপে চিনতে শিখলেন মৌলানা আজাদকে। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে মৌলানা ইংরেজের বিরুদ্ধে তিক্ততম লড়াই করেছেন আজীবন, তাঁর ভিতর সে তিক্ততা আর নেই। ইংরেজ হোক, মার্কিন হোক আর রুশই হোক, যেজন বিশ্বকল্যাণের জন্য সম্মুখীন হয়, তার বহু দোষ থাকলেও সে আজাদের বন্ধুজন। এবং আরও আশ্চর্য! ইংরেজ দেখে, মৌলানা ইংরেজি না বলেও ইংরেজের মিত্র, রাশা দেখে, তার ভাষা না জেনেও অন্যের তুলনায় মৌলানা রাশাকে চেনেন অনেক বেশি। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন উর্দুতে, কিন্তু সে উর্দু তো উর্দু নয়। সে উর্দু বিশ্বপ্রেমের সর্বজনীন ভাষা, কিংবা বলব, বিশ্বপ্রেমের ভাষা উর্দুর মাধ্যমে স্বপ্রকাশ হল। একদা তিনি আরবি বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করেছিলেন; এখন তিনি উর্দু বর্জন করে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করেছেন, যার নামকরণ এখনও হয়নি, কারণ সে ভাষাতে কথা বলতে আমরা এখনও শিখিনি।

অথচ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী চলত তিনখানি ত্রৈমাসিক। প্রথমখানি আরবিতে— আরবভূমির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনা ও প্রাচীন যোগ দৃঢ়তর করার জন্য, দ্বিতীয়-খানা ফারসিতে— ইরান ও আফগানিস্তানের জন্যে; তৃতীয়খানা ইংরেজিতে— বৌদ্ধ জগতের সঙ্গে যোগস্থাপনা করার জন্য (বৌদ্ধভূমি এক ভাষায় আশ্রিত নয় বলে তিনি মাধ্যমরূপে ইংরেজি গ্রহণ করেছিলেন)। এই তিনটি পত্রিকাই ইন্ডিয়ান্ কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্‌স দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয় এবং মৌলানা ছিলেন তার প্রধান। শুধু প্রধান বললেই যথেষ্ট বলা হয় না— কোন দেশে ক'খানি পত্রিকা যাবে সেটুকু পর্যন্ত তাঁর নির্দেশানুযায়ী হত। আজ ভাবি, এ সবকটি পত্রিকার নীতি-নির্দেশ, মানরক্ষা, তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এমন সর্বগুণ মেশানো আরেক পণ্ডিত পাওয়া যাবে কোথায়? ভারতবর্ষের ভিতরে, বাইরে?

বস্তুত আসলে এ লোকটি হৃদয় এবং মস্তিষ্কের অন্তস্তলে ছিলেন পণ্ডিত। স্বাধীন মক্কা ত্যাগ করে পরাধীন ভারতে না এলে তিনি যে রাজনীতির চতুঃসীমানায় যেতেন না, সেকথা আমি স্থিরনিশ্চয় জানি। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি জ্ঞানমার্গেই ফিরে যেতেন কিন্তু দেশে তখন (এবং এখনও) উপযুক্ত লোকের অভাব। মৌলানা কখনও কর্তব্য অবহেলা করতে চাইতেন না। এমনকি যখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ মুখর হয়ে উঠতেন, এবং আমরা ভাবতুম তিনি পদত্যাগ করলেই পারেন, এখনও তিনি কর্তব্যবোধের দায়েই আপন কাজ করে যেতেন— লোকনিন্দার তোয়াক্কা-পরোয়া না করে। পূর্বেই বলেছি, মাত্র একবার তিনি হিন্দিওয়ালাদের কর্কশ-কণ্ঠে ব্যথিত হয়ে, আপন কাহিনী নিবেদন করেছিলেন। এ অবসরে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল। সেটা কিন্তু কিঞ্চিৎ হাস্যরসে মেশানো।

বিরুদ্ধ দল শিক্ষা-দফতরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ অভিযোগ-ফরিয়াদ জটল্লা করে শেষটায় বলল, 'শিক্ষা-দফতরের দ্বারা কিছুই হবে না— তাদের মগজের বাক্সটি (ব্রেনবক্‌সটি) একদম ফাঁপা।'

মৌলানা স্পর্শকাতর লোক— পণ্ডিতগণ সচরাচর তা হন। উষ্মা প্রকাশ করে তিনি কিন্তু দাঁড়ালেন হাস্যমুখে। বার কয়েক ডান হাত দিয়ে মাথার ডান দিক চাপড়ে বললেন, 'না জি,

www.pathagar.com

এখানে তো আছে', তার পর হাত নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘ আগুলফলম্বিত আচকানের ডান পকেটে থাবড়া মারতে মারতে বললেন, 'এখানে নেই, এখানে কিছু নেই।' অর্থাৎ মগজে মাল যথেষ্ট আছে, কিন্তু পকেটে কিছুই নেই। তার আরও সরল অর্থ, কেবিনেট শিক্ষাবিভাগকে যথেষ্ট পয়সা দেয় না।

পূর্বেই বলেছি, মৌলানা আসলে পণ্ডিত। কর্তব্যের তাড়নায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন রাজনৈতিক মল্লভূমিতে অতি অনিচ্ছায়। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে, কারণ তাঁর সে পাণ্ডিত্য-সায়রে সন্তরণ করার মতো শক্তি আমার নেই।

আরবি এবং সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তার প্রধান মিল, উভয় সাহিত্যের পণ্ডিতগণই অত্যন্ত বিনয়ী। কারও কোনও নতুন কিছু বলার হলে কোনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা সেটি প্রকাশ করেন। লোকমান্য টিলক গীতার ভাষ্য লিখে সপ্রমাণ করলেন, কর্মযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এবং এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়নই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম; মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতাভাষ্য দিয়েই প্রমাণ করতে চাইলেন যে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতাপাঠ লিখে প্রমাণ করতে চাইলেন যে জ্ঞানযোগের দ্বারা চিত্তসংযম আত্মজয় করতে পারলেই স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য। মৌলানা আজাদ তাঁর 'কুরান ভাষ্য' দিয়ে বিশ্ব-মুসলিমকে মুক্ত করতে চাইলেন তার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধসংস্কার এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অতি কৌশলে তিনি তাকে তার কর্তব্য কোন দিকে সেইটে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

এ ভাষ্য তিনি অনায়াসেই আরবিতে লিখতে পারতেন, এবং আরবি ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠকসংখ্যা পেতেন উর্দুর তুলনায় অনেক, অনেক বেশি। দ্বিতীয়, কুরান আরবি ভাষায় লেখা, এবং তাবৎ বিশ্বমুসলিম আরবিতেই তার ভাষ্য লিখে আসছে (গীতার ভাষ্য যেরকম এক শতাব্দী পূর্বেও সংস্কৃতেই রচিত হয়েছে) তৃতীয়ত, মুসলিম-জাহানের কেন্দ্রভূমি মক্কার ভাষা আরবি, চতুর্থত, সে ভূমি আজাদের জন্মস্থল— আপন জন্মস্থলে যশ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কোন পণ্ডিত?

এ সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে মৌলানা তাঁর তফসির ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে। মক্কাতে জন্ম নিয়েছিল তাঁর দেহ, কিন্তু তাঁর চৈতন্য এবং হৃদয় গ্রহণ করেছিল তাঁর পিতৃ-পিতামহের ভূমি ভারতকে স্বদেশরূপে। তাই স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে (টিলকও ইচ্ছা করলে তাঁর ভাষ্য সংস্কৃতে লিখতে পারতেন। কিন্তু লিখেছিলেন মারাঠিতে।) পরবর্তী যুগে আজাদ-ভাষ্য আরবিতে অনূদিত হয়, এবং তখন আরব-ভূমিতে সে ভাষ্যের যে জয়ধ্বনি উঠেছিল তা শুনে ভারতীয় মাত্রই না কী গর্ব, কী শ্লাঘা অনুভব করেছিল। পাকিস্তানিরাও এই পুস্তক নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। তাঁরা পাকিস্তান যাবার সময় তাজমহল ফেলে যাওয়ার মতো কিন্তু এ ভাষ্য ভারতে ফেলে যাননি। ১৯১৭-এর পরও আজাদ-ভাষ্য লাহোর শহরে লক্ষাধিক সংখ্যক ছাপা এবং বিক্রি হয়েছে।

পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য সচরাচর একসঙ্গে যায় না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ হয়েছি মৌলানার সাহিত্য রসবোধে, সাহিত্যসৃষ্টি দেখে। মৌলানার সঙ্গে লোকমান্য টিলকের বহু সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু টিলকের চরিত্রে ছিল দার্ঢ্য, মৌলানার চরিত্রে ছিল মাধুর্য, টিলককে

www.pathagar.com

যদি বলা হয় কট্টর কঠিন শৈব, তবে মৌলানাকে বলতে হয় মরমিয়া মধুর বৈষ্ণব। কারণ মৌলানা ছিলেন সুফি অর্থাৎ ভক্ত রহস্যবাদী (মিসটিক্)। তাঁর সাহিত্যের উৎস ছিল মাধুর্যে, এবং কে না জানে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস।

তাই তাঁর চেহারায় ছিল লাবণ্য, কুরান-ভাষ্যের মতো পণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে মাধুর্য, এবং তাঁর বক্তৃতায় অদ্ভুত অবর্ণনীয় সরলতার সৌন্দর্য।

কিন্তু তাঁর যে সরল সৌন্দর্যবোধ তার পরম প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রম্য রচনাতে। উর্দুতে এরকম রচনা তো নেই-ই, বিশ্বসাহিত্যে এরকম সহৃদয় রসে ভরপুর লেখা খুঁজে পাইনে। তার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বক্ষ্যমাণ অক্ষম লেখকের সাধ্যাতীত।

তবে এই শোকের দিনে একটি সান্ত্বনার বাণী জানাই। সাহিত্য আকাদেমি এ পুস্তকের বাঙলা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে রাখি। সে অনুবাদে বাঙালি পাবে কাশ্মিরি শালের উল্টো দিকটা। পাবে মূলের অসম্পূর্ণ পরিচয়, এবং হয়তো পাবে, অসম্পূর্ণের উল্টো সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই যদি হয়, তবে হয়তো কোনও কোনও বাঙালির অনাদৃত উর্দু ভাষা শেখার ইচ্ছাও হতে পারে। আমাদের সে প্রচেষ্টা হয়তো শোকদুঃখের অতীত অমর্ত্য লোকে মৌলানা আবুল কালাম মহীউদ্দীন আহ্‌মদ আল-আজাদকে আনন্দ দান করবে।

নস্‌রুদ্দিন খোজা (হোকা)

ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খচূড়ামণি নস্‌রুদ্দিন খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহা-আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরেজি বর্ণমালার কল্যাণে 'খোজা' কিন্তু বাঙলায় 'হোকা'রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কি ভাষা ইংরেজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca; কিন্তু তুর্করা 'এচ' অক্ষরের নিচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ 'লখ্', জর্মন 'বাখ' বা ফারসি 'খবরে'র মতো— কিন্তু 'হ' ভাগটা বেশি এবং 'সি' অক্ষরের উপরে হুক্ দেয়— এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার 'জ'। ঠিক সেইরকম বাংলা শব্দ (আসলে আরবি) 'খারিজ' তুর্কি ভাষায় haric লেখা হয়, অবশ্য 'হ্'-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধচন্দ্র এবং 'সি'-র উপরে হুক্ দেয়। 'পররাষ্ট্রনীতি' তাই তুর্কিতে 'সিয়াসত খারিজ'।

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক্ বাদ পড়াতে 'খোজা' হোকা হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের 'খাজা' ও আগা খানের 'খোজা' (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামও একই শব্দ— এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধ্বনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাঁকড়ের নাম যখন আমরা হামেশাই 'মনকদ', 'মানকদ' অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়কর-কে 'ফাদকর' 'ফদকর' লিখি, এমনকি এই কলকাতা শহরেই গোখলে-কে 'গোখেল' লিখি এবং উচ্চারণ করি, তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

www.pathagar.com

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাম্বুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন; তাতে খবর এসেছে যে ওইদিন পাঁচ শ বছর পরে তুর্কিতে এক সুপ্ত অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা-হা করে হেসে উঠেছে।[১]

তা হলে বোঝা গেল মা ধরণীর পাকা দু শো বছর লেগেছে খোজার রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে; তাই বোধহয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি এখন ভূগর্ভ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে!

এদেশে আরবি এবং ফারসি চর্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের আমলে ইরানের এমনই দুরবস্থা যে সেখানকার পনেরোআনা কবি দিল্লি ধাওয়া করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানাখানা নিজেই গণ্ডা গণ্ডা ইরানি কবি পুষেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি 'আমি' 'তুমি' মিল দিয়ে 'কবিতা' রচনা করত তাকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের ফারসি নাম হিন্দ বা হিন্দুস্তান। 'হিন্দ' শব্দের অর্থ কালো। তাই এক কবি তাঁর দৈন্যের কালরাত্রি ইরানে ফেলে পূর্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা হওয়ার সময় লিখলেন,

দুর্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া
চলিনু হিন্দুস্তান
কালোর দেশেতে কালো আমি কেন
করিতে যাইব দান?

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক ইরানের ওই যুগকে শব্দার্থে 'ইন্ডিয়ান সামার' বলেছেন। কারণ এরপরই ইরানি সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কি ভাষার কিছুটা চর্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কি। শেষ মোগল বাদশা-সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও কথাবার্তা তুর্কি ভাষাতেই হতো এবং তুর্কিসাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আত্মজীবনী। কিন্তু এ তুর্কি ভাষা মুস্তাফা-কামালের টার্কির ওসমানলি তুর্কি নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জগতাই) তুর্কি। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের মতো কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কি থেকে বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার ফারসিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে তাঁদের তুর্কি এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি। যদিও প্রাচীন বাঙলাতে 'তুর্ক' বলতে মুসলমান বোঝাত এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও 'তুরস্কম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালি বেকার এখনও চাকরির সন্ধানে 'তুর্কি নাচন' নাচে।

---

১. VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIES
Istambul July 22—Mount Soutlubiyan, in the Kars Province of Turkey has burst into what is believed to be Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A spokesman at the office of the Governor of Kars said the eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement among people living nearby, but there had been no serious damage yet.

www.pathagar.com

আমরা ইংরেজি-ফরাসি পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পর্তুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরও অনেকেই— কিন্তু আশ্চর্য ওসমানলি তুর্কি ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাঈল হোসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কিকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সে দেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কি রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কির সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কিসাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।[২]

তুর্কির বাইরে ইরান, আফগানিস্থান, উজ্‌বেক, আজারবাইজান, তথা গ্রিস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নস্‌রুদ্দিন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির ওপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সবচেয়ে বেশি ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরেজি এনসাইক্লোপিডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপিডিয়া আকারে ইংরেজির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুট্টনীরসাশ্রিত লাতিনেই অনুবাদ করা যায়!

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু আনা পরিমাণ কিংবদন্তি বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সবকটাই বিশ্বাস করতে হয়। এমনকি তিনি পাঁচ শ না সাত শ বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয়নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আক্‌শেহিরে তাঁর মক্‌বরহ্ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরেজিতে অন্ততপক্ষে বিশপ্) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কি এবং তুর্কির বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব ও কটি উদোর শিরনি বুধোর দর্গায় সে বিচার অসম্ভব। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত

---

২. 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, 'আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি "সুপ্রভাতে" প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।'

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইক্‌ল্', খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন, ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হয়। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সেসব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা— সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যেভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্যময়, সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কিদের বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেহশ্‌ত থেকে ফিরিশ্‌তা (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নস্‌রুদ্দিন খোজা নামক কোনও ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেননি তবুও তুর্কির লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই তসবিরই ধারণ করবে, বিদেশির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক লহমার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সেকথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশি খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তর রবীন্দ্রভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু-পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধস্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনও না কোনও গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ— সবকিছুই খোজার কোনও না কোনও গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রসসৃষ্টি করে যাননি— তার মারফতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেল্টআনশাউঙ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকি করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিংবা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করেছেন তার সংখ্যাই বেশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গাড়লস্য কুৎব্‌মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণি থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করেন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা একগাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তা-ও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চাননি, বা যেসব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মশকরা করতে চাননি একথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও আছে—

'প্রিয়ে, আকাশে চন্দ্রের মুখ দেখে
মনে হল তোমার মুখ,
তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।'

www.pathagar.com

এ ধরনের তুলনাকে 'অসম্ভব তুলনা' বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্ কাব্যাদর্শে নিন্দা করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হাস্যরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই-ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ করে আর বলতে থাকে 'ওই আমার প্রিয়া, ওই আমার প্রিয়া', তা হলে পাড়ার ডন্ জোয়ানদেরও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

তবু না-হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কী?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরি কাবাব। অতি সযত্নে একটুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালি কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরিবৎ সেটি রাখলেন জোব্বার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নিকে শিখিয়ে দেবেন কী করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্‌ত কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কী? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কী? রেসিপিটা যে পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তা হলে যে ধরনের গল্পের জন্য খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কির প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মতো কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী— আমাদের বিদ্যাসাগরের মতো দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক— লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশখবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্‌করসহ উজির-ই আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্নসহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্‌ত্‌-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মিরি শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্‌কি তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগিরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কী শাহ্ ইন-শাহ্, আপনার যে পূত পবিত্র... ইত্যাদি[৩] বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুম জারি করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

---

৩. ইরানে বাদশার সামনে কোন মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্য।

www.pathagar.com

দিন দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কী হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মতো অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানি ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ-হৈ-রৈ-রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কী ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুরগি নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজারপানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আণ্ডার ছয়লাপ! আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড।

পাইকিরি ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে-না-যেতে খোজা ঢাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমি তাকিয়া, মুরাদাবাদি আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরি আলবোলা, রাজস্থানের গোলাপি মার্বেলের ফোয়ারা, সরণ-দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশা তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে, দু একজন অমিতবীর্য সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায়নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ও! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তার পর আর দেখতে হয়নি!

ইরানের বাদশা খুশিতে তুর্কির খাস খলিফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন-মাসের ছুটি চান— দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা আর কী করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেঞ্চ করে দু মাসের তরে। যাবার সময় বললেন 'দোস্ত! দেরি করবেন না, আপনার বিরহে আমার'— বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজায় নয়— দোস্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু মাসের কয়েকদিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণ হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ, হুজুর! তবে কি না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হত আরও ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে— '

বাদশার তখন ওই হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে দুঁহু দুঁহু হয়ে কুহু কুহু করবেন।

দু পাত্র শিরাজি খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দিই। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত— আপনার সঙ্গে দোস্তির সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে ফেরে তখন দোস্তের জন্য— ' বাদশা গলা সাফ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনওকিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেননি।'

বলে বাদশা খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

www.pathagar.com

না-হক বেইজ্জত হলে মানুষ যেরকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জাঁহাপনা কুল্লে দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)— আমার ওপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সক্কলের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনিনি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসব।'

একেই বলে দোস্ত্!

উদ্‌গ্রীব হয়ে রাজা শুধালেন, 'কী? কী? আমার যে তর সইছে না। আহ্, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর— অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কি তরুণী আপনার জন্য এনেছি হুজুর।'[8]

ঝঙ্কারের জন্য ফারসিটা শুনুন :

'অগর্ আন্ তুর্ক-ই শিরাজি
বদস্ত আরদ্ দিল-ই মারা
ব্-খাল-ই হিন্দো ওণ বখ্ শম্
সম্‌রকন্দ্ ওয়া বুখারারা।'[৫]

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

---

৪. ইরানে তুর্কি রমণীর বড়ই কদর।

'হে তরুণী, হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ওই কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরেজি অনুবাদ আছে—

'If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand
I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand.'

কিংবা

'Sweet maid, if thou wouldst charm my sight;
And bid these arms thy neck infold;
That rosy cheek, thy lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkhand.'

৫. সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

www.pathagar.com

তার পর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত— যাকে বলে নখশির বর্ণন। 'ওহো হো হো,— একটি তন্বঙ্গী চিনার গাছ হেন! কী দোলন, কী চলন!'

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা-যামিনীর স্বপ্নজাল— আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মৃগনাভি সম।'

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতরকণ্ঠে বললেন, 'চুপ', চুপ', আস্তে আস্তে— পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তা হলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথমদিনের মতো তাজা, অতিশয় নব— ফারসিতে যাকে বলে 'তাজা ব্-তাজা, নৌ-ব-নৌ,' দ্বিতীয়ত, আণ্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মতো তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে লাহোর না পেশাওয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে-মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ অশ্বারোহী গাঁজা; দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি-আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌঁছেছেন আক্শেহিরে, স্বভাবতই আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন; কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি— প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ-দর্ওয়াজ্। একেবারে শিশু। তা না-হয় হল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ-দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

গোরস্তানে আছেই-বা কী, যাবেই-বা কী? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের ফলে যা-কিছু ইমারত বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ— ওসবে লুটের কিছু নেই বলে। তিনমণি তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা— অন্যার্থে— করা হচ্ছে, মিশরি মমির মতো? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ দোরে বারকয়েক ঠুকলেন, এদিক-ওদিক গলা বাড়িয়ে চেল্লাচেল্লি করলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারাওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে, 'কী হবে ওই বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনও খোলা হয়নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

www.pathagar.com

মানে?

একশ ফুট উঁচু দেউড়ি— চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে এক ফুট হয় কি-না হয়!

মানে?

খোজার আখেরি-শেষ মশকরা। উইলে এইভাবে তৈরি করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, 'এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতোমধ্যে আর সবদিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখিনে।'

* * *

আমি আক্‌শেহির যাইনি। কাজেই হলফ খেয়ে বলতে পারব না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝব খোজা আরও মোক্ষম রসিক। বিন-খর্চায় আমাদের এখনও হাসাচ্ছেন আর বোকা বানাচ্ছেন।

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবি-ফারসির চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল— ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ববাংলার মতো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবি-মৌলানারা সেখানে আরবি-ফারসির বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেননি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম স্কুলে সুবোধ বালকের মতো যে খুব বেশি আরবি-ফারসি চর্চা করেছিলেন তা-ও মনে হয় না। স্কুলে তিনি আদৌ ফারসি (আরবির সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এসব ভাষায় খুব বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন তা-ও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জাব্বা-জোব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদির কাব্য কিংবা মৌলানা রুমির মসনবি সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াবে তা-ও তো মনে হয় না। এমনকি রঙিন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিদার অঙ্গরখা পরে হাতে শিরাজির পাত্র নিয়ে সাকির কণ্ঠে ফারসি গজল আর কসিদা-গীত শুনছেন, এ-ও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনওকিছু বলা শক্ত, তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকি' এবং 'সাকি' চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এ দুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী

www.pathagar.com

যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন— হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবি-জ্ঞান ধরা পড়ে না— ধরা পড়ে তাঁর কবি-জনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই ওপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফারসি তিনি বহু মোল্লা-মৌলবির চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফারসি কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনও পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ওই মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয়নি। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন একথাও তো কখনও শুনিনি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যেরকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনও যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সেকথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্সম্যুলার ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজি হননি) কিন্তু ইরানের গুল্-বুল্‌বুল, শিরাজি-সাকি তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি— একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কিটস-বায়রনের বেলা যেরকম ইংল্যান্ড ও গ্রিস।

আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানত ইরানের মারফতেই। কুরান শরিফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম-অমুসলিমের চোখে জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফারসি কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
  কাননে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
  হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ্ আয়দ্‌ব্ কিনান্
  গম্ ম্-খুর।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান্ শওদ্ রুজি গুলিস্তান
  গম্ ম্-খুর্ ॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফারসি কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ওই যুগেরই অনুবাদ।

কোনও কোনও মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনও কোনও হিন্দুর মনেও

www.pathagar.com

ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধহয় বাঙলার জন্য নয়— তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে— পরবর্তী যুগে কেন, ওই সময়েই কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানি সাকির গলায় কবি যে বারবার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানি বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম-সহচরী বলে— ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুরূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকির কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এস্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানি ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইরানিরা যেরকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর-প্যালেস্টাইন, অন্যদিকে গ্রিস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়েরা সেরকম করেনি। দ্বিতীয়ত বিদেশি অভিযানের ফলে ইরানভূমি যেরকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনও ঘটেনি। এসব কারণেই হোক বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, ইরানিরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই সে এক উগ্র স্বাজাত্যাভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে শান্তভাবে বিদেশির ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজেকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা করেনি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সবকিছু মেনে নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রিস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত', 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রিক-রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরিব-দুঃখীর জন্য নতুন কোনও আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধনবণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরত মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তীগণ যখন একদিন অন্যান্য জাতির মতো দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানি শোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হল না। তার পর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করল, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষপর্যন্ত ওই ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মতো ইরানি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চার শ বছর পরে ফিরদৌসির মহাকাব্য 'শাহনামা'তে। রাষ্ট্রভাষা আরবিকে উপেক্ষা করে ফিরদৌসি গাইলেন প্রাক্-মুসলিম যুগের ইরানি বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা— নবীন অথচ সনাতন সেই ফারসি ভাষায়। যে ফারসি কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসি।

এই নতুন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যেসব কবি কাব্যের সর্ব-বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁসও এতখানি

www.pathagar.com

সর্বমুখী বলে মনে হয় না। দু শো বছর যেতে-না-যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি করে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

* * *

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হল। তার প্রথম :

(১) যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধহয়, ইরানিরা আরবির মতো কঠিন ভাষা আয়ত্ত করে সে শাস্ত্রে এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করল কী করে? মুসলমানদের মনুর নাম ইমাম আবু হানিফা। পৃথিবীর শতকরা আশিজনেরও বেশি মুসলমান আজ নিজকে হানফি অর্থাৎ আবু হানিফার মতবাদে বিশ্বাসকারী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মতো কীই-বা আছে? শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্যরক্ত ছিল তা-ও তো মনে হয় না, অন্তত একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পরে যে, আর্য-উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবারে সংস্কৃত-চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তর-ভারতেও তিনি তাঁর বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানি আবু হানিফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদিনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এরকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরও আছে।

(২) যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টিপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেরে 'রহস্যবাদ' বা সুফিতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন; এঁরা ভগবানের আরাধনা করেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়া'দের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখী তাঁদের কথায়
বাহিরে থাকেন তাঁরা।

* * *

ওই চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করলি এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা সুফি ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোনটি সুফি কোনটা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মতো ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

www.pathagar.com

তবে চট করে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মতো ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

('সদ্ভাব-শতক'— কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরও বহু মিল আছে। এঁদের সুফিবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'তুর্কি'রা গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক', 'তুরুক' নাম দিই (প্রাচীন বাঙলায় 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক',— তামিলে এখনও 'তুরস্কম') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিক্র'— যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কি-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মতো এঁরাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা') প্রাপ্ত হন— অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরোয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখে ইয়োরোপীয়রা এদের নাম দিয়েছিল 'ডানসিং দরবেশ'। ইংরেজিতে কথাটা এখনও চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শিদিয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফারসি, সুফি ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়— ভারতীয় ও গ্রিকরাই প্রধানত দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধার্বাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা, অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য; বস্তুত বর্তমান লেখক ব্যক্তিগতভাবে এ পুস্তককে 'মহাভারতে'র পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বিরুনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রিক এবং ভারতীয়েরা— আমরা (অর্থাৎ আরবি লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এঁদের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রিকদর্শনের আরবি অনুবাদ দিয়ে দর্শন-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলি সিনা), আভেরস (আবু রুশ্‌দ্‌) ও গজ্‌জালি (অল-গাজেল— এঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শঙ্কর-দর্শনেরই ন্যায় ধর্মাশ্রিত এবং যে-স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রিকদর্শনের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদসম্মত অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করেছেন। এদের বিশেষ নাম 'মুতকল্লিমুন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেল্টানশাউউঙ) নির্মাণে এঁদের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাস-চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানিরাও এ শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনও ইরানিদের কাছে ইতিহাস ও

www.pathagar.com

পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়নি। ফিরদৌসির 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত— অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ করার বিষয়, প্রাক-ইসলামি এইসব অগ্নিউপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসির কী গগনচুম্বী গরিমা দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন। এ যেন বিজয়ী আরবদের বারবার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সে দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনও পৌঁছওনি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনা চেনা মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে বারবার এই গান গেয়েছে। ('অন্য জাতি দিগ্বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন।') কিন্তু, আফসোস। শাহনামার মতো মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেনি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসির আসনে বসানো কঠিন এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শব্দটি ভেবেচিন্তেই কোটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই মাইডিয়ার হিরো পবননন্দন ভীমসেন ও হনুমান যেসব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়, মনে হয়, ওই সময়ে, ওই অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাত না, বলতে ইচ্ছে করে, 'ধন্য ধন্য যুগ্ম-কবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন!') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমান ধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বঙ্গী তরুণী সাকির সঙ্গে— যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কি না সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন— তায় আবার ঝরনাতলায়, নির্জনে, সাঁঝের ঝোঁকে, যখন কি না 'মগরিবের আইন ওকতে' নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ— এবং মনে মনে আওড়ানো,

'মত্ত, মাতাল ব্যসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর'

তা হলে অবস্থাটা কী রকমের হয়?

কথা সত্য, মোল্লারা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু একখানা কাব্যগ্রন্থের পাতাও তো তারা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর ঢলাঢলির পর ওকিবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

'মোল্লার কাছে কোরো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,
তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।'

তবু, একথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচজনের তুলনায় বেশি।

এবং কার্যত দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল ঝোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান-কি-সাকি সুদ্ধ কবিদের বমাল গ্রেপ্তার করার জন্য।

www.pathagar.com

কবিরা এবং বিশেষ করে আমাদের মতো তাঁদের গুণগ্রাহীরা, উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এসব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবদ্‌প্রেম, সাকি অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীর, গুরু, মুরশিদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমনকি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনও অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা যায়। কিন্তু বাদবাকিগুলো?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং বিস্তর সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না— সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরানে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী

মর্ত্যপ্রেমই যদি হবে তো 'পরানে' 'পরানে' প্রেমের ফাঁসি লাগবে। 'পরানে' আর 'চরণে' প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে— যার অনুভূতি এ জগতে আরম্ভ, আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যলোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হতে হবে? যথা :

অদ্যাপ্য-শোক-নব-পল্লব-রক্ত হস্তাং
মুক্তাফল প্রলয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি ॥

বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তা ফলে।
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত ॥
নির্জনেতে বসি করি সদ্য সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা ॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন ॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার।
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী ॥

www.pathagar.com

অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে ॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে ॥
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে ॥
স্ববল্লভ-সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী ॥

(*চৌরপঞ্চাশৎ*, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃ. ৮)

পূর্বোল্লিখিত এইসব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

*   *   *

গিয়াসউদ্দিন আবুল ফৎহ্, ওমর ইবন্ ইব্রাহিম অল-খৈয়াম ইরান দেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিংবা সন ঠিকমতো জানা যায়নি, এমনকি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাম্বু-নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরও আছে। 'কত্তাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারি' (ভাঙা) শব্দ এসেছে। রান্নার মশলা-বিক্রেতা অর্থে বক্কাল শব্দও একদা বাঙলাতে সুপ্রচলিত ছিল— আরবিতে শব্দটির অর্থ 'মুদি' বা 'মশলা-বিক্রেতা'। ত্রিবর্ণের মূল ধাতুতে— যথা 'দ-খ-ল' 'দখল করা' 'ক-ত-ল' 'কোতল করা' দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ'-কার যোগ করলে যে কর্তাবাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ওই কর্ম সে পুনঃপুনঃ করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলায় তাই সে সকালবেলা খম্মারি বা খোঁয়ারি ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারি মাতাল', 'মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল করা যার ব্যবসা সে কোতোয়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ওই অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়য়াম' অর্থ 'যে পুনঃপুন তাম্বু নির্মাণ করে'— 'তাম্বু নির্মাণকারী'। বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম' বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'র মতো নয়— আমরা বিরক্ত হলে যেরকম 'আখ'-এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘৃষ্ট্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ'-এর 'খ'-এর মতো। আসামিতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেইরকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবি মাত্র। আজকের দিনের কোনও সরকার যে-রকম রাইটারজ বিল্ডিঙে চিফ সেক্রেটারি (সরকার) নন কিংবা কোনও ঘটকপদবিধারী যেরকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায়-দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল; এখন হয়েছে বেলা
নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু— ঠোক্কর খায়, পথ-প্রান্তের ঢেলা।

(লেখকের এমেচারি অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অন্য কারও অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

www.pathagar.com

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে— তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরানি আলঙ্কারিকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশি ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্নতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমরাও তেতাল বাজাবার সময় তৃতীয়ে এসে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরও জোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে রাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামের ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রসগ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ কাজী আগাগোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষ করেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং অবসর কাটাবার জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন... তাঁর নামে প্রচলিত গজল, মসনবি বা অন্য কোনও শ্রেণির দীর্ঘতর কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এইটুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকি কিংবদন্তি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁর জন্মের তারিখ কেন, সন পর্যন্ত জানা নেই, যাঁর পরলোকগমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীন, তাঁর সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তি প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। স্মরণ রাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুওয়াফফকের কাছে একই সময়ে তিনজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতর খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনও একজন পরবর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দু জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধানমন্ত্রী বা নিজাম-উল্-মুল্ক-এর পদ প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন্ সব্বাহ তাঁর কাছে এসে তাঁর পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খ্রিস্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় একপ্রকার হশিশ্ সেবন করত বলে এদের নাম হয়েছিল 'হশিশিয়য়ুন' এবং ইংরেজি 'অ্যাসাসিন'— গুপ্তঘাতক— এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসির মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে নিজাম-উল্-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সে-ও হাসন-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অরিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্যরচনা বলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম-উল্-মুল্ক উচ্চ পদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন এ তো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গসুখ বলতে বোঝে,

www.pathagar.com

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখী স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

(কান্তি ঘোষ)

কিংবা—

আমার সাথে আসবে যেথায়— দূর সে রেখে শহরগ্রাম
এক ধারেতে মরু তাহার, আর একদিকে শষ্প শ্যাম।
বাদশা-নফর নাইকো সেথা— রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার।
মামুদ শাহ?— দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।

(কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কী হবে? নিজাম-উল্-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনও তাঁর মত পরিবর্তন করেননি। বস্তুত তাঁর কাব্যের মূল সুর ওইটিই।

কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ডাক পড়ল রাজদরবারে— পঞ্জিকা সংশোধন করে দেবার জন্য। ইরানিদের 'নওরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্তঋতুতে, কিন্তু বহুশত বৎসর লিপইয়ার গোনা হয়নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্তঋতুতে আসছিল না। ওমর ওই কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটস্‌জেরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞানচর্চা ফ্রান্সে অনূদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমানে লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায়নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কোনিক্ সেক্‌শন' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily; it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his "Algebra" he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all.'

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরেজি, এমনকি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরেজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা-অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেও আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকের কোনও লাভ হবে না।

www.pathagar.com

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখবার ফুরসত তাঁর হয়ে ওঠেনি— এমনকি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষচর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুত গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনওপ্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনও অধিকারই সে পায়নি। তাই—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টি সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

(সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হতে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্যলিখন— ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইনি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ শটি রুবাইয়াৎ ইরানি বটতলাতেও পাওয়া যায়— পার্টিশনের পূর্বে কলকাতায় ফারসি বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ শর কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা এখনও শেষ হয়নি— আমার বিশ্বাস কখনও হবে না। সেই ছ শ চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য রসিকজনের থাকার কথা নয়— পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি রসিকের সেবা করি।

আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তা-ও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্য— কারণ ওইখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে :

খা'জা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master! grant us only this, we prithee!
Preach not! But mutely guide to bliss,
we prithee!

www.pathagar.com

'We walk not straight'— Nay,
it is thou who squintest!
Go, heal thy sight, and leave us in peace,
we prithee!

(কার্নের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যেসব কবি ফিরদৌসির ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়— ফুরোয় যা তা ফুরিয়ে যাক্,
কৈকোবাদ আর কৈখ্‌স্‌রুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা— স্মৃতির ফাঁস—
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এসো আমার পাশ।

(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সুফিরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিৎকার করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ওই করেই ভগবদ্‌প্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশি সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চিৎকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সবচেয়ে বেশি চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেননি।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান;
বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নেই গভীর।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বারবার কাতর রোদন,
দরদী ফরিয়াদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হননি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনওমতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনিনি তো কভু কোনও মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কী এর অর্থ— খামকা পোড়েন টান।

(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা— একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পারো, যতক্ষণ পারো দর্শন-বিজ্ঞান-সাঁই-সুফিদের ভুলে গিয়ে সাকি সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

www.pathagar.com

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব— লাও ঝটপট— রাঙানো গোলাপি রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কী শরীরখানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কী কাজে লাগে!

(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ওই জাতীয় লোকায়তীদের মতো নন। 'ঋণ করে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না', অর্থাৎ ইহসংসারে কিংবা পরলোকে অন্য কারও প্রতি তোমার কোনও নৈতিক দায়িত্ব— মরাল রেসপনসিবিলিটি নেই— এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ্ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

(নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন, 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, 'রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা— ওই কাব্যই বারবার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নেই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)

বার্লিন শহরের উলান্ড স্ট্রিটের উপর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা— বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান— আর চেলারা গোসাঁই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোসাঁই বললেন, যা বল, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কীরকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের— না, দ্যাশের— খবর কী? কী খেলেন, কী দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, কী খেলুম? কই মাছ— এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ; ইলিশ মাছ— এক-একটি তিমি মাছের সাইজ; আর তিমি মাছ— তা সে দেখিনি। তবে বোধহয়, তাবৎ বাকরগঞ্জ ডিস্‌টিক্‌টাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ওই যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

www.pathagar.com

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সক্কলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে। দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসত না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপোজেলের গ্যাস-মাস্ক পরত। তবে দু একজন যে একেবারেই আসত না তা নয়— 'ইন্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খুশবাই জর্মনি-হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতোভাবে ওদের ওপর একটা নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সূয্যি রায় বলল, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল্ দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমির দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনও বেরোয় না?'

রায়ের গ্রামসম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধাল, 'মামু, দ্য ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই করে বলেছি ফরাসি শিখতে, তা শিখবি নি। ডি, ই দ্য; টি, আর, ও, পি ত্রো— পি সাইলেন্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশি— One too many। এই মনে কর, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে— একথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?— নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতের বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগল।

আড্ডায় লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বলল, তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়, ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্ নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য? তখন কী বলিস্? 'ভাগ্নে বউ দুয়ারে— কোনও কেটে ফাল্‌দি যা'। বরঞ্চ সূয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডাম্‌কে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই দ্য ত্রো নস্। রাধা কেষ্ট'র কী হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-হুলো-একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনও হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়, অবশ্য প্র্যাক্‌টিস্ থাকলে।'

আড্ডা সমস্বরে বলল, 'প্র্যাক্‌টিস!'

চাচা বললেন, 'হ। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বলল, 'ছাড়ুন চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে সাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিসার প্রয়োজন হয় না। কী করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই সাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যান্ড অব মিল্‌ক্ অ্যান্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

www.pathagar.com

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসি উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসি জানে না। আর ফরাসি উকিল জর্মন জানে না সে তো জানা কথা। ফরাসি ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে যে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করল। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসি, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে— বিদেশিরা প্যারিসে এলে যেরকম টুকিটাকি ফরাসি বলে ওইরকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক-একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-ওলা নামনে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তার পর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বলল, 'হাল্‌ব্‌-উন্‌ট্‌-হাল্‌ব্‌'— অর্থাৎ 'হাফাহাফি।' ফরাসি বলল, 'অ' প্যো আঁসিয়েন্‌'— 'একটুখানি এনশেন্ট'। জর্মন আমাকে শুধাল, 'ফ্রেঞ্চি, কী বলল?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বলল, 'চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কী বয়স— নিষ্‌ট্‌ ভার— নয় কি?' ফরাসি আমাকে শুধাল, 'ক্যাস কিল্‌ দি— 'কী বলল ও?' উত্তর শুনে বলল, 'মঁ দিয়ো— ইয়াল্লা— চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথিড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ একসঙ্গে তিনজনার তিনখানা বই ঠাস করে আপন আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যেরকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোঁড়ে। কী ব্যাপার? দ্যাখ্‌ তো না দ্যাখ্‌, সিঁড়ি দিয়ে উঠল এক তরুণী।

সে কী চেহারা! এরকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে-দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপি মার্বেল দিয়ে কোঁদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপি আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু ভাগে করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌ গে! আমার বয়েস হয়েছে। তোমাদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কী! অপূর্ব, অপূর্ব।

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি— প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসি দু জনেই চুপ! আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মতো তার গায়ের দু দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তি হবে। কোন্‌ মসিয়ো কোন মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন হ্যার্‌ কোন ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন মিসিস কোন মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি

www.pathagar.com

খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোসাঁইয়ের মতো প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে! প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগল, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি এহেন অবস্থায় দু জনাই স্পানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একে অন্যকে গম্ভীরভাবে স্টিফ বাও করে দু দিকে চলে যায়, ফরাসি হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি, গেলেন হেরে। মারাঠা চালাকি করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেলল না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে— স্যর ওয়ালটার র‍্যালে যেরকম রমণী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু জনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মতো সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়ল।

আমার পাশের ফরাসি বলল 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বলল, 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'অ্যাঁপসিব্‌ল!' বেট্? 'বেট্' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ'!

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস কর আর না-ই কর, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে! বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাক্‌চুয়েট করে। কোনওদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম্ হয়ে বসে আছে— যেন জাহাজ একটা কনসান্‌ট্রেশন ক্যাম্প— আর ফরাসিটা উল্লাসে ক্রিং ব্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কী? পাক্কা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দুটো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারোটাতেই কেবিন নেয়। ফরাসি এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা! আর কোনওদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে— মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতোমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটল এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসত পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষ নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসত এক অতিশয় গোবেচারি ভালো মানুষ নিগ্রো পাদ্রি। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলা-বদলির প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে প্রশ্ন উঠল, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কী প্রকারে? বহু বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হল, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

www.pathagar.com

দু একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসি উকিল হাত-পাত চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est, `c'est—, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনগত ন্যায্য হক্কের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনও কথাই হচ্ছে না।

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনও বেনে, কখনও মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারি কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে-কুকুরে কী রেস্— কভি কুত্তা, কভি গুলি, কভি গুলি, কভি কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠারো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমি হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠল নাগর-বেনাগর সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কী সি-সিক্‌নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্র ধরল রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মতো হলদে। তার পরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিচিয়ে কোনওগতিকে আমি টিকে আছি আর কি! খাবার সময় পেটে যা যায় সেসব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরি-ফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসি বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসাল।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসি গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরল রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু ধরলুম গিয়ে তাকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'কেবিন'। আমি ধরে ধরে কোনওগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দু জনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দু জনাই ভিতরে। কী আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তার পর কেবিন-বয়কে ডেকে দু জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্!'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডার সবাই একবাক্যে শুধাল, 'তার পর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তার পর আর কী?'

তবু সবাই শুধায়, 'তার পর?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্‌স্ বুঝিসনে? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলে ফেলিসিতাসিয়ো মসিয়ো, কেউ বলে কন্‌গ্রাচুলেশনস্, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে— দুচ্ছাই, এসব কী? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।

শেষটায় ফরাসি উকিলটা বলল, "আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র-গুজরাত দু জনাই হার মানল। জিতল বেঙ্গল। ভিত্‌ল্য বাঁগাল! লং লিভ বেঙ্গল!"

আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনও কথা শোনে না।

www.pathagar.com

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল— বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতেনি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া, মেরে দিল। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক্ক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গেল কোথায়।'

এমন সময় সেই দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

মাম্‌দোর পুনর্জন্ম

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনও নতুন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে, এমন কোনও ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সামান্য অদলবদল করে কিংবা পুরনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কস্মিনকালেও বিদেশি কোনও শব্দ গ্রহণ করেনি। নিয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারও কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হিব্রু, গ্রিক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবিও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাঙলা আত্মনির্ভরশীল নয়। আমরা প্রয়োজনমতো এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নতুনরূপে দেখা দিল বলে আমরা আরবি ও ফারসি থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছি। পরবর্তী যুগে ইংরেজি থেকে এবং ইংরেজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকে নিয়েছি, এবং নিচ্ছি।

বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। নিয়েছি, এবং এখনও সজ্ঞানে আপন খুশিতে নিচ্ছি এবং শিক্ষামাধ্যমরূপে ইংরেজিকে বর্জন করে বাঙলা নেওয়ার পর যে আরও প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারও কোনও সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধ প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশি বস্তুর ন্যায় আমাদের ভাষাতেও বিদেশি শব্দ থেকে যাবে, নতুন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

পৃথিবীতে কোনও জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা করাটা অসম্ভব না-ও হতে পারে। হিন্দি উপস্থিত সেই চেষ্টাটা করছেন— বহু সাহিত্যিক উঠে-পড়ে লেগেছেন, হিন্দি থেকে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দ তাড়িয়ে দেবার জন্য। চেষ্টাটার ফল আমি হয়তো দেখে যেতে পারব না। আমার তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। ফল যদি ভালো হয়

www.pathagar.com

তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' নজরুল ইসলাম 'ইনকিলাব'— 'ইনক্লাব' নয়— এবং 'শহীদ' শব্দ বাঙলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 'সাধু' রচনায় বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতেন না, বেনামিতে লেখা 'অসাধু' রচনায় চুটিয়ে আরবি-ফারসি ব্যবহার করতেন। আর অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরপ্রসাদ আরবি-ফারসি শব্দের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা 'আহাম্মুখী' বলে মনে করতেন। 'আলাল' ও 'হুতোম'-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল; সাধারণ বাঙলা এ স্রোতে গা ঢেলে দেবে না বলে তার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন এবং হিন্দির বঙ্কিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দিতে বিস্তর আরবি-ফারসি ব্যবহার করছেন।)

এস্থলে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। শঙ্করদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দ-বহুল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি 'হুতোম' ঘ্যাঁষা হয়ে যেতে বাধ্য। 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক— তাতে আছে গাম্ভীর্য, 'বাঁকা চোখে'র ভাষা ভিন্ন— তাতে থাকে চটুলতা।

* * *

বাঙলায় যেসব বিদেশি শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবি, ফার্সি এবং ইংরেজিই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশি নয় এবং পর্তুগিজ, ফরাসিস, স্প্যানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।

বাঙলা ভিন্ন অন্য যেকোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, সে ভাষার শব্দ বাঙলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এদেশে ছিল বলে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় ঢুকেছে, এখনও আছে বলে অল্পবিস্তর ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরও ঢুকবে বলে আশা করতে পারি। স্কুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃতচর্চা উঠিয়ে দিতে চাইনে তার অন্যতম প্রধান কারণ বাঙলাতে এখনও আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরেজির বেলাতেও তাই বিশেষ করে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানেরও শব্দ আমরা চাই। রেলের ইঞ্জিন কী করে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঙলাতে কোনও বই আছে বলে জানিনে, তাই এসব টেক্‌নিকল শব্দের প্রয়োজন যে আরও কত বেশি সে সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা এখনও আমাদের মনের মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।

একমাত্র আরবি-ফারসি শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নতুন শব্দ বাঙলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম বাঙলাতে আরবি-ফারসির চর্চা যাব যাব করছে, পুব বাঙলায়ও এসব ভাষার প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ বলে তার আয়ু দীর্ঘ হবে বলে মনে হয় না এবং শেষ কথা আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনও অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাঙলাকে প্রভাবান্বিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যেসব আরবি-ফারসি শব্দ বাঙলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরও বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয়ত,

www.pathagar.com

কোনও কোনও লেখক নতুন বিদেশি-শব্দের সন্ধান বর্জন করে পুরনো বাঙলার— 'চণ্ডী' থেকে আরম্ভ করে 'হুতোম' পর্যন্ত— অচলিত আরবি-ফারসি শব্দ তুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেন্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরনো বাঙলা পড়তে হয়— তারা এইসব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে বলে অচলিত অনেক আরবি-ফারসি শব্দ নতুন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এসব শব্দের একটা নতুন খতেন নিলে ভালো হয়।

* * *

সংস্কৃত, গ্রিক, বাঙলা আর্য ভাষা, আরবি, হিব্রু সেমিতি ভাষা। ফারসি, উর্দু, কাশ্মিরি, সিন্ধিও আর্য ভাষা, কিন্তু এদের ওপর সেমিতি আরবি ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে প্রচুর। উত্তর ভারতের অন্যান্য ভাষাদের মধ্যে বাঙলা এবং গুজরাতিই আরবি ভাষার কাছে ঋণী, কিন্তু এই ঋণের ফলে বাঙলার মূল সুর বদলায়নি। গুজরাতির বেলাও তাই।

হিব্রু এবং আরবি সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। ঠিক সেইরকম প্রাচীন আর্য ভাষা ফারসি তার ভগ্নি সংস্কৃতের ন্যায় খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আরবরা যখন ইরান জয় করে তখন তারা ইরানিদের তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু তারা সঙ্গে আনল যে ধর্ম সেটি জরথুস্ত্রি ধর্মের চেয়ে প্রগতিশীল, সর্বজনীন এবং দুঃখীর বেদনা উপশমকারী। ফলে তাবৎ ইরান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল এবং আপন ভাষা ও সাহিত্য বর্জন করে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে স্বীকার করে নিল। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাই ইরানিদের দান অতুলনীয়।

চারশত বৎসর পরে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল। ইরানিদের আপন ভাষা তখন মাহমুদ বাদশার উৎসাহে নবজন্ম লাভ করে নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলল। বাল্মীকি যেরকম আদি এবং বিশ্বজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, ফিরদৌসিও এই নব ইরানি (ফারসি) ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি। আরবি থেকে শব্দ এবং ভাবসম্পদ গ্রহণ করে ফারসি সাহিত্য যে অভূতপূর্ব বিচিত্র রূপ ধারণ করল তা আজও বিশ্বজনের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। রুমি, হাফিজ, সাদি, খৈয়াম আপন আপন রশ্মিমণ্ডলে সবিতাস্বরূপ। সেমিতি আরবি এবং আর্য ফারসি ভাষার সংঘর্ষের ফলেই এই অনির্বাণ হোমানলের সৃষ্টি হল।

পরবর্তী যুগে এই ফারসি সাহিত্যই উত্তর ভারতে ব্যাপকরূপে প্রভাব বিস্তার করল। ভারতীয় মক্তব-মাদ্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবি ভাষা পড়ানো হয়েছিল তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্যগণ ইরানি আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফারসির সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশি। উর্দু সাহিত্যের মূল সুর তাই ফারসির সঙ্গে বাঁধা— আরবির সঙ্গে নয়। হিন্দি গদ্যের ওপরও বাইরের যে প্রভাব পড়েছে সেটা ফারসি— আরবি নয়।

একদা ইরানে যেরকম আর্য ইরানি ভাষা ও সেমিতি আরবি ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফারসি জন্মগ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধি, উর্দু ও কাশ্মিরি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আরবির এই সংঘর্ষ ফারসির মাধ্যমে ঘটেছিল বলে কিংবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফারসির মতো নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারল না। উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম

www.pathagar.com

করেছিলেন ও নতুন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফারসির অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

* * *

বাঙলা আর্যভূমি, কিন্তু এ ভূমির আর্যগণ উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্যের মতো নন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এখানে নয়। তাই মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. বাঙলা দেশকে যখনই বাইরের কোনও শক্তি শাসন করতে চেষ্টা করেছে তখন বাঙালি বিদ্রোহ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাঠান যুগে বাঙলা অতি অল্পকাল পরাধীন ছিল এবং মোগল যুগেও মোটামুটি মাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত বাঙলা দিল্লির শাসন মেনেছে।

২. অন্যান্য আর্যদের তুলনায় বাঙালি কিছুমাত্র কম সংস্কৃতচর্চা করেনি, কিন্তু সে চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আদিশূর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালি উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রিমলাইন্‌ড্‌ হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করেনি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।

৩. বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলি কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালি। এ সাহিত্যে শুধু যে *মহাভারতে*র শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালি মেয়ে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শিদিয়ার আশিক ও পদাবলির শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা' 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-র দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা,— যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালি হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালি মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

* * *

পাঠান আমলে বাঙলা দেশে আরবি-ফারসির চর্চা ব্যাপকভাবে হয়নি। সে যুগে বাঙলাতে লিখিত সরকারি দলিলপত্রে পর্যন্ত আরবি-ফারসি টেক্‌নিকল শব্দ প্রায় নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ অতি অল্প।

খাস পাঠান যুগে তো কথাই নেই, মোগল যুগের প্রারম্ভেও কবি আলাওল যে কাব্য রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই লক্ষণীয়—

উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুরুর-ভঙ্গে যৌবন রসাল ॥

www.pathagar.com

আড় আঁখি বঙ্ক-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন শিহরয় ॥
সম্বরয় গিম-হার, কটির বসন।
চঞ্চল হইল আঁখি, ধৈরয-গমন ॥
চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায় ॥

এ ধরনের কাব্য তখন মুসলমানদের ভিতর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বর্ণনা পাই অন্য এক কবির কাছ থেকে। সৈয়দ সুলতান বলেন,

আপনা দীনের বোল্ একা না বুঝিল।
পরস্তব-সকল লৈয়া সব রহিল ॥

(দীন = ধর্ম; পরস্তব = পরধর্ম কীর্তন। এর পূর্বেই মুসলমানরা পদাবলী কীর্তন রচনা আরম্ভ করেছেন এবং কাজী ফয়জউল্লার 'গোরক্ষ বিজয়' মুসলমানদের ভিতর লোকপ্রিয় হয়ে গিয়েছে।)

মুসলমানরা আপন ধর্মচর্চা না করে 'হিন্দুয়ানি' কাব্য নিয়ে মেতে আছে দেখে মুসলমান মোল্লা-মৌলবিগণ তারস্বরে আপন প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আরবি-ফারসিতে ধর্মচর্চা করবার জন্য বারবার কড়া ফতোয়া জারি করেছেন।

তখন সৈয়দ সুলতান বললেন, 'আমরা বাঙলা ছাড়ব না; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রচর্চাও করব। তাই বাঙলাতেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা হবে।'

আরবি-ফারসি ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে, না বুঝে মূর্খসুত ॥
যে সবে আপন বুলি না পারে বুঝিতে।
পাঁচালী রচিলাম করি আছয়ে দূষিতে ॥
আল্লায় বলিছে, 'মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে কইলুম রসুল প্রকাশ।'

(আলিমান = আলিমগণ = পণ্ডিতগণ; রসূল আল্লার প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর।)

অতি মোক্ষম জবাব। সৈয়দ সুলতান কুরানের বচন উদ্ধৃত করে সপ্রমাণ করলেন, বাঙলাতেই বাঙালি মুসলমানের শাস্ত্রচর্চা করা ফর্‌জ্— অবশ্য করণীয়।

সৈয়দ সুলতান কিন্তু আটঘাট বেঁধে পয়গম্বর সাহেবের বাণী বাঙলাতে প্রকাশ করেছেন। নিতান্ত যে কটি আরবি শব্দ ব্যবহার না করলেই নয়, তিনি মাত্র সেগুলোই ব্যবহার করেছেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মাধ্যমেই ইসলাম প্রকাশ করেছেন।

তোমার সবের মুই জানো হিতকারী।
ইমান-ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি ॥
যেরূপে সৃজন হইল সুরাসুরগণ।
যেরূপে সৃজন হইল এ তিন ভুবন ॥
যেরূপে আদম ইবা সৃজন হইল।
যেরূপে যতেক পয়গম্বর উপজিল ॥

www.pathagar.com

বঙ্গেতে এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী-বংশ পাঁচালীতে সকল শুনিল।

এস্থলে দ্রষ্টব্য, হিন্দু-মুসলমান উভয়কে মুসলমান ধর্ম বোঝাতে গিয়ে কবি এমন সব বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যা মুসলমান ধর্মে নেই। 'সুর' 'অসুর' কল্পনা ইসলামে নেই। 'তিন ভুবন' ইসলামে নেই, আছে 'দুই ভুবন'। তাঁর পুস্তকের নাম 'নবীবংশ' ও হিন্দু 'হরিবংশের' অনুকরণ— আরবিতে এই ধরনের নাম নেই।

এমনকি তিনি পয়গম্বর হজরত মুহম্মদকে 'অবতার' আখ্যা দিয়ে মোল্লাদের মতে পাপ করেছেন; কারণ মুসলিম শাস্ত্রমতে আল্লা মনুষ্যদেহ গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি মানুষদের একজনকে বেছে তাঁকে তাঁর মুখপাত্র করেন। সৈয়দ সুলতান কিন্তু বলছেন—

মুহম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার ॥

আর সবচেয়ে বড় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সৈয়দ সাহেব, এই দুইটি ছত্রে—

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার, অমূল্য সেই ধন ॥

এই দুটি ছত্রে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে, সে তত্ত্ব কি আমরা আজও বুঝতে পেরেছি? এই সৈয়দ সুলতানকে তখনকার দিনের মোল্লা-মৌলবিরা 'ইসলামের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে', 'আরবির মর্যাদা লোপ পাবে' এই ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মুনাফিক' অর্থাৎ 'ভণ্ড' অর্থাৎ 'ধর্মধ্বংসকারী' আখ্যা দিয়ে 'ফতোয়া' পর্যন্ত জারি করেছেন। সাহসী কবি কিন্তু অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার জয়গান গেয়ে গেছেন। এ লোক যদি প্রকৃত বাঙালি না হয়, তবে বাঙালি কে?

সে শুভবুদ্ধি, সে সাহস কি আজও আমাদের হয়েছে? কেউ বলে 'রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হিন্দি গ্রহণ কর', কেউ বলে 'ইংরেজি বর্জন করলে আমরা বর্বর হয়ে যাব'। হায়, বাঙলার পদমর্যাদা কেউ স্বীকার করে না।

যখন দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই, তখন মাতৃভাষার গৌরবগান গেয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করে সবাই; কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে, নানা প্রলোভন-বিভীষিকার সম্মুখে মাতৃভাষাকে নিজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে পারাতেই প্রকৃত সাহস, প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির লক্ষণ। সৈয়দ সুলতানের দুইশত বৎসর পরে ইংরেজি ভাষা বাঙালিকে প্রলোভন দেখিয়েছিল আরেকবার। কিন্তু মুসলমান সুলতানের ন্যায় খ্রিস্টান মাইকেল তখন উচ্চকণ্ঠে বাঙলার জয়গান গেয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের অনুকরণকারীরা কিন্তু তাঁর মতো বিচক্ষণ ভাষাবিদ ছিলেন না : ফলে বাঙলাতে যে পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ প্রবেশ করতে লাগল তাতে ভাষার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হতে লাগল। ইতোমধ্যে— মোগল যুগের শেষের দিকে— উর্দু ভাষাও বাঙলা দেশে প্রবেশ করেছে। তাই তখন যে বাঙলা পাচ্ছি তার উদাহরণ—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচা ॥
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে।...

www.pathagar.com

রাতদিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে ॥
জানা গেল বাত যাওয়া জানা গেল বাত।
কাপড়া লেও আওর আও মেরা সাথ ॥

যুক্তি নয়, অজুহাত হিসেবে বলা যেতে পারে, আকবরের আমল থেকে বহুল ফারসি শিক্ষাদানের ফলে বাঙলা দেশে তখন প্রচুর লোক বিস্তর আরবি-ফারসি শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এটি কিন্তু কোনও সংযুক্তি নয়। কারণ আজ আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিস্তর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি : তাই বলে সাহিত্যসৃষ্টির সময় বে-এক্তেয়ার হয়ে যত্র-তত্র ভূরি ভূরি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিনে।

কিন্তু সত্য কবি পথভ্রষ্ট হন না। তার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পাই, চট্টগ্রামের মহিলা কবি 'শ্রীমতী রহীমুন্নিসা'র (আশা করি 'শ্রীমতী' লেখাতে কেউ আপত্তি করবেন না, কারণ তিনি নিজেই তাঁর কাব্যে আপন পরিচয় দেবার সময় লিখেছেন—

'স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ ভারতী।
রহিমুনিচা নাম জান আদ্যে ছিরীমতী ॥')

এই মহিলা কবির সঙ্গে হালে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ববঙ্গের বাঙলা একাডেমীর প্রথম ডাইরেক্টর (*বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ. ৫৩)। তাঁর মতে '১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই রহীমু'ন্‌নিসা আবির্ভূত হয়েছিলেন।' ইনিও সৈয়দ সুলতানের মতো সৈয়দ বংশের মেয়ে এবং পরিবারে প্রচুর আরবি-ফারসির চর্চা থাকা সত্ত্বেও সুস্থ-সবল এবং মধুর বাংলায় কবিতা রচনা করে গিয়েছেন।

এঁর হাতের লেখা খুব সম্ভব সুন্দর ছিল। তাই বোধ করি তাঁর স্বামী তাঁকে কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করতে আদেশ দেন :—

শুন গুণিগণ হই এক মন,
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে টুটা পদ হৈলে
শুধারিঅ সর্বজন ॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভারতী ॥
পদের উকতি বুঝি কি শকতি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিল গাঁথি ॥

www.pathagar.com

রহীমুন্নিসার স্বরচিত কাব্য অল্পই পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর একটি 'বারমাস্যা' বড়ই করুণ এবং মধুর। পূর্ববঙ্গের কবিরা সচরাচর প্রিয়বিরহে বারমাস্যা রচনা করেছেন— রহীমুন্নিসা ভ্রাতৃশোকে তাঁর নব বারমাস্যা রচনা করেছেন।

আশ্বিনেতে খোয়াময়   কান্দে তরুলতাচয়
ভাই বলি কান্দে উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি   বনে কান্দে কুরঙ্গিণী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥
খোয়া = কুয়াশা

অন্য এক স্থলে 'কন্যাহারা জননী'র শোকাতুরার ক্রন্দন প্রকাশ করেছেন অতুলনীয় সরল বাঙলায়—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার
মোর জাদু গেল ফিরি না আসিল আর ॥

এঁর রচনায় সত্যই মধুর কবি-প্রতিভা 'বারেবার' ধরা পড়ে। পাঠকদের মূল প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ জানাই।

*   *   *

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব প্রধানত ইংরেজির সঙ্গে। এবং সেই দ্বন্দ্ব বিদ্রোহরূপ ধারণ করল পুব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে। বাঙলা আবার জয়ী হল— কিন্তু এবারে তার জয়মূল্য দিতে হল বুকের রক্ত দিয়ে— কিন্তু আব্রু, ইজ্জত, ইমান দিয়ে নয়। পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলার লোক বাঙলাতে আরেক দফে আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করে ভাষাকে 'পাক' করতে প্রলোভিত হল না!

তাই এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি 'মামদো'র পুনর্জন্ম'। 'মামদো'রই যখন কোনও অস্তিত্ব নেই, তখন তার পুনর্জন্ম হবে কী প্রকারে? পুব বাঙলার লেখকদের স্কন্ধে আরবি-ফারসি শব্দের মামদো ভর করবে, আর তারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আরবি-ফারসিতে অর্থাৎ 'যাবনী মেশালে' কিচিরমিচির করতে আরম্ভ করবে, বিজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবে— যার মাথামুণ্ডু পশ্চিম বাঙলার লোক বুঝতে পারবে না, সে ভয় 'স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম'।

দিল্লি স্থাপত্য

যাঁরা এই শীতে প্রথম দিল্লি যাচ্ছেন কিংবা যারা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান মোগলদের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পাননি, এ লেখাটি তাঁদের জন্য। এবং বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁদের স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ওই রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিতে কিঞ্চিৎ 'মাস্টারি মাস্টারি' ভাব থেকে যাবে বলে গুণীজনকে আগের থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।

www.pathagar.com

কোনও কালে যে ব্যক্তি গান শোনেনি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙলা দেশে এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বুঝতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনও সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উটকো একখানা ফরাসি উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কি না এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলকধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লি যাবার পথ পাবেন না— আর 'দিল্লি দূর অস্ত' তো বটেই।

কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মূল রস একই— ইংরেজিতে যাকে বলে ইসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্ময় রূপ (যথা কাব্যের) যদি অন্য রসের মৃন্ময় রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায় টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন 'ভাষায়', নিজস্ব শৈলীতে এবং আঙ্গিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনও ভাবনা নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নতুন নতুন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনার সঙ্গে আকাশপানে ধাওয়া করেছে— নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

স্থাপত্যের প্রধান রস— প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অন্যগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই— তার কম্পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ধরুন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছত্রি (কিয়োস্ক্, পেভিলিয়ন্), ভিত্তি এমনভাবে সাজানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, সঙ্গীতেও তাই। কয়েকটি স্বর— সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো হয় যে শোনামাত্রই আপনার মন এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়।

এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিংবা উপন্যাসে পাওয়া যায় তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে আরকিটেক্টনিকাল্ মহিমা আছে— *মহাভারতে* আছে, *ফাউস্টে* আছে এবং *উয়োর অ্যান্ড পিসে* আছে; *জ্যাঁ ক্রিস্তফ* উত্তম উপন্যাস কিন্তু এ-গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা গীতিকাব্যে যদিও কম্পজিশন থাকে— তা সে যতই কম হোক না কেন, তাতে আরকিটেক্টনিকাল্ বৈশিষ্ট্য থাকে না।[১]

স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার পর গুণীরা বলেন, এবং সার্থক স্থাপত্যে স্থপতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিখুঁত সামঞ্জস্য করার পর সেগুলোকে অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর করে তোলেন। অধম একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। কিন্তু এ গোলকধাঁধায়ও সে ঢুকতে নারাজ। দিল্লির দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আমে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, তুগলুক যুগের স্থাপত্যে

---

১. 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি সার্থক, এবং এই নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

www.pathagar.com

অলঙ্কার প্রায় নেই— পাঠক দিল্লি দেখার সময় এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন[২]। অথচ দুই-ই সার্থক রসসৃষ্টি।

এই সামঞ্জস্য যদি খাড়াই-চওড়াই— অর্থাৎ মাত্র দুই দিক— নিয়ে হয় তবে সেটা ছবি। শুধু সামনের দিক থেকে দেখা যায়। তিন দিক নিয়ে— তিন ডাইমেনশনাল— হলে সেটা ভাস্কর্য কিংবা স্থাপত্য। কিন্তু অনেক সময় মূর্তির পিছনদিকটা অবহেলা করা হয় বলে সেটাকে শুধু সামনের দিক থেকে দেখতে হয়। গড়ের মাঠের যেসব মূর্তি ঘোড়সওয়ার নয় সেগুলো পিছন থেকে দেখতে রীতিমতো খারাপ লাগে (বস্তুত এই সমস্যা সমাধানের জন্যই অনেক নিরীহ লোককে ঘোড়ায় চড়ানো হয়েছে) এবং বাসট্‌গুলো পিছন থেকে রীতিমতো কদাকার বলে সেগুলোকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দেওয়া হয়— যাতে করে পিছন থেকে দেখবার কোনও সম্ভাবনাই না-থাকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি জলের কাছে রয়েছে বলেই ওই সমস্যাটির সমাধান হয়েছে— জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে মূর্তির পিছনদিকে তাকাবে কজন লোকে?

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা সেটি হবার জো নেই। স্থাপত্য এমন হবে যে সেটাকে যেন সবদিক থেকে এবং বিশেষ করে যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। কোনও জায়গা থেকে যদি, ধরুন, মনে হয়, দুটো মিনার এক হয়ে গিয়ে কেমন যেন দেউড়িটাকে ঢেকে অপ্রিয়দর্শন করে তুলেছে তবে বুঝবেন স্থপতি আর্টের কোনও একটা সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারেননি বলেই এস্থলে তাল কেটেছেন, অর্থাৎ রসভঙ্গ করেছেন।

মসজিদ মাত্রেরই একটা খুঁত, ঠিক এই কারণে থেকে যায়! শাস্ত্রের হুকুম মসজিদের পশ্চিম দিক যেন বন্ধ থাকে, যাতে করে নমাজিদের সামনে কোনও বস্তু তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ না-করতে পারে। ফলে বাধ্য হয়ে স্থপতিকে পশ্চিম দিকে দিতে হয় খাড়া পাঁচিল। এটার সঙ্গে আর বাদবাকি তিন দিক কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না বলে, মসজিদ শুধু তিন দিক থেকে দেখা যায়। ধর্মতলার টিপ্‌পু সুলতানের মসজিদ কিছু উত্তম রসসৃষ্টি নয়— দক্ষিণি ঢঙের গম্বুজগুলোই যা দেখবার মতো— কিন্তু পাঠক সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই সমস্যাটা বুঝে যাবেন। দিল্লির পুরনো মসজিদে-মসজিদে পাঠক দেখবেন, স্থপতি কতরকম চেষ্টা করেছেন এই সমস্যা সমাধানের।

সমাধি, রাজপ্রাসাদ, বিজয়স্তম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনও বাধাবন্ধক নেই। তাই সেগুলোতে এ অপরিপূর্ণতা থাকা মারাত্মক। সচরাচর থাকেও না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি সার্থক স্থাপত্য যেকোনো জায়গাতে, যেকোনো দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, সবচেয়ে ভালো কোন জায়গা থেকে দেখা যায়? উচ্চাঙ্গ মোগলস্থাপত্য মাত্রেই স্থপতি এর নির্দেশ নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। স্থাপত্যে পৌঁছবার বেশকিছুটা আগে যে প্রধান তোরণদ্বার (দেউড়ি-গেটওয়ে) থাকে— এরই উপর নহ্‌বত্‌খানা— তার ঠিক নিচে দাঁড়ালেই স্থাপত্যের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। সাধারণত ছবি এ-জায়গা থেকেই ভালো ওঠে। আর যদি নিজের রসবোধ তার সঙ্গে সংযোজন করতে

---

২. 'তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটি উজলিল দশ দিক—' এবং 'পিকবরবর নব-পল্লব মাঝারে' দুটিই সার্থক। প্রথমটিতে অলঙ্কার নেই। অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হলে কাব্য দুর্বল হয়ে পড়ে। *মেঘদূতের* তুলনায় যেরকম *গীত-গোবিন্দ*।

www.pathagar.com

চান, তবে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেউড়ির আর্চসুদ্ধ ছবি তুললে তাতে 'ইসথেটিক ইফেকট' আসবে— যদিও মূল স্থাপত্যের কিছুটা হয়তো তাতে করে কাটা পড়বে।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমার মনে হয় স্থাপত্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত সে আলোচনা তোলাই সঙ্গত।

* * *

দিল্লির স্থাপত্য তার রাজবংশানুযায়ী ভাগ করা যায়।

৷৷ ১ ৷৷ দাস বংশ

কুতুব মিনার, কওওতুল-ইসলাম মসজিদ, ইলতুতমিশের সমাধি। (কওওতুল-ইসলাম মসজিদের আঙিনায়— সেহ্‌ন্‌— চন্দ্ররাজা নির্মিত একটি শতকরা নিরানব্বই ভাগের লৌহস্তম্ভ আছে। এটি ও মসজিদের থামগুলো হিন্দুযুগের। — সবকটি কুতুবের গা ঘেঁষে।

৷৷ ২ ৷৷ খিলজি-বংশ

আলাউদ্দিন খিলজি নির্মিত 'আলা-ই-দরওয়াজা'— কুতুবের গা ঘেঁষে। আলাউদ্দিন কিংবা তাঁর ছেলের ('দেবল-দেবীর' বল্লভ) তৈরি মসজিদ— দিল্লি-মথুরা ট্রাঙ্ক রোডের উপর (নিউ দিল্লি থেকে মাইলখানেক) নিজামউদ্দিন আউলিয়ার[৩] দরগার ভিতর[৪]।

৷৷ ৩ ৷৷ তুগলুক-বংশ

গিয়াসউদ্‌দীন তুগলুক[৫] নির্মিত আপন সমাধি— কুতুব থেকে মাইল তিনেক দূরে তাঁরই নির্মিত তুগলুকাবাদের সামনে; তুগলুকাবাদ।

ফিরোজ তুগলুক নির্মিত হাউজ খাস— দিল্লি থেকে কুতুব যাবার পথে রাস্তার ডানদিকে। ফিরোজ নির্মিত ফিরোজশাহ-কোট্‌লা— দিল্লি এবং নয়াদিল্লির প্রায় মাঝখানে (অন্যান্য দ্রষ্টব্যের ভিতর এখানে আছে একটি অশোকস্তম্ভ; ফিরোজ এটাকে দিল্লিতে আনিয়ে উঁচু ইমারত বানিয়ে তাঁর উপরে চড়ান)।

৷৷ ৪ ৷৷ সৈয়দ এবং লোদি-বংশ

লোদি গার্ডেন্‌স— নয়াদিল্লির লোদি এস্‌টেটের গা ঘেঁষে— ভিতরে আছে, (ক) মুহম্মদ শাহ সৈয়দের কবর, (খ) সিকন্দর লোদির তৈরি মসজিদ এবং মসজিদের প্রবেশগৃহ, (গ) অজানা কবর এবং (ঘ) সিকন্দর লোদির কবর।

ইসা খানের কবর— হুমায়ুনের কবরের বাইরে। যদিও পরবর্তী যুগের, তবু লোদিশৈলীতে তৈরি।

৷৷ ৫ ৷৷ মোগল-বংশ

বাবুর কিছু তৈরি করার সময় পাননি। কেউ কেউ বলেন, পালম অ্যারপোর্টের সামনে যে দুর্গের মতো সরাই এটি তাঁর হুকুমে তৈরি। এতে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

৩, ৪. 'দৃষ্টিপাতে' উল্লিখিত 'দিল্লি দূর অস্ত' কাহিনীর নায়কদ্বয়। গিয়াসের ছেলে 'পাগলা' রাজা মহম্মদ তুগলুকের তৈরি 'আদিলাবাদ'-এর ভগ্নাবশেষে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। মুহম্মদ এবং নিজামউদ্দিনের মিত্র কবি-সম্রাট আমির খুসরৌ ('দেবলা-দেবীর' প্রেমের কাহিনী ইনিই প্রথম ফারসিতে লেখেন) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনির কবর নিজামউদ্দিনের দরগার ভিতর।

৫. ইলতুত্‌মিশের কন্যা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার যে কবর দিল্লিতে আছে সেটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

হুমায়ুনও এক পুরনো কিলা (ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের পিছনে) ছাড়া কিছু করে যেতে পারেননি। পুরনো কেল্লারও কতখানি তাঁর, কতখানি শের শা'র, বলা শক্ত। কেল্লার ভিতরে মসজিদটি কিন্তু শের শা'র তৈরি এবং এর শৈলী পাঠান-মোগল থেকে ভিন্ন। সাসারামে শেরের কবর সৈয়দ-লোদি শৈলীতে।

হুমায়ুনের বিধবার— আকবরের মাতার— তৈরি হুমায়ুনের কবর। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার সামনে, দিল্লি-মথুরা রোডের ওপাশে।

আকবরের কীর্তি-কলা আগ্রাতে— সেকেন্দ্রা ফতহ্-পুর সিক্রি, আগ্রা দুর্গ। ওই সময়ে তৈরি দিল্লিতে আছে আৎকা খান, আজিজ কোকলতাশ, আব্দুর রহীম খান-খানা ও আদ্‌হম্ খানের কবর।

শাহাজাহান— দিল্লি দুর্গ বা লাল কিলা। তার-ই সামনে চাঁদনি চৌকের কাছে জাম-ই মসজিদ।

ঔরঙ্গজেব— লাল কিলার ভিতর মোতি মসজিদ।

ঔরঙ্গজেবের ভগ্নী রৌশনারার নিজের তৈরি সমাধি— রৌশনারা-গার্ডেনসের ভিতর।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, ঔরঙ্গজেবের পরের বাদশাদের অর্থ ও প্রভাব দুই-ই কম ছিল বলে এঁরা প্রায় কিছুই করে যেতে পারেননি। যেটুকু আছে তাতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু স্থাপত্যের লক্ষণ প্রায় নেই— স্থপতি সে-চেষ্টা করেনওনি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য জাহানারা, মুহম্মদ শাহ্ বাদশাহ্ রঙ্গিলা, এবং দ্বিতীয় আকবরের (ইনি রাজা রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন) কবর। তিনটিই নিজামউদ্দিনের দরগার ভিতরে। মোগল স্থাপত্যের 'শেষ নিশ্বাস' সফ্‌দর্-জঙ্গের সমাধি ও তৎসংলগ্ন মসজিদ— কুলোকে বলে এটার মার্বেল আব্দুর রহীম খানখানার কবর থেকে চুরি করা। ইমারতটি যদিও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তবু তার সৌন্দর্য নিম্নশ্রেণির, রুচির বিলক্ষণ অধোগতি এতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবিতে হুমায়ুনের কবর, তাজমহল, এমনকি আৎকা খানের ছোট কবরটির সঙ্গে তুলনা করলেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। আৎকা খানের কবরটি আমার বড় প্রিয় স্থাপত্য। দিল্লির লোক এ কবরটির খবর রাখে না, কারণ এটি নিজামউদ্দিনের দরগার এক নিভৃত কোণে পড়ে আছে।

দিল্লিতে তিনটি বড় দরগা আছে। প্রথমটি কুৎবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির। ইনি কুৎবউদ্‌দীন আইবকের গুরু ছিলেন। অনেকের ধারণা আইবক গুরুর স্মরণে কুতুব মিনার নির্মাণ করেছিলেন। দরগাটি কুতুব মিনারের কাছেই এবং 'কুতুব সাহেব' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার এবং তৃতীয়টি নাসিরউদ্দিন 'চিরাগ দিল্লি'র। দরগাটি দিল্লি থেকে মাইল তিনেক দূরে।

প্রথমটির পত্তন দাস-আমলে, দ্বিতীয়টির খিলজি আমলে এবং তৃতীয়টির তুগলুক আমলে। সেই যুগ থেকে শেষ-মোগল পর্যন্ত এসব দরগাতে বহু ভক্ত নানা ইমারত গড়েছেন বলে অল্পের ভিতর সব স্থাপত্যেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ কিছুটা না বসা পর্যন্ত এসব জায়গায় গবেষণা করা বিপজ্জনক।

কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু

www.pathagar.com

একস্‌পেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল— কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুতুব প্রথম এবং শেষ একস্‌পেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করেনি; কাজেই গুণীজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম, ফার্গুসন, কার স্টিফেন, স্যর সৈয়দ আহমদ অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোনও উত্তর দিতে পারেননি।

কুতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশি' ও 'কোণে'র পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশি, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ; চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কী ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলুক (যিনি 'অশোকস্তম্ভ' দিল্লি আনেন; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমারত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামত করে দিতেন— দিল্লির অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বেল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদিরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কী ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই।[৬] দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কী রাজমুকুট পরিয়েছিলেন— সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কি না, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দ্যুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মাল-মশলা! গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোট করে করে, গুটিকয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনও 'বাঁশি', কখনও 'কোণে'র নকশা কেটে। 'প্রপর্শনে'র এরকম চূড়ান্ত পৃথিবীর আর কোনও মিনারে পাওয়া যায় না।

আর তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশি এবং কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে একসারি অন্তর অন্তর আরবি লেখার সার— সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু— ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনও ভঙ্গ হয়নি, কভু-বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশি, কোনও ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশি। আটশত বৎসর একসঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে

৬. গেল শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কুতুবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যালকনি (গ্যালারির) রেলিঙগুলো ছিল বলে তিনি সেখানে চারপাপড়ির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান— নিচের হানিকুম্ অর্থাৎ মৌমাছির চাকের নকশা মূল স্থপতির— এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটে দেখে দিল্লি-ওলারা সত্রাসে তারস্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বৎসর পরে লর্ড কার্জন সেই মুণ্ডুটি কেটে নিচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন।

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথমদিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনও মিনার কখনও মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারত গড়েছেন কিন্তু 'কুতুবের চেয়েও ভালো মিনার গড়ব' এ সাহস কেউ দেখাননি। যে ইংরেজ দিল্লিতে সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজেকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সে-ও বিলক্ষণ জানত কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনও স্থপতির কর্ম নয়।[৭]

আলাউদ্দিন খিলজির মতো দুঃসাহসী রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন। একমাত্র তিনিই চেয়েছিলেন, কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুতুবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন— বাসনা ছিল মিনারটি কুতুবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম সাইজ আছে— অর্থাৎ যার চেয়ে বড় হলে ইমারত খারাপ দেখায়, ছোট হলেও খারাপ দেখায় (সর্ব কলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)— কাজেই আলাউদ্দিনের চূড়া ডবল হলে ফল কী ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে-না-হতেই ওপারের ডাক খিলজির কানে এসে পৌঁছল, যে পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

আপন মহিমায় নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনও ইমারতের অঙ্গ হিসেবে যে মিনার কখনও থাকে, কখনও থাকে না, তার নাম মিনারেট— মিনারিকা। কুতুবের পর পাঠান-মোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে; কিন্তু সেগুলোও কুতুবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুতুবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুতুবকে স্মরণ না করে। না হলে যে তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকাস্তম্ভে 'নোয়াটুকু'র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়েল— তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।

দিল্লি-আগ্রার বহু দূরে, কুতুবের আওতার বাইরে, গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুতুবের কোনও মিল নেই এবং বোধহয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমদের— এঁরই নামে আহমদাবাদ— বেগম রানি সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুলতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

---

৭. অক্টরলনি মনুমেন্টে কোনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুতুবের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়— সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়বাজারের দালানকোঠার সঙ্গে কেউ তাজের তুলনা করে না।

www.pathagar.com

কুতুবের সঙ্গে সঙ্গে— আসল কুতুব তৈরি হয় প্রথম তলা থেকে নমাজের আজানের জন্য— নির্মিত হয় কুওওতুল ইসলাম মসজিদ। এ মসজিদে এখন দর্শনীয় তার উন্নতদর্শন তোরণ (আর্চ) এবং স্তম্ভগুলো। ভারতীয় কারিগর তখনও জোড়ের পাথর (কি-স্টোন) তৈরি করে তার গায়ে গায়ে চৌকো পাথর লাগিয়ে আর্চ বানাতে শেখেনি বলে[৮] আর্চের সঙ্গে জোড়া বাকি ইমারত ভেঙে পড়েছে, কিন্তু রসের বিচারে এ আর্চটি এখনও অতুলনীয়। এর শান্ত গাম্ভীর্য, আপন কৌলীন্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঋজু অবস্থিতি নিতান্ত অরসিকজনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরবর্তী যুগে বহু জায়গায় বিস্তর আর্চ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রসাদগুণ এখনও অতুলনীয়।

এবং এর গায়ে যে হিন্দু কারুকার্য তার সুনিপুণ দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মন্দাক্রান্তা গতিচ্ছন্দ দেখে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন অজন্তা-ইলোরার চিত্রকর শিলাকর দু জনে মিলে প্রাণের আনন্দে এর প্রতিটি রেখা প্রতিটি বক্র প্রতিটি চক্র এঁকে চলেছে। এদের নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল যে মুসলমান স্থাপত্যে পশুপক্ষী আঁকা বারণ। সেইটে মেনে নিয়ে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে 'শেষনাগ' মতিফকে এরা সাপ না বানিয়েও সাপ এঁকেছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কলার সঙ্গে এরা কুরানের হরফও খোদাই করেছে সমান দক্ষতা নিয়ে। উভয়ের সংমিশ্রণ অপূর্ব, রসসৃষ্টি অসামান্য।

কুওওতুল ইসলাম মসজিদের থামগুলো হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির থেকে নেওয়া। এদের গায়ে দর্শক বিস্তর পশুপক্ষী, বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর নানা মূর্তি দেখতে পাবেন। মসজিদ গড়ার সময় এগুলোর গায়ে পলেস্তরা লাগিয়ে মূর্তিগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পলেস্তরা খসে যাওয়াতে এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

এভাবে প্রতিটি ইমারত নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা হলে দশ-ভলুমি কেতাব লিখতে হয়— এবং সেগুলো কেউ পড়বে না। আমার উদ্দেশ্য— বাকি ইমারতগুলো দর্শক যেন নিজে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

যেমন, কুওওতুল ইসলামের গম্বুজ রসের ক্ষেত্রে নগণ্য— তার পরের ইমারত ইলতুৎমিশের সমাধিতে সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে— খিলজি যুগে সেটা সুন্দর হতে আরম্ভ করেছে, তুগলুক যুগে গম্বুজ রীতিমতো রসসৃষ্টি করে ফেলেছে; সৈয়দ-লোদি যুগে সে পৃথিবীর আর দশটা গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে, হুমায়ুনের গম্বুজকে তো কেউ কেউ তাজের চেয়েও ভালো বলেছেন, আর তাজের তন্বঙ্গ গম্বুজ, শুনি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখলে পরে তার ক্ষীণ কটিকে নাকি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

---

৮. ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্থাপত্যের অংশ বটে কিন্তু বিশুদ্ধ স্থাপত্য-রস আস্বাদনের সময় তার স্থান অতি নিচে। আর্চ, ডোম বানাতে 'কি-স্টোন' ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়ারি ব্যাপার পাঠক চেম্বার অভিধান দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। এসব স্থাপত্যের পশ্চাতে কী অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিঙ স্কিল আছে তার আলোচনা আমি আদপেই করিনি। যেমন, কুতুবের আসল কেরামতি যে এত অল্প গোড়া (বেস্) নিয়ে এত উঁচু মিনার আর কোথাও হয়নি। অদ্ভুত ভারসাম্যই (ব্যালান্স) তার কারণ। এ যেন বাজিকর হাতের আঙুলের ডগায় বিশগজি বাঁশ খাড়া করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারি হিসেবে কণামাত্র ভুল থাকলে কুতুব হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেত।

www.pathagar.com

কিংবা আর্চের উত্থান-পতন দেখুন। কিংবা দেখুন ছত্রির আবির্ভাব ক্রমবিকাশ। হুমায়ুনের কবর ও তাজের ছাতের উপরকার ছত্রির মতো ছত্রি পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার মুসলমানেরা এদেশে এসে শিখল। তাই এদেশের স্থাপত্যের স্কাই-লাইন ইরান-তুরানের স্থাপত্যকে এ-বাবদে অনায়াসে হার মানায়।

কিংবা দেখুন, ভিতরকার কারুকার্য, যার পরিসমাপ্তি তাজের 'মর্মরস্বপ্নে'।

দাস-যুগের শেষের দিকে মুসলিম জিওমেট্রিক ডিজাইনের বাড়াবাড়ি হয়েছিল, খিলজি-যুগে ভারসাম্য ফিরে পেল।

তুগলুক যুগে পাবেন দার্ঢ্য— শক্তিশালী স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা। অলঙ্কার এখানে বাহুল্যরূপে বর্জিত। দেয়াল বাঁকা— যেন পিরামিডের ঢঙে ট্যারচা করে একে আরও মজবুত করার চেষ্টা হয়েছে, গম্বুজও শক্তির পরিচায়ক। লাল পাথর, কালো শ্লেট (তখনও কালো মার্বেল এ-দেশে আসেনি) এবং মর্মরের ধবল— এই তিন রঙের খেলা নিয়েই স্থপতি এখানে অলঙ্কারহীন দৃঢ়তার একঘেয়েমি ভেঙেছেন। গিয়াসউদ্দিন তুগলুকের কবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

সৈয়দ-লোদি বংশদ্বয়ের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই ছিল সামান্য। তাই এঁদের কলা-প্রচেষ্টা ছোট ইমারতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদিকে ইরান-তুরানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে সে-দিক থেকে নব নব অনুপ্রেরণাও আসছিল না। ফলে তাদের স্থাপত্যে হিন্দুপ্রাধান্য বেশি এবং ছোট ইমারতে অলঙ্কারের প্রয়োজন বড় ইমারতের চেয়ে বেশি। কম্পজিশনেও এই প্রথম হিন্দুপ্রভাব স্পষ্ট হয়ে এল। বস্তুত এই আটকোণওলা ইমারত এবং আটদিকের ঘেরা বারান্দা বৌদ্ধস্তূপ এবং তার প্রদক্ষিণচক্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুরা স্তম্ভ-নির্মাণে চিরকালই দক্ষ, ছত্রিও তাদেরই সৃষ্টি। হিন্দু ছজ্জা (ড্রিপস্টোন— এগিয়ে আসা কার্নিসের মতো) ছাতের বৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে প্রয়োজন— ইরানে দরকার নেই বললেও চলে— সে-সব এসে এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তুগলুক প্রভাব এখানে অতি সামান্য— কেবলমাত্র ট্যারচা স্তম্ভে কিছুটা পাওয়া যায়। সৈয়দ-লোদি স্থাপত্য দেখে মানুষ হতবাক হয় না সত্য, কিন্তু এর এমন একটা কমপেক্টনেস্ বা ঠাস-বুনুনি আছে যা অন্য স্থাপত্যে বিরল। অল্প দিয়ে রসসৃষ্টিতে সৈয়দ-লোদি প্রথম না হলেও প্রধানদের একজন।

মোগল-যুগ আরম্ভ হল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরান-তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছবি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দুপ্রাধান্য বেশি। কিন্তু এতে ইরানি ভাব এত কমে গিয়েছে যে, কোনও কোনও ইমারতে কার প্রাধান্য বেশি কিছুতেই স্থির করা যায় না। সেকেন্দ্রার গম্বুজ শেষ করার পূর্বেই আকবর ইহলোক ত্যাগ করেন— তাই বলা শক্ত সম্পূর্ণ সমাধি মনে রসের কোন্ ভাবের উদয় করে দিত। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ যে অলঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে সত্য তো পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এতদিন বলা হত, পাঠান স্থাপত্যে স্থপতি ও স্বর্ণকার একজোটে কাজ করেছেন। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ দেখে লোকে বলল, এইবারে এসে জহুরিও যোগ দিয়েছেন।

মোগল-কলা এত বিচিত্র ও ভিন্নমুখী যে, তাকে গুটিকয়েক সূত্রে ফেলা প্রায় অসম্ভব। তবে স্থাপত্যের বিকাশ দেখতে হলে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হুমায়ুনের কবর ও তাজ দুটি মিলিয়ে

www.pathagar.com

দেখা। দুটোর গম্বুজ মিলিয়ে দেখুন, ছত্রিগুলো কার ভালো (এখানে বলা উচিত হুমায়ুনের ছত্রিগুলো নীল টাইলে ঢাকা ছিল; এখন উঠে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে— তাই আগে ছিল গম্বুজ মর্মরের সাদা, পুরো ইমারত লাল পাথরের আর ছত্রিগুলোর গম্বুজ নীল; তাজে তিনই মার্বেলের); হুমায়ুনের ভিত্তিতে এক সার আর্চ (তার ভিতর দিয়ে নিচে যাওয়া যায়), তাজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাত্র; গুলদস্তাজ (মিনারিকারও ছোট মিনারিকা যার শেষ হয় অর্ধস্ফুট পদ্মকোরকে) দুই ইমারতেই একরকম; নির্মাণকালে হুমায়ুনে ছিল লাল-সাদা-নীলের সামঞ্জস্য, তাজ শুভ্র-ধবল এবং সবচেয়ে বড় পার্থক্য— হুমায়ুনে মিনারিকা নেই, তাজের চার কোণে চারটি। আপনার কোনটি ভালো লাগে? আর এই শৈলীর অধঃপতন দেখতে হলে দেখুন সফদরজঙ্গের কবর— ওয়েলিংডন অ্যারোড্রামের কাছে।

স্পষ্ট দেখছি হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।

তার কারণ, অনেক ভেবে আমি মন স্থির করেছি, হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিধবা— স্বামীর জন্য। তাই তাতে পৌরুষ সমধিক। তাজ নির্মাণ করেছেন বিরহকাতর স্বামী— প্রিয়ার জন্য। তাই সেটিতে লালিত্য বেশি।

বেজো না চরণে চরণে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে নাকি নবীন সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা নিয়ে গিয়ে চাঁইদের সার্টিফিকেট চান। বেচারিদের বিশ্বাস, চাঁইরা উত্তম সার্টিফিকেট দিলে সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি পেয়ে যাবেন।

চাঁইদের কেউ-কেউ সার্টিফিকেট দেন, কেউ লেখকদের অন্য চাঁইদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কেউ-বা অসুখের ভান করে দেখাই করেন না। এ বাবদে পূজনীয় রাজশেখরবাবু রাজকীয় পন্থাটি বের করে আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন— এমনকি মাঝে-মধ্যে না চাইলেও দেন। তাঁর বয়স হয়েছে। শেষের কটি দিন শান্তিতে কাটাতে চান। সোজাসুজি 'দেব না' বললে তাঁকে আর বাঁচতে হবে না, এবং 'দেব-দিচ্ছি, দেব-দিচ্ছি' করে টাল-বাহানা দেবার মতো শক্তিও তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ অমিতবীর্য পুরুষসিংহবৎ ছিলেন, উমেদওয়ারদের ঠেকাবার মতো তাঁর সেক্রেটারিও ছিলেন— তবু তিনিও অকাতরে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রাণের প্রতি তাঁর অহেতুক কোনও মায়াও ছিল না— 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান', এ গান তিনি রচেছেন অল্প বয়সেই— তবু তিনি 'না-চাহিতে যারে দেওয়া যায়' ভাবখানা মুখে মেখে পিলপিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পর্যন্ত তিনি একখানা দিয়েছিলেন— অবশ্য সাহিত্যের জন্য নয়, চাকরির জন্য। আমি তাঁর 'কৃতী ছাত্র' এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বিচক্ষণ লোক; তিনি আমাকে চাকরি দেননি। অন্যত্র চেষ্টা করার জন্য সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না— কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্যামাপ্রসাদবাবু সার্টিফিকেটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠির মূল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এবং যাঁরা কিছুতেই সার্টিফিকেট দিতে রাজি হন না, তাঁদের দু একজনকে আমি চিনি। এবং একথাও বিলক্ষণ জানি, তাঁরা যেসব বইয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া দূরে থাক, গালিগালাজ পর্যন্ত করেছেন তারই অনেকগুলো বাজারে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। রাজশেখরবাবুর 'দুই সিংহ' গল্পে আছে কোনও লেখক তাঁর বই কিছুতেই বিক্রি হচ্ছে না দেখে কোনও এক বাঘা সাহিত্যিককে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নেয়, বইখানা অতিশয় অশ্লীল এবং কদর্য। ফলে নাকি সে বইয়ের প্রচুর কাটতি হয়েছিল।

কিন্তু এসব শোনা কথা, কিংবা কাল্পনিক। রবিবাবু টাকের ওষুধের প্রশংসা করাতে ওষুধের বিক্রি বেড়েছিল কি না তার সঠিক স্টাটিস্‌টিক্‌স্‌ এখনও দেখিনি। উল্টোটাও সঠিক জানবার উপায় নেই। এ যেন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। বেতারে আলিপুর বলল, 'সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে'। আপনি অবিশ্বাস করে ছাতা না নিয়ে বেরুলেন। ফিরলেন ভিজে ঢোল হয়ে। তবেই দেখুন, এমনি লক্ষ্মীছাড়া দফ্‌তর যে, অবিশ্বাস করেও নিষ্কৃতি নেই, বিশ্বাস তো করা যায়ই না।

* * *

কিন্তু একখানা বই পড়ে আমি এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হদিস পেয়েছি।

বইখানার নাম 'লিমিট অব্ আর্ট'। চল্লিশ টাকা দাম। ঢাউস মাল। কপিকল দিয়ে শেলফ্ থেকে ওঠাতে নাবাতে হয়।

কবিতার চয়নিকা। গ্রিক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে, ফরাসি-জর্মন-ইংরেজি-স্প্যানিশ রুশ তাবৎ ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা সঞ্চয় করে এ চয়নিকাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সবিনয় নিবেদন করেছেন, তিনি এ চয়নিকার মাধুকরী করার সময় নিজের ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভর করেননি। তবে কি তিনি বন্ধুবান্ধবদের রুচির ওপর নির্ভর করেছেন? তা-ও নয়। তিনি লিখেছেন বিখ্যাত প্রখ্যাত কবিরা যেসব অন্যান্য কবির কবিতার প্রশংসা করেছেন তাই দিয়ে তিনি এ 'সঞ্চয়িতা' নির্মাণ করেছেন। যেমন মনে করুন, বায়রন বলেছেন 'পেত্রার্কের এ ছত্র কটি কী চমৎকার, কী অনির্বচনীয়!' চয়নিকা-কার সেই কবিতাটি তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়রনের প্রশস্তিটিও তুলে দিয়েছেন। ঠিক এইভাবেই, শেকস্‌পিয়র আছেন গ্যোটের প্রশংসাসহ, কিটস্ আছেন শেলির তারিফযুক্ত, এবং আরও বিস্তর চেনা-অচেনা কবি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর চেয়ে আর উত্তম ব্যবস্থা কী হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এরকম রদ্দি, ওঁচা কবিতার সংকলন আমি জীবনে কোনও ভাষাতে কখনও দেখিনি।

এবং শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম বেশ কয়েকটি কবিতা তাতে বাদ পড়েছে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, একবার এই বঙ্গভূমিতেই এ ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা বাঙালি পাঠকের ভালো লাগে তারই ভোট নিয়ে একখানি 'চয়নিকা' রচিত হয়েছিল। তাতে এত বেশি ভালো কবিতা বাদ পড়েছিল, এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখা ঢুকে গিয়েছিল যে এরপর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে চয়ন করেন সেটিই 'সঞ্চয়িতা' এবং বাজারে সেইটেই চালু। এস্থলে পাঠক অবশ্য বলবেন, 'রাস্তার লোকের ভোট নিয়ে কি আর উত্তম কবিতা-সঞ্চয়ন হয়। ওদের কীই-বা বুদ্ধি, কীই-বা রুচি।' অতএব যে বিদেশি চয়নিকা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেইটেতেই ফিরে যাই।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ভালো ভালো কবি কর্তৃক নির্মিত সঞ্চয়নও উত্তম হল না কেন?

তার প্রধান কারণ, সাধারণ এবং সুরুচিসম্পন্ন পাঠক কবিতা পড়ে কিংবা গান শুনে যদি আনন্দ পায় তবেই সে বলে, কবিতা কিংবা গানটি ভালো। অর্থাৎ তার কাছে যেকোনো বস্তু রসোত্তীর্ণ হলেই হল। কিন্তু কবি যখন অন্য কবির কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর নজর যায় কবিতার গঠন, ভাষা, ছন্দ, মিল— এক কথায় আঙ্গিকের দিকে। কবিতাটি রচনা করতে গিয়ে কবিতাকার কী কী মালমশলা নিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাঁকে কোন কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি না পাঠক-কবির দৃষ্টি থাকে প্রধানত সেইদিকে। কিংবা মনে করুন, আপনি-আমি যখন গান শুনি তখন গানটি মিষ্টি এবং মর্মস্পর্শী হলেই হল। পক্ষান্তরে আকছারই দেখবেন, বদখদ গলা নিয়ে, বিদকুটে মান্ধাতার আমলের একটা সম্পূর্ণ অজানা রাগ ধরল এক হাড়-চিমসে গাওয়াইয়া। তবলচিও বাজাতে লাগল এমন এক তাল যে তার কোথায় সম, কোথায় ফাঁক কিছুই মালুম হচ্ছে না। আপনি বিরক্তিতে উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময় দেখেন হঠাৎ মহ্‌ফিলের অন্য গাওয়াইয়া শ্রোতারা 'আহা, আহা, ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ' বলে অচৈতন্যি প্রায়। কী হল? ব্যাপারটা কী? না, এই ওস্তাদস্য ওস্তাদ এক অ্যাসন অতি-অতি কোমল এমন এক কঠিনস্য কঠিন জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে অ্যাসা এক পানিপথ নাকি জয় করেছেন যা পূর্বে কেউ কখনও করতে পারেনি— না, তানসেন নাকি মাত্র দু বার পেরেছিলেন, ওস্তাদ আব্দুল করীম কুল্লে একবার! ব্যস, হয়ে গেল।

অবশ্য সব পাঠক-কবি কিংবা শ্রোতা-গাওয়াইয়াই যে শুদ্ধমাত্র আঙ্গিক এবং টেক্‌নিকল স্কিলের দিকে এক-চোখা দৈত্যের মতো তাকিয়ে থাকেন সেকথা বলছি না— তবে ওই হল গিয়ে নিয়ম, এবং পূর্বোল্লিখিত 'লিমিট্ অব্ আর্ট' ওই পর্যায়ের বই।

সমসাময়িক লেখক যখন অন্য লেখকের লেখা পড়েন তখন আরেক মুশকিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা করি।

এই মনে করুন, গৌরকিশোর ঘোষ রম্য-রচনা লিখে দেশে নাম করে ফেলেছেন। আমারও বাসনা গেল, ওই লাইনে যখন খ্যাতি আছে, পয়সাও থাকতে পারে, তখন আমিও-বা বাদ যাই কেন? গৌরকিশোরের লেখার অনুকরণে আমিও কয়েকটি রম্য-রচনা লিখে নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর এক নবীন শাকরেদ্ জুটল, তাঁর অনুকরণ এবার একটা 'স্কুল' 'ঘরানা' গড়ে উঠতে চলল। আমার রচনা যে আদপেই 'রম্য' হয়নি, এমনকি এরে 'রচনা'ও কওয়া যায় না সেদিকে তাঁর নজরই গেল না। তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, 'তোফা লেখা, খাসা লেখা, বেড়ে লেখা!' আমিও খুশি। অবশ্য এ সার্টিফিকেট আমি এখনও কাজে লাগাইনি। সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট হাল-পাঠকের পানি পাবে কি না সে বাবদে আমার মনে এখনও ধোঁকা রয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে ফরাসি কবি-সম্রাট মলিয়েরের নাকি তাঁর তাবৎ কৌতুকনাট্য পড়ে শোনাতেন তাঁর নিরক্ষরা বাড়িউলিকে। বাড়িউলি যেসব রসিকতা শুনে হাসত, তিনি সেসব রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন; যেগুলো শুনে গম্ভীর মূর্তি ধারণ করত সেগুলো তিনি নির্মমভাবে কেটে দিতেন। অথচ আজ তো গুণীমূর্খ সবাই তাঁর নাট্য দেখে আনন্দ লাভ করে। এই কয়েকদিন মাত্র হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত তাঁর বাঙলা অনুবাদ কলকাতার রসিক সমাজকে যা হাসাল তা দেখে স্বয়ং মলিয়েরেরই অবাক হতেন।

www.pathagar.com

তবে কি ওই বাড়িউলি অতিশয় সুরসিকা ছিলেন? এ পর্যন্ত কেউ তো তা বলেনি। তবে কি ওঁকে না শুনিয়ে সে যুগের নামকরা সমঝদারকে শোনালে মলিয়েরের কাব্য আরও রসোত্তীর্ণ হত? বলা অসম্ভব।

*　　*　　*

যে নল চালিয়েছিলুম, সে তবে এখন এসে খাড়া হল কোথায়, পাকড়ালো কাকে? অর্থাৎ হরে-দরে দাঁড়াল কী?

আমার বিশ্বাস এ নল কোথাও দাঁড়াবে না। এ আলোচনায় কস্মিন-কালেও কোনও হদিস পাওয়া যাবে না।

তবে যদি শোধান, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কী, তবে আমি নবীন লেখককে অকুণ্ঠ ভাষায় বলব, সার্টিফিকেট কুড়োতে যেও না। ওতে কানাকড়ির লাভ নেই। ওই যে পাঠক-সম্প্রদায় নামক কিম্ ভূত কিম্ আকার জীব আছে সে যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দয়, কখন কাকে আশা-গাছের শাখায় চড়ায়, আর কখন কাকে নির্মমভাবে জিল্‌ট্ করে তার হদিস কেউ কখনও পায়নি।

অবশ্য আপনি যদি ভবিষ্যৎ যুগের পাঠকের জন্য লেখেন তবে আপনার কোনও ভাবনা নেই। তবে সেকথাটা পুস্তকের অবতরণিকায় বলে দিলেই সাধু আচরণ হয়। এ বছরের তাজা মাছকে আসছে বছরের শুঁটকি বলে চালানোটা জোচ্চুরির শামিল। পঞ্চাশ বছর পরে যে র-মাল মেচ্যোর লিক্যোর হবে সেটা আজ বাজারে ছাড়া ধাপ্পা। তার জন্য আজ যে লোক সার্টিফিকেট দেয় সে-ও ধাপ্পাবাজ।

*　　*　　*

হালে আকাশে এক নয়া চিড়িয়া উদয় হয়েছে।

নিজের সার্টিফিকেট নিজে লিখে, কিংবা/ এবং চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে নিজের লেখার গুণকীর্তন করতে গিয়ে পয়েন্ট বাতলে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নিয়ে কিংবা/ এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্যান্য লেখাতে সে লেখা সম্বন্ধে দারুণ-দারুণ রেফরেন্‌স্ ঝেড়ে সবকিছু প্রকাশককে দিয়ে বিজ্ঞাপনরূপে ছাপিয়ে দেওয়া।

এ সিস্টেমের সঙ্গে 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'র বেশ মিল আছে। বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে পড়তে গিয়ে মালুম হল যে কিছুই মালুম হচ্ছে না— এ ভাষায় শব্দরূপ, ধাতুরূপ কৃৎ তদ্ধিত আপনি কিছুই জানেন না। অর্থাৎ বন্ধু বাঙলা ভাষার মুখোশ পরে অজানাজন এসে মেরেছে চাক্কু।

প্রকাশকের মুখোশ পরে এখানে আসে লেখক— হাতে চাক্কু! পাঠক সাবধান!!

রবীন্দ্রনাথ কী যেন গেয়েছেন, দুখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে ডরাব না? এ তার উল্টো পিঠ ; মিত্রের বেশে এসেছ বলে তোমাকেই যত ভয়।

এ সিস্‌টেম পাঠক-ব্যাঙ্কারের চালানো জুয়ো-ভূমি মন্টে কার্লোর ব্যাংক ভাঙতে পারবে কি না, সেই খবরের প্রত্যাশায় আছি। এযাবৎ তো কোনও সিস্টেম পারেনি।

আর যা করুন, করুন, কিন্তু পাঠকসাধারণকে আহাম্মুখ ঠাউরে আপন আহাম্মুখির পচা ডিম হাটের মধ্যিখানে ফাটাবেন না!!

www.pathagar.com

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

গত ৩ সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এঁর, কাল ওঁর কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসাব রাখতে যাবে কে?

যার যেরকম খুশি, এর বেশি কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনও নতুন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম মৃত্যুদিনও আমার ও আমার মতো বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরিতে যেরকম নতুন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্ল্যাসিক্‌স্ পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দীপ্রয়াণও স্মরণ করে না; তারা স্মরণ করে র‍্যাঁবো কবে হেঁচেছিলেন, ভেরেন কবে কেশেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন র‍্যাঁবোর কাছে রবিঠাকুর শিশু, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাষ্ঠরস) এবং সম্পাদকমণ্ডলীও সেগুলো পরম শ্রদ্ধাভরে ছাপাচ্ছেন তখন এঁরা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে তো জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনার কাছে আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লন্ডনে রঙিন হওয়ার মতো রীতিমতো সঙ্কট-সঙ্কুল— রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে খতরনাক্— স্কন্ধোপরি যুগ্ম-শিরের প্রয়োজন!

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা-রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শিদ হয়ে আছেন রবিঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এঁদের অস্বীকার করতে পারব না— র‍্যাঁবো-এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে তুর্গেনেফ-প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। 'বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ে'র মতো 'বরজলালে'র হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুরুব্বি আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ভালো লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলাগারদে সুস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেক যেখানে রব ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনতাই শ্রেয়— 'ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে।'

তুর্গেনেফের মন্দভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে— জার্মানি এবং ফ্রান্সে— এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কীভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্‌তেফ্‌স্কি তলস্তয় এমনকি কবি নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। 'বিরাগভাজন' বললে বোধ করি কমই বলা হয়। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমতো এঁদের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বিদ্বেষ আসে হিংসা থেকে। এঁদের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এঁরা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূর-দেশবাসী প্রবাসী নিরীহ ('নিরীহ' কেন সেকথা পরে হবে) তুর্গেনেফ তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন?

এ তত্ত্বটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসেবে তুর্গেনেফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য কোনখানে?

দস্‌তেফস্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের আপন মাহাত্ম্য কোনখানে। দস্‌তেফ্‌স্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীরতম অন্তস্তলে পৌঁছে গিয়ে তার সুখদুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজপ্রবাহের খরস্রোতের বিরুদ্ধে তার উজান চলার আপ্রাণপ্রয়াস, কিংবা সে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত— এ সবকিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন, ভাস্করের মতো দৃঢ়পেশি সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজাপতি। চোখে এক্‌স্‌রে, বুকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলার এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আসুক না কেন, জানি, ভালো করেই জানি, সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দস্‌তেফ্‌স্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যা পড়বে তার আর উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেরও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে বা বুঝে থাকতে পারে! কিংবা বলব, কুমির যেরকম ছাগলের বাচ্চার ঠ্যাং কামড়ে ধরে ডুব দেয় নদীতে, দস্‌তেফ্‌স্কি সেরকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানবচরিত্রের অতল সায়রে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মণি-মুক্তার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্লেদ-পঙ্ক দেখি তার প্রতিও তো ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরলা কুমারী রাস্তার বেশ্যা হয়ে বাপকে মাতলামোর পয়সা যোগাচ্ছে— কই, লোকটাকে তো খুন করতে ইচ্ছে করে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোধাতে ইচ্ছে করে, 'একে বিবেকহীন পাষণ্ডরূপে জন্ম দিলে না কেন? এরও তা হলে কোনও দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরুণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ তো সবকিছু জানে। তবে এই ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজাপতির মতো সৃষ্টি করলে কেন?' কিংবা হয়তো অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহ্যমান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে— সমস্ত জীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট। তার পাত্রপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু চেহারা ভুলিনে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে যার আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী বানিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে— কখনও-বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী এক অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে— আর সবকটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও-কোণে যে-কটি ছন্নছাড়া আপনমনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এরকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাইনে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কীই-বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

www.pathagar.com

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর ভানুমতী দণ্ড দিয়ে তিনি যেরকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু— যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে— তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অথচ মনে হয়, 'কী আশ্চর্য, একে এতদিন ধরে লক্ষ করিনি কেন?' এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্তেফ্‌স্কির চাষা কভাস ভদ্‌কা না খেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথর, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট *স্টোভের* পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড়বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বারবার ভুলে যাই সে বাঙালি চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজ্‌নি নভ্‌গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই *ওয়ার অ্যান্ড পিস্!*

তুর্গেনেফ দস্তেফ্‌স্কির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধহয় তুর্গেনেফ নখ্ শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনও ভদ্রলোক পরিচিত-অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না— হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়— সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়ক-নায়িকার দিকে তাকান শিশুর মতো সরল চোখে; তারা কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সে-ই যথেষ্ট। শার্লক হোমসের মতো আতশি কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়োরোর মতো তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্!'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোনও জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রই শিশু। তার চোখে ছানি পড়েনি। প্রতি মুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীনরূপে।

রুশদেশে পুশ্‌কিনের পর যদি কোনও কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তারূপে আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এ সব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব-অবাস্তব দুই-ই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুই-ই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। কিংবা বলব শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্যফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ-ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তার পাশের নয়ানজুলি— সবাই যেন সূক্ষ্ম মসলিনের অঙ্গাভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রের কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিংসা করতেন দস্‌তেফ্‌স্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ স্বয়ং কবি কিন্তু তিনি জানতেন যে জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গদ্য গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আঙ্গিকের ওপর এ রকম অখণ্ড অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোনও বিশেষ রচনা হয়তো তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রচনাকে তাঁর আঙ্গিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্‌তেফ্‌স্কি-তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যেকোনো মুহূর্তে তার যেকোনো একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই— তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হোক আর বেশিই হোক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজা ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লবের। তাঁর শিষ্য এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুর মজলিসে আতরদান, গোলাপপাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লবেরের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন 'গুরুদেব', তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন 'গুরু এবং সখা'। ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মতো এদিক-ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মতো দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে। মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজেছেন সান্ত্বনা। লিখেছেন, 'জীবনের সবকটি আনন্দের দিনও তো আমার এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।'

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

এবারেও হয়তো তিনি কোনও সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লবের, মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্তর হু(য়ু)গো, এদমোঁ দ গঁকুর, এমিল জোলা, আলফঁস দদে এঁদের কাউকে হয়তো তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ফ্লবের গত হলে শোক নিবেদন করা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? বঙ্কিমের মৃত্যুসংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে হয়তো সান্ত্বনার বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গত হলে বাঙালি জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশস্তি লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই করুণ। মপাসাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলিতে এ-দুটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না— যদি-বা করে তা-ও তাঁর তথাকথিত অশ্লীল গল্পের জন্য— তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রাঁসের রম্যরচনাকে যদি সত্য ও সুন্দরের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধরা হয়, তবে সে-দুটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র পরিচিত শৈলীতেই সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্দাম উত্তাল শৈলধারার মতো দ্রুতগামী বাক্যবিন্যাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হ্রস্বের পর দুটো দীর্ঘ এলে যে রসের সৃষ্টি হয়।

এর অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

www.pathagar.com

'রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশ-রূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।

'এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সৎ, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এরকম লোকের দেখা মেলে না।

'তাঁর বিনয় ছিল আত্মাবমাননার কাছাকাছি; কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিকবার তাঁর সম্বন্ধে উচ্চপ্রশস্তি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মাহত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজি হতেন না যে, শুদ্ধ সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনও বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হোক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্‌ভ বাক্যবিন্যাস বলে মনে করতেন। একবার কোনও এক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাতে তিনি রীতিমতো আহত হয়েছিলেন। তাঁর সে বেদনা-বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া— শুদ্ধ বিনয় তার কাছে নতমস্তক হয়।

'আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ; তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

'প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ফ্লবেরের পার্টিতে।

'দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রুপালি মাথা— রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রুপালি চোখের পলক আর বিরাট সাদা দাড়ি— সত্যই যেন খাঁটি রুপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরি। ঝকঝক চকচক করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। নাক-চোখ যেন একটু বড্ড বেশি ধারালো। সত্যই যেন বরুণদেবের শির— চতুর্দিকে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন— কিংবা আরও ভালো হয় যদি বলি, অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

'অতি দীর্ঘ দেহ— বিরাট, কিন্তু দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু, অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা নড়াচড়া একেবারে শিশুটির মতো— বড় ভীরু-ভীরু ভাব। অতি মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে হয়, পুরু জিভ শব্দের ভার যেন সইতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে, একটু আটকে যান, যেন ঠিক মনের মতো কথাটি ফরাসিতে কী হবে সেটা খোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তাঁর বাচনভঙ্গিতে লাবণ্য এনে দিত।

'গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গিতে। সামান্যতম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গির পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মূল্য আমরা ভালো করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অন্য কারণে। তাঁর চরিত্রে শিশুর মতো সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; একদিক দিয়ে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সবকিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন অথচ অন্যদিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যা-কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক মানতেন, ভাবতেন এটা হল কী করে?

'সাহিত্য বিচারের সময় তিনি আমাদের পাঁচজনের মতো সবকিছু বিশেষ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য তাঁর খুব

www.pathagar.com

ভালো করে পড়া ছিল বলে সর্বসাহিত্যের সমন্বয় করে তারই বিরাট পটভূমিতে তিনি পৃথিবীর একপ্রান্তে প্রকাশিত একখানা বই তুলনা করতেন অন্যপ্রান্তে প্রকাশিত অন্য ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের সঙ্গে। তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের কাছে তার বিশেষ মূল্য পেত।

'তাঁর বয়েস হয়েছিল, তাঁর সাহিত্যজীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধুনিকতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্লটের প্যাঁচ আর থিয়েটারি কৌশলে ভর্তি উপন্যাস তিনি দু চোখে দেখতে পারতেন না, তিনি বলতেন, কিছু নয়, সুদ্ধমাত্র জীবন হবে উপন্যাসের উপাদান— তাতে প্লটের কলাকৌশল থাকবে না, থাকবে না অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

'তাঁর মতে উপন্যাস আর্টের সর্বাধুনিক রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছলাকলা তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপন্যাস এখনও তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায়নি। নানারকম রোমান্টিক আর আকাশ-কুসুম কল্পনা উপন্যাসকে এতদিন ধর্মভ্রষ্ট করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের রসবোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন ওসব সস্তা ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে করতে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে তুলে ধরতে হবে, যাতে করে একদিন সে জীবনের ইতিহাসরূপে গণ্য হতে পারে।

'আজ তাঁর প্রতিভাপ্রসূত কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা যাবে না— যদিও জানি তাঁর সৃষ্টি রুশ-সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহাকবি পুশ্‌কিন্, লেরমন্তফ এবং ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপাশিই তাঁর রচনার স্থান। রুশদেশ যাঁদের সৃষ্টি চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে ইনি তাঁদেরই একজন। ইনি রুশকে দিয়েছেন চিরঞ্জীব সম্পদ, অমূল্য নিধি। ইনি দিয়েছেন এমনই সম্পূর্ণ আর্ট, এমন সব সৃষ্টি যার বিস্মরণ অসম্ভব; তিনি দিয়েছেন এমন এক গৌরব যে গৌরবের মূল্যবিচার অসম্ভব, যার আয়ু অন্তহীন এবং রুশদেশের অন্য সর্বগৌরব সে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। এঁর মতো লোকই দেশের জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রিন্স্ বিসমার্ক তুচ্ছ; পৃথিবীর সর্বভূমির সর্বমহাজনের কাছে এঁরা নমস্য হন।'

গাঁজা

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মবিভূষণ' জাতীয় কোনও উপাধিই দিলেন না, এবং শেষপর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্‌ফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রক্‌ফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গির' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত,

www.pathagar.com

এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তার পর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়! বাড়ি থেকে বেরুনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কী করি বলুন তো?'

মশাদা'র এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনও দেখিনি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেদিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ দু-চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয়নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদা'র প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারল ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বলল, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁছেছি কি না!'

অজনদা আরও তৈরি মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কী একটা শুনে আঁতকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয়নি? বলেন কী মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদা'র নিজের কোনও ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্ত মনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্যকর্মে মন দিলাম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ওই আলমগির নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গির।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি! এ আর নতুন কী শোনালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই-বকাওলি, তার পর লন্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তার পর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তার পর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো, ভালো। গুলম্‌গির! বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন কৃচিৎ-কশ্মিন। বললেন, 'ল্যাটে— ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান একফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে স্বর্গের দিকে ঠোঁটদুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড', করে কথা বলেন— অল্পই।

তার এসব কল-কায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বলল, এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বলল, 'কিংবা, গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

www.pathagar.com

ঘেণ্টু বলল, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবিনে রে, ছেড়ে দে।' ঘেণ্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেণ্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেণ্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন্। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনও সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক-স্টাটিসটিকস সঞ্চয় না করে। সে আজকাল ওই নিয়ে মেতেছে।'

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বলল, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন্', নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।

'পার্টিশেনের বছরখানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওপার বাংলার কোথায় যেন কী একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনও ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজি আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্কেয়ার করেছেন। তা সে যাক গে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধাল, 'তোদের দেশে গাঁজার কী পরিস্থিতি?'

আমি একগাল হেসে বললুম, 'স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।'

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধাল, 'সে কী রে! কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছিনে!'

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল, দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কী করে জানব? আমি পাষণ্ড বটি, — দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

দাদা বলল, 'শোন্।'

পার্টিশেনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথাচাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়াল গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌ক-ই-জাহাঙ্গিরিতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি সস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না— সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি; এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিল, সে বছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইন্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই— অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।'

www.pathagar.com

আমি শুধলুম, 'কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম।'

দাদা বলল, 'কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করিনে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্ড্ প্রডিজি— ওয়াডার চাইল্ড্— চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'আর তুমি বিয়াল্লিশে।' দাদা আমার চেয়ে দু বছরের বড়।

দাদা বলল, 'তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।'

রক্‌ফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইনসিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় 'আকাশ-বাণী', 'ঢক্কা-ডিংডমে' পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোল, 'ঢক্কা-ডিংডমটা কী চাচা?'

'ডিংডম্ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরেজি 'টম্‌টম্' 'টমটমিং' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তার পর শোনো :

দাদা বলল, 'ভয়ংকর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে।—'

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, 'দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মশকরা করো—'

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বলল, 'দেখ ভাই, তুই কখনও দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—'

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক্ থাক্। তুমি বলো।' দাদার ওই গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরি। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বলল, 'পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল— এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, বাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল এক দুশমন। জিনিভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে— কল্যাণ না কচু— তার সারমর্ম এই : আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশি করতে পার, যত খুশি তত আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পার, গাঁজা চালাতে পার— কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দির ভিতর। এক্‌স্‌পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনিভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যান্ড জিনিভার মারফতে তোদের কাছে চাইল দু মণ আফিঙ— ওষুধ বানাবার জন্য। জিনিভা সন্দেহে গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যান্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরই খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু পয়সা কামিয়ে নিতে চায় কি না। কারণ কোনও কোনও দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওয়ালাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশি বেশি হশিশ, ককেইন রপ্তানি করে সেসব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখিনি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারব না—

www.pathagar.com

নির্যাসটি জানিয়েছিল গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনিভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতোমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরি। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নতুন গুদোম এক ঝটকায় তৈরি করা যায় না— শেষটায় হয়তো জিনিভা কোনও পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, 'গেল বছরের গাঁজা পোড়াও— '

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই— টেটেন ছাড়া— এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠল। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়! রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স্ পাদ্রিকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্টিশিয়ান টেটেন বলল, 'আপনারা এতে এমন কী নতুন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দু দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যান্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরেজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, 'তার পর?' দাদা বলল, 'গুদোমেতে নতুন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাব, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে— তুই জানিস নাকি? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানি বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল জাপানি বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ করেনসি নোট পুড়িয়ে ফেলবে। ভাইজাগা না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটিমাত্র বোমা পড়ামাত্রই সরকারকে খবর দিল সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তার পর দু বছর বাদে তাজ্জবকি বাত্, বাজারে সেসব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায়নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ওই যদি হয়।

আগেভাগে দিনক্ষণ দেখে অর্থাৎ ট্যুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরোলুম গাঁজা পোড়াতে।'

আমি আঁতকে উঠে বললুম, 'কী বললে?'

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ তা তো বটেই । "গাঁজা পোড়ানো" কথাটার অর্থ "গাঁজা খাওয়া"ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগারেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীরকণ্ঠে তাকে বলল, 'জানিস, সিগারেট মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু'— সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কী তফাত যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাক গে।

www.pathagar.com

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসাব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তার পর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করল। সে-ই তার জনক— একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড ! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সেদিক হতে সরে যায়। আজ দেখি উল্টী বাত। জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমদ্দে— হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল— ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই— অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস— 'আহ্, আহ্!' কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু হাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক-একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আহ্—!' শব্দ। কেউ-বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম্র গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটাল। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটল সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু একটি চাপরাসি দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিইনে।

ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরিব-দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ-বাতাস টইটম্বুর করে। হয়তো ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনও এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে। আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে— ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি "জাগ্রত ভগবানকে" ডেকেছিলেন তাঁকে "জনসমাজ-মাঝে" ডেকে নেবার জন্যে! আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে— আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই "জনসমাজ" থেকে আমাকে তফাত রাখেন।'

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারি প্রকৃতির লোক, চোখে-মুখে কোনওরকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদি লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্য দেখা যায়— যা-ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কি টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতন্যের মতো খাড়া হয়ে এদিক-ওদিক কম্প্রমান— এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

www.pathagar.com

দাদা বলল, 'তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ তাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তার পর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কীরকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তার পর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কীরকম বেয়াদবের মতো ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এস্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জিপে উঠলুম। সে-ও এক বিপদ। দেখি দু খানা জিপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একইরকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মতো, আর টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দু জনাতে দুই জিপে উঠলুম।'

আমি বললুম, 'দুটো জিপ না কচু!'

দাদা বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন্। তার পর গাড়ি যায় কখনও ডাইনে ঢাকা, আর কখনও বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তার পর দেখি সেই অন্য জিপটাও ঢাকা-মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তার পর দেখি চারটে জিপ। সে-ও না-হয় বুঝলুম। কিন্তু তার পর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।'

আমি শুধালুম, 'উড়তে!'

'হ্যাঁ, উড়তে। জিপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশি।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষপর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশি ধুঁয়ো মগজে যায়নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্স্! তার পর অতি শান্ত কণ্ঠে— কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে— শুধালেন, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

আমি কিছু বলিনি।' দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবি টপকান। শমসুল্-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধাল, 'ওটার মানে কী চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট নাম্বার।'

রক শুধাল, 'তার পর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কী হল জানিনে। বউদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তা-ও বলতে পারিনে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শব্‌ডেগ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।'

মশাদা বলল, 'বিলকুল্ গুল।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল। অর্থাৎ গুলের রাজা গুলম্‌গির। তোরা আমাকে আজ ওই টাইটেলটি দিলি না?'

www.pathagar.com

হরিনাথ দে'র স্মরণে

বহু ভাষা শিখতে পারলে বহু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার মারফতে অনেক সভ্যতা, বিস্তর সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়— এসব কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, বাঙালি ছেলেকে বাধ্য হয়ে অন্তত তিনটে ভাষা শিখতে হয়— বাঙলা, ইংরেজি এবং সংস্কৃত (কিংবা আরবি অথবা ফারসি)। হয়তো তাকে হিন্দিও শিখতে হচ্ছে, কিংবা অদূরভবিষ্যতে শিখতে হবে। এ অবস্থায় আমি যদি প্রস্তাব করি, আরও গুটি দুই শিখলে হয় না? তা হলে ছেলেদের হাতে আমার প্রাণ বিপন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা— বাঙলা দেশে না থাকলেও এ খবরটি আমি বিলক্ষণ রাখি। বিশেষত এই পুজোর বাজারে— মানুষ যখন বলির পাঁঠার সন্ধানে থাকে।

তাই হট্টগোল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আমি নিবেদন করছি, এ প্রস্তাবটি শুধু তাদেরই জন্য, যারা বুঝে গিয়েছে যে সংস্কৃতে তারা বিদ্যাসাগর হতে পারবে না, ওটাকে নিতান্ত পরীক্ষা পাসের জন্য যেটুকু সম্মান দিতে হয় তাই দেবে, বাঙলা মাতৃভাষা, এবং ইংরেজির চর্চা ততটুকুই করবে যতটুকু পাসের পর চাকরির জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। এই সংজ্ঞা থেকেই সুচতুর পাঠক বুঝে যাবেন যে, আমি মোটামুটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ছেলেদের কথাই ভাবছি। অর্থাৎ এরা ক্লাসে (সেভেন-এটে) যেরকম পড়ি-মরি হয়ে তিনটে ভাষার পিছনে ছুটত এখন আর তা করে না। বিশেষত গোটা পাঁচেক ইয়ার্লি আর খান-দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে এরা ভাষা না শিখে কী করে তার পরীক্ষা পাস করতে হয় সে 'বিদ্যায়' বিলক্ষণ রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এতখানি বলার পরও যদি কেউ লেমনেডের বোতল খোঁজে তবে আমার দ্বিতীয় নিবেদন, গোটা দুই ভাষা শিখলে চাকরি জোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। হল? এখন তবে আশা করতে পারি, পাঠক বোতলটি আমার মাথায় ফাটিয়ে সেটার ভিতরকার জিনিস বরফের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।

দয়া করে সেটিও করবেন না; কারণ আমি যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি সেটা লটারির টিকিট কাটার চেয়ে মাত্র এক চুল ভালো— এই যা। ইংরেজিতে একেই বলে 'চেজিং দি ওয়াইল্ড গিজ'— কিন্তু চাকরির বাজারে বাঙালির ছেলের সামনে যখন কোনও 'গুজ'ই নেই তখন আশা করিতে পারি সে ঘরের না খেয়ে বনের হাঁস তাড়া করতে আপত্তি করবে না। বুঝিয়ে বলি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভাষা শেখার কোনও অর্থকরী মূল্য এদেশের ছিল না। স্বরাজ লাভের পর অবস্থাটা বদলেছে। আমরা নানা দেশে আমাদের রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, হাইকমিশনার, কন্সাল-জেনারেল, কন্সাল, ট্রেড-কমিশনার এবং তাঁদের দফ্‌তরের জন্য কাউনসেলর, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সেক্রেটারি, মিলিটারি আতাশে, ট্রেড আতাশে, প্রেস আতাশে, কেরানি, দোভাষী ইত্যাদি পাঠাচ্ছি এবং দিল্লির পরদেশি দফ্‌তর বা ফরেন অফিসেও ভাষা জাননে-ওলা লোকের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বেতার-কেন্দ্র ফরাসি, ইরানি, ফারসি, কাবুল-ফারসি, আরবি, পশতু, সুহেলি, গুর্খালি, বর্মি, ইন্দোনেশি ও চীনা ভাষায়-ও প্রোগ্রাম দেন। আমাদের ফৌজি স্কুলেও অনেক ভাষা শেখানো হয়।

www.pathagar.com

এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে যে গণ্ডায় গণ্ডায় চাকরি খালি পড়েছে তা নয়, তবু আমার ব্যক্তিগত ধারণা উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকলে যোগ্য লোককে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান খাতির করবে। আর পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমার এ প্রস্তাব তাদেরই জন্য, যারা চাকরির বাজারে একটুখানি রিস্‌ক, রতিভর ঝুঁকি নিতে রাজি আছে।

আমি যে খবরটি দিলুম সেটি কিছুমাত্র নতুন নয়। কারণ প্রায়ই বেকার ছেলেরা এসে আমাকে অনুরোধ জানায় তাদের ফ্রেঞ্চ-জর্মন শিখিয়ে দিতে। (এখানেই লক্ষ করে রাখুন 'ফ্রেজ-জর্মনই' বলে, অন্য কোনও ভাষার নাম তোলে না) আমার সময়ের অভাব, দ্বিতীয়ত আমি বাঙালিটাই ভালো করে জানিনে— কাজেই ফরাসি-জর্মনের কথাই ওঠে না, তাই তাদের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়ে বিদেয় দিই।

এদের প্রশ্ন করে দেখলুম, এরা জানে না (ক) কোন ভাষার চাহিদা বাজারে কতখানি, (খ) কোন ভাষা শক্ত আর কোনটা নরম, (গ) ভাষা শিখতে হয় কী করে এবং আরও অনেক কিছুই জানে না।

আমি দোষ দিচ্ছিনে। জানবার সুযোগ দিলে তো তারা জানবে। আর যদি জানতই তবে আজ আমি এ বিষয়ে লিখতে যাব কেন?

আমাকে এক উত্তম ব্যবসায়ী বলেছিল, 'জিনিস বেচা সোজা, কেনা শক্ত।' আমি তো তাজ্জব। বলে কী? তখন বুঝিয়ে বলল, 'বাজারে ঠিক যে জিনিসের চাহিদা তাই দিয়ে যদি আমি আমার দোকান সাজিয়ে রাখি তবে সন্ধে হতে না-হতেই দোকান সাফ হয়ে যাবে। তাই বললুম, বেচা সহজ। কিন্তু আড়তদারদের কাছ থেকে যদি বে-আক্কেলের মতো বে-চাহিদার মাল কিনি তবে সেগুলো দোকানে পচবে, দোকান উঠে যাওয়ার পরও। তাই বললুম, "কেনা শক্ত"।'

এস্থলেও সেই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রথম দেখতে হবে, আপনি কী মাল কিনবেন, অর্থাৎ কোন ভাষা শিখবেন।

সবাই বলে 'ফেঞ্চ-জর্মন'। এ যেন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভুবনবিখ্যাত ভাষা। এককালে ফ্রেঞ্চ না জেনে কূটনীতি মহলে যাওয়া বিনা পৈতেয় ব্রাহ্মণভোজে যাওয়ার মতো ছিল। এখনও পৃথিবীর যেকোনো দেশের পাসপোর্টে দেখতে পাবেন দুটি ভাষাতে সবকিছু ছাপা, প্রথমটি তার আপন ভাষা এবং দ্বিতীয়টি ফরাসি। কিন্তু এসব হচ্ছে ঊনবিংশ শতকের কথা। আপনি যদি সেই শতকের চাহিদা মেটাতে চান, তবে মেটান। আপনি যদি এক শ বছরের পুরনো বিজ্ঞাপন মাফিক চাকরির জন্য দরখাস্ত চান তো করুন।

তাই প্রথম দেখতে হবে : এখন, এই মুহূর্তে চাহিদা কী এবং চাহিদার গতিটি কোন দিকে, অর্থাৎ আপনি ভাষাটাসা শিখে দু তিন বছরে যখন বাজারে নামবেন তখন চাহিদাটা কী হবে?

ভাষার প্রাধান্য তার লোকসংখ্যা থেকে বিচার করা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনা ভাষা নিন। ইংরেজি, রাশান, চীনা এ তিন ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক একথা সত্য, কিন্তু চীনা ভাষায় লোক-সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, তারা সবাই মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী! কাজেই ওই রাষ্ট্রে আমাদের থাকবে মাত্র একটি এম্বেসি। পক্ষান্তরে জর্মন ভাষার অবস্থা বিবেচনা করুন। জর্মন বলা হয় জর্মন রাষ্ট্রে (উপস্থিত সেটিও আবার দুই রাষ্ট্রে

www.pathagar.com

বিভক্ত), অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রে এবং সুইজারল্যান্ডে। এই তিন দেশে আমাদের তিনটি রাজদূতাবাস আছে। তাছাড়া জর্মন বলা হয়, উত্তর ইটালির টিরোল, ফ্রান্সের আলসেস— লরেন ও বেলজিয়ামের অয়পেন অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে যদি কখনও রাজনৈতিক গোলমাল আরম্ভ হয় এবং আপনাকে তার রিপোর্ট লিখতে সেখানে যেতে হয় তবে জর্মন ছাড়া এক পা-ও এগুতে পারবেন না। এবং সর্বশেষ কথা : জর্মনি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড বেচে তৈরি মাল, ভারত বিক্রি করে কাঁচা মাল। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়তেই থাকবে; বিস্তর কনসুলেট ও ট্রেড-কমিশন ক্রমে ক্রমে ওসব জায়গায় আমাদের খুলতে হবে।[১] কিন্তু চীন ও ভারত সমগোত্রীয়, দু জনেই বেচে কাঁচামাল, অতএব 'বৈবাহিক' বৈষয়িক কাজ আমাদের চলে না।

আমরা যে স্বার্থ নিয়ে এ আলোচনা করছি তার দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ভাষার গুরুত্ব বিচার অবান্তর। সোভিয়েট রাশা বিরাট রাষ্ট্র কিন্তু ওই দেশে আছে এবং বহুকাল ধরে থাকবে আমাদের একটি মাত্র রাজদূতাবাস। রাশা আবার মারাত্মক রকমের কেন্দ্রপ্রাণ রাষ্ট্র— মস্কোর নাম বদলে তাকে 'সেন্টার' নাম দেবার প্রস্তাব ওই কারণেই একবার হয়েছিল— তাই তার উপরাষ্ট্র যথা, তুর্কোমানিস্তান উজবেকিস্তানে যে আমাদের রাজদূত আস্তানা গাড়বেন তার আশু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিনে। অবশ্যই উত্তম সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য রাশানের মতো ভাষা পৃথিবীতে বিরল।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আরবরা আজ পৃথিবীতে উঁচু আসনে বসে না। তার প্রধান কারণ, তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক ওই কারণেই আমাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। উপস্থিত আরব জাতি এই কটি রাষ্ট্রে বিভক্ত :— ইরাক, সিরিয়া (শ্যাম), লেবানন, হাদ্রামুৎ, ট্রানস্‌জর্ডন, সউদি আরব, ইয়েমেন, মিশর, সুদান, টুনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া। তাছাড়া কুয়েত, বাহ্‌রেইন, ওমান ইত্যাদি। এদের সবকটি স্বাধীন নয়, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমরা যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকান আড়কাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আড়তদারের কাছ থেকে সোজা পেট্রল কেনবার দুই নম্বরের 'স্বরাজ' পাব সেদিন আরবের আনাচে-কানাচেও আমাদের কনসুলেট বসাতে হবে। উপস্থিত, আমার যতদূর জানা, মিশর, সউদি আরব, ইরাকে আমাদের রাজদূতাবাস আছে। এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

১. এখানে এম্বেসি, হাই-কমিশন, লিগেশন ইত্যাদির পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে দেওয়া ভালো। এই তিনটিই রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক কাজকর্ম চালায়। এম্বেসি এবং হাই-কমিশন পদমর্যাদায় একই— ব্রিটিশ ক্রাউনের আওতায় থাকলে এম্বেসির নাম হাইকমিশন, লিগেশন পদমর্যাদায় ছোট। কনসুলেটের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনমতো একাধিক কনসুলেট থাকতে পারে— কিন্তু একাধিক এম্বেসি হয় না— এবং সে স্থানে কনসুলেট-জেনারেলও থাকে। ট্রেড-কমিশন কনসুলেটের চেয়ে জাতে ছোট্ট— অনেকটা এক্সপেরিমেন্টাল পোস্ট-অফিসের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে তার পদবৃদ্ধি হয়। কোনো কোনো দেশে আমাদের কনসুলেট না থাকলে, সেখানকার এম্বেসি-হাই-কমিশন-লিগেশন ওই কাজও করে থাকে। এইসব তাবৎ প্রতিষ্ঠান আমাদের ফরেন অফিসের তাঁবেতে থাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর এসব 'মেল' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলাতে গেলে আমরা পুজোর বাজার পেরিয়ে শ্যামাপুজোয় পৌঁছে যাব। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার মনে হয় আমাদের স্বার্থের জন্য উপস্থিত স্প্যানিশ-ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আপনি বলবেন, ওইটুকু দেশ স্পেন— তার 'ভাঙা নৌকায়' আমাদের কতখানি 'সোনার ধান' ধরবে!

আমি স্পেনের কথা আদপেই ভাবছি না। আমি ভাবছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা। সেখানে ডজনখানেক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের ভাষা স্প্যানিশ— হিস্পানি। ওদের গুটিকয়েকে আমাদের রাজদূতরা বেশ কিছুকাল হল ডেরা গেড়ে বসেছেন। আমার বিশ্বাস সবকটাতে না হোক, বাকি অনেকগুলোতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজদূতাবাস বসবে। অতএব আমার সলা যদি নেন তবে স্প্যানিশ শিখুন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অধমের জ্ঞান অতিশয় অপ্রচুর। তবু বলব, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে এদেরই সঙ্গে আমাদের বাড়বে। সংক্ষেপে তার কারণটা বলি— আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং রাশা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বলতে গেলে তাদের সম্পূর্ণ অর্থনীতি যুদ্ধ প্রস্তুতির চতুর্দিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করেছে যে তারা কিনতে চায় যুদ্ধের জন্য তাদের যেসব মালের দরকার এবং বেচতে চায় যুদ্ধের জন্য যার প্রয়োজন নেই। আর যুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে আপনার অর্ডারগুলো তারা শিকেয় তুলে রাখবে, আপনার কাঁচামাল বন্দরে বন্দরে পচবে। দক্ষিণ আমেরিকা এসব আওতার বাইরে। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই যাবে— আমাদের তৃতীয় 'স্বরাজ' লাভের পর। দশটা রাজদূতাবাস যদি তিন শটা চাকরি দিতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেবে তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার। আর চাকরি ছেড়ে দিয়ে যদি ভাষায় জোরে ব্যবসা চালান তবে তো আর কথাই নেই।

এস্থলে আরেকটি তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিই। ভাষা শেখার সময় গোড়ার দিকে সমগোত্রের ভাষা শিখে তাড়াতাড়ি ভাষার সংখ্যা বাড়িয়ে দেবেন। উদাহরণস্থলে বলি আপনি বাঙালি, আজ যদি আপনাকে নিছক ভাষার সংখ্যাই দেখাতে হয় তবে আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অসমিয়া এবং উড়িয়া নিয়ে। এ দুটি ভাষা বাঙলার এত কাছাকাছি যে আপনাকে বেগ পেতে হবে অতি কম। তার পর শিখবেন, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, গুরুমুখী, ঠিক ওইরকমই পর্তুগিজ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা স্পেনিশ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনার বাঙলা জানা থাকলে অসমিয়া শিখতে কতদিন লাগার কথা? না হয় তারই ডবল ধরুন স্পেনিশ শেখা হয়ে গেলে পর্তুগিজ, কিংবা ফরাসিস শিখতে। ঠিক সেইরকম জর্মন ফ্লেমিশ এবং ডাচ পড়ে অন্য গোত্রে। একদা ব্রাসেল্‌স্‌ শহরে আমি একখানা ফ্লেমিশ খবরের কাগজ কিনে পড়ে দেখি মোটামুটি বক্তব্যটা ধরে ফেলতে পেরেছি— অল্পস্বল্প যা জর্মন জানি তার-ই কৃপায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি অসমিয়া শিশুশিক্ষা কখনও পড়েননি। একখানা অসমিয়া বই নিন। দেখবেন বারো আনা পরিমাণ অনায়াসে বুঝতে পারছেন। কিংবা বেতারে যখন 'অসমীয়া বাতরি' শোনেন তখন কি তার মোটামুটি অর্থ ধরতে পারেন না?

তাই এই অনুচ্ছেদের গোড়াতে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির যেকথা তুলেছিলুম সেটাতে ফিরে যাই। অর্থাৎ গুরুর সাহায্যে যদি বিদ্যায়তনে আপনি স্পেনিশ আরম্ভ করেন তবে মাস দুই যেতে-না-যেতেই বাড়িতে, কারও সাহায্য ছাড়া পর্তুগিজ কিংবা ফরাসি আরম্ভ করে দেবেন। ব্যাকরণখানার দু দশপাতা ওলটাতে-পালটাতেই দেখবেন একসঙ্গে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা

www.pathagar.com

কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। গোড়ার দিকে কিছুটা গুবলেট হয়ে যাবে সন্দ নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে যদি সেটা কাটিয়ে না উঠতে পারেন তবে বুঝবেন ওইদিকে ভগবান আপনার প্রতি সদয় নয়, তখন না হয় লেগে যাবেন মানুষ মারার ব্যবসাতে— যাকে অজ্ঞজন বলে ডাক্তারি, কিংবা রেলকলিশনের পরিপাটি ব্যবস্থা করাতে— যাকে অজ্ঞজন নাম দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারি। কিন্তু নিবেদন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ম্যাট্রিক বড় কঠিন পরীক্ষা। আপনি যদি সেটা পাস করে থাকতে পারেন তবে গোটাতিনেক ভাষা শিখতে পারবেন না কেন?

গোত্রবিচারে ফিরে যাই।

১. লাতিন গোত্র— স্পেনিশ, ফরাসিস্, পর্তুগিজ, ইটালিয়ান।

২. জর্মন গোত্র— জর্মন, ডাচ, ফ্লেমিশ।

৩. তুর্কি গোত্র— তুর্কি (ওসমানলি তুর্কি, অর্থাৎ টার্কির ভাষা— তুর্কমানিস্থানের ভাষা, জগতাই তুর্কি। প্রথমটা মুস্তফা কামালের মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টা বাবুর বাদশার)

৪. হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশ কিন্তু এক হলেও শাখাতে বর্ণ-বৈষম্য প্রচুর।

৫. রাশান গোত্র— রাশান, পোলিশ, ল্যাটাভিয়ান, স্লোভাক ইত্যাদি।

৬. ইরানি গোত্র— ইরানি ফারসি ও কাবুলি ফারসি— পার্থক্য সামান্য।

৭. আরবি গোত্র— আরবি, হিব্রু, ইড্ডিশ (অধুনা প্যালেস্টাইনে প্রচলিত প্রাচীন হিব্রুর অর্বাচীন রাষ্ট্রভাষা), আহ্‌মেরিক (আবিসিনিয়ান ভাষা)।

৮. চীনা গোত্র— চীনা, জাপানি, কোরিয়ান ইত্যাদি।

৯. এছাড়া টিবেটো-বর্মন গোত্রের বর্মি ইত্যাদি। মালয়, থাই, ইন্ডোনেশিয়ন ইত্যাদি।

অজানাতে এবং জানাতে ছোট এবং বড় কোনও কোনও ভাষা বাদ পড়ে গেল। তাই নিয়ে শোক করবেন না। উপস্থিত এগুলো শিখে নিন। তা হলে অন্যগুলোর খবর আপনার থেকেই জানা হয়ে যাবে।

এর ভিতর সহজ ১ এবং ৬নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ২ এবং ৩নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ৫ নম্বরের গোত্র, তার চেয়েও কঠিন ৭নং, পারতপক্ষে ৮ নম্বরের পাড়া মাড়াবেন না (অবশ্য জাপানি তেমন শক্ত নয়), ৪ আর ৯ নম্বরের খবর জানিনে, তবে খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

দুই গোত্রের দুটো ভাষা একসঙ্গে শেখা যে খুব কঠিন তা নয়, তবে তার জন্য সৎপ্রতিষ্ঠান ও সৎগুরু প্রয়োজন। এই দুইটির বড়ই অভাব— এই দুঃসংবাদটি যতক্ষণ পারি চেপে গিয়েছিলুম; আর পারা গেল না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই সুসমাচারটিও বিতরণ করছি যে ভারতবর্ষের কোথাও এমন সুব্যবস্থা নেই যে তার পাল্লায় পড়ে আপনি হেরে যাবেন। এই যে আমাদের রাজধানী দিল্লি শহর, সেখানকার লোক কেন্দ্রের নোকরি বাবদে হামেহাল তেজনজর ওকিবহাল সেখানে যে দু একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অতিশয় রদ্দি অথচ টাকা লুটছে এন্তের। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কলকাতায় নাকি গোটাদুত্তিন প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বিদেশি ভাষা শেখানো হয়। খোঁজ করলে দেখবেন, খুড়ো-জ্যেঠার আমল থেকে বাড়িতে দু চারখানা মার্লবর পড়ে আছে, কিন্তু ইংরেজি ছাড়া কোনও বিদেশি ভাষা কেউ শেখেননি। আমিও ভূ-ভারতে এমন প্রাণীর সংস্পর্শে আসিনি যিনি ওইসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কলকাতাতে বসে কোনও বিদেশি ভাষা শিখেছেন। তবে ইদানীং অবস্থা একটু ভালো হয়েছে।

www.pathagar.com

অধমের শেষ সাবধানবাণী : সবকটা আণ্ডা একই ঝুড়িতে রাখবেন না— কুল্যে শির্নি একই দরগায় উজোড় করে দেবেন না। তার সরল অর্থ বিএ, এমএ পাস অবহেলা করে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বিদেশি ভাষার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না। এসব পড়াশুনো বিএ, এমএ, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাবেন— আড্ডাটা সিকিটাক কমিয়ে দিয়ে ফুটবল দেখাটা একটু মুলতবি রেখে দিয়ে। একদম ছেড়ে দিতে বলব কেন, তওবা, তা হলে আপনার বাঙালিত্বই যে উপে যাবে। ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে যদি সেদিকে নোকরি না জোটে তবে বিএ, এমএ পাস করে যা করতেন তাই করবেন। তা হলে অন্তত আমার গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে বলতে পারবেন না, 'তবে রে—, তোর কথায় না— ইত্যাদি।'

অনুকরণ না হনুকরণ

আগে-ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি— দুষ্টলোকে বলে, শক্তির অভাব— আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পচ্ছলে নিবেদন করি :—

প্রতি রোববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধে অবধি মাছ ধরে। বড় মাছের শিকারি, তাই ফাতনা ডোবে কালেকস্মিনে, আকছার রোববারই যায় বিন্‌-শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রোববারে এসে বসে, এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে। দু জনায় আলাপ-পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর শিকারি লোকটার 'আলসেমি' দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর একটু বিরক্তির সুরে শুধাল, 'ওহে, তুমি তা হলে নিজেই মাছ ধর না কেন?'

লোকটা আঁতকে উঠে বলল, 'বাপস! অত ধৈর্য আমার নেই।'

সমালোচনা লেখার ধৈর্য আমার নেই।

আর কীই-বা হবে সমালোচনা লিখে? ক'টা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে? ক'টা বুদ্ধিমান-মাছ টোপ গেলে? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচক প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোক্কর দেয় অনেককেই— অর্থাৎ রোক্কা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে। তখন পয়সার দাম তোলবার জন্য একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে, চারের রস যত না পেল বড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশি জখম হয়ে 'দুত্তোর ছাই' বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তা হলে আর দেখতে হত না। মারোয়াড়িরা সস্তায় রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো খুচকারি (অর্থাৎ খুচরোর লাভে, পাইকারির পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিত— ফাও হিসেবে দেশে নামও হয়ে যেত, 'সৎসাহিত্য' তথা 'সমালোচক'দের পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন আপ্তবাক্য নিবেদন করছি, 'পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা লেখানো যায়

www.pathagar.com

না।' নাহলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে-গন্ধে তাঁরা অস্মদ্দেশীয় সমালোচকদেরই মতো।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগান্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক)-দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন করিয়ে নিয়ে বাজিমাত করবেন। কিন্তু ভোটার— ভোটার যা পাঠকও তা— আহাম্মুক নয়, যদিও সরল বলে সত্য বুঝতে তার একটু সময় লাগে। নাহলে আওয়ামীরা মুসলিম লীগকে কস্মিনকালেও হটাতে পারত না।

আমিও মাঝেমধ্যে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার পড়ার ধরন স্পানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্পানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে একটুকরো রুটি চিবোয়— কারণ প্রভু যিশুখ্রিস্ট তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, 'আর আমাদের অদ্যকার রুটি দাও।' খানিকটে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, 'তওবা, তওবা, সেই গেল বছরে রুটিরই মতো যাচ্ছেতাই সোয়াদ।' তার পর বছরের আর ৩৬৪ দিন সে খায় কোর্মাকালিয়া কটলেট মমলেট। আমিও সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একদিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয়, সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ সেই গেল বছরের মতো— এক বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারেনি।

কথাটা যেভাবে বর্ণনা করলুম, তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠক-সাধারণ মাত্রেরই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচকদের কথা স্বতন্ত্র। তারা একে অন্যের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য? রাম রাম! শুধুমাত্র দেখবার জন্যে কে তার মতে সায় দিয়েছে, কে দেয়নি এবং সেই অনুযায়ী দল পাকানো, ঘোঁট বাড়ানো, শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আণ্ডাটা— থাক্।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনও হয়— এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র— তা হলে সেটা আপনাদেরই পাতে নিবেদন করব। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনও আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও লেখাটা না পড়তে।

* * *

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিগ্যেস করেছেন, 'কী প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?'

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলুম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলা দেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ তদ্বির করলেই দু চারটে প্রাইজ পেয়ে যাব, লোকসভার সদস্যগিরি, কলচেরল ডেলিগেশনের মেম্বারি এসবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে— বিলেত দেখার আমার ভারি শখ্, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠেনি। ইংরেজিটা জানিনে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল। এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরেজি না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গৃহিণী নিরক্ষরা— টিপসই করে হালে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালাকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছে। তাঁর কাছে চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়েছিলুম। তিনি করলেন উল্টো অর্থ। সেটা আরও সরল। ব্যবসাতে যে দেউলে হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধানে; ফেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়।

এর উত্তর আমি দেব কী? গৃহিণী যে ক'টা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায়-টায় মিলে যায়। মনে হয় আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর-শাশুড়ি ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকুই শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কী প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য তার জন্য যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে। ওটা তাদের বিধিদত্ত জন্মলব্ধ অশিক্ষিতপটুত্ব। যেসব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মণীয় আপ্তবাক্য আমি মেনে নিয়েছি। তিনি তালাকের দরখাস্তটি উইথড্র করেছেন— শুনে দুঃখিত হবেন।

* * *

শঙ্করাচার্য দর্শনরণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'সাংখ্যমল্লকে আহ্বান কর। সে-ই মল্লদের অধিপতি। তাকে পরাজিত করলে অন্যান্য সফরি-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অযথা কালক্ষয় করতে হবে না।' আমি শঙ্কর নই। তাই সবচেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

প্রশ্নটি এই : 'মপাসাঁর ছোটগল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অনুকরণকারীদের গল্প এত বিস্বাদ কেন? অপিচ, মপাসাঁ ছোটগল্প লেখার যে কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন তার অনুকরণ না করে গল্প লিখিই-বা কী প্রকারে?'

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যেভাবে গান গান তারই হুবহু অনুকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে। ভারতনৃত্য শিখতে গেলে মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লের নৃত্য অনুকরণ করতে হত ততোধিক কাল। স্যাকরার শাগরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরুর অনুকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক খবর আমার জানা নেই। ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ।

সাহেবরা এ দেশে এসে বলল, 'এত বেশি অনুকরণ করলে নিজস্ব সৃজনশক্তি (অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায়। ফলে কোনও কলার আর উন্নতি হয় না।' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকনো আছে।

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কী হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি অধ্যয়ন না করেই আরম্ভ হয়ে যায়, 'এপিক' লেখা, দু কদম চলতে না শিখেই ডান্‌স্ 'কম্পোজ' করা, আরও কত কী, এবং সর্বকর্মে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়ার পন্থা তো সবসময়েই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প— শহর-পাগলা ভাবত, সে বিধবা মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগল সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলাগারদের বড় ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, 'তা তুমি খালাস হওয়ার পর

www.pathagar.com

করবে কী?' সুস্থ লোকের মতো বলল, 'মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাব।' 'সেটা যদি না হয়?' চিন্তা করে বলল, 'তা হলে আমার বিএ ডিগ্রি তো রয়েছেই— টুইশনি নেব।' তার পর একগাল হেসে বলল, 'অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু নাহলে যেকোনো সময়ই তো আবার মহারানির স্বামী হয়ে যেতে পারব।' সমালোচক সবসময়ই হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অন্য পন্থা নিল। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করল না— তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। আবার বিন্-তালিমের 'অরিজিনালিটি' পাঠক-সাধারণ পছন্দ করে না। উপায় কী? তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলো বাছাই বাছাই জিনিস অনুকরণ করল এবং শুধু অনুকরণেই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিল বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাঁড়িয়ে গোপনবাসের জন্য গেছেন চিলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন 'সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট ঘরে চার্লি চ্যাপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবন্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজের ইস্‌পার উস্‌পার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণের পুরস্কার পাঁচ শ টাকা।'

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে কী হয়।

ছাব্বিশজন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন তেরো নম্বর।

তার সরল অর্থ, ওই ছোট শহর, ধেড়ধেড়ে ডিহি গোষ্ঠীপুরে বারোজন ওস্তাদ রয়েছেন যাঁরা চার্লিকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পার্ট কী করে প্লে করতে হয়।

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, 'হে ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারোজনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরব।'

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন এঁরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মশকরাতে পরিণত করেছেন; চার্লি যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন, এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমিন ফাটিয়ে আড়াই ঘটি চোখের জল ফেলেছেন; চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চার্লি যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশান্ত শিব সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁরা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক-একটি বিকট মর্কট।

ঘরোয়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরষের তেলেরই বড় বেশি সোনালি ঝাঁঝ— মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের 'দোদুল-দোলা', 'ব্যাকুল রেণু', 'উদাস হিয়াকে' 'দোলাতর', 'বেণুতর' করে নিত্য নিত্য কত না নব নব মশকরা হচ্ছে। কিন্তু তবু চার্লি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা-ই হোক মার্কিন মুল্লুক পরশুদিনের গড়া নবীন দেশ। ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীন দেশে এক গুণীজ্ঞানী, চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাফেরা-জীবনধারা, তেমনি তাঁর অদ্ভুত বচনবিন্যাস। বুদ্ধের কীর্তিকাহিনী তিনি কখনও বলতেন বলদৃপ্ত কণ্ঠে, কখনও সজল করুণ নয়নে— তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে, আর উৎসাহের বচন শুনে বহু শত নরনারী

www.pathagar.com

একই দিনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করত। ক্রমে ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধ-ধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠল, বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপীতাপীকে ধর্মের মার্গ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করল।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তাঁর মৃত্যুক্ষণ কাছে এল। তাঁর মন কিছু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তাবাত্যা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয় জিগ্যেস করলে, সেবাতে কোনও ত্রুটি হচ্ছে কি না।

গুরু বললেন, 'না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনও ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?'

শিষ্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ কঠিন কাজ কাঁধে তুলে নেবে?

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অজানা এক নতুন শিষ্য সামনে এসে বলল, 'আমি এ ভার নিতে পারি।'

গুরুর বদনে প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠল। তবু ঈষৎ দ্বিধার কণ্ঠে শুধালেন, 'কিন্তু বৎস তোমাকে তো আমি চেনবার অবকাশ পাইনি। তুমি কি সত্যই এ কাজ পারবে? ওই দেখ, আমার দীর্ঘদিনের শিষ্যেরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যেকোনো বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতা দাও তো।'

বিস্ময়! বিস্ময়!— সেই শিষ্য তখন গলা খুলে, গাধার মতো— হুবহু গাধার মতো চেঁচিয়ে উঠল। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচাল।

সবাই বাক্যহীন নিস্পন্দ।

ব্যাপার কী?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ত্রুটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অন্য বক্তাদের তুলনায় একটু বেশি চিৎকার করে কথা বলতেন, ভুঁইফোঁড় শিষ্য ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গূঢ় রহস্য। ওই কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চ্যাঁচানোর চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যদ্রষ্টা, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।

To ape-এর বাংলা, হনুকরণ।'

এস্থলে রাসভকরণ।

ফরাসি-বাঙলা

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোনও এক স্থলে খেদ করেছেন আমরা ইয়োরোপের যে-টুকু চিনলুম সেটা ইংরেজের মারফতে।

তিনি ঠিক কী বলেছিলেন মনে নেই বলে অপরাধ মেনে নিবেদন করি, ইংরেজ বরঞ্চ চেষ্টা করেছে আমরা যেন ইয়োরোপকে না চিনতে পারি।

www.pathagar.com

ইংরেজ যখন এদেশে রাজত্ব করত তখন দুটি প্রচারকর্মে মেতে থাকতে সে বড় আনন্দ পেত। তার প্রথম, বিশ্বজনকে জানানো যে, ভারতীয়েরা ড্যাম নিগার, কালা আদমি, তাদের কোনওপ্রকারের কল্‌চর্‌ নেই। দ্বিতীয়, ভারতীয়দের জানানো, ইংরেজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং তাই (আ ফর্তেরিয়রি) ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নেশন তো বটেই। প্রমাণস্বরূপ শেক্সপিয়রের নাম করল।

আমরা তখন আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই-পরখ করে দেখলুম, কথাটা ঠিক; শেক্সপিয়রের মতো কবি পৃথিবীতে কম— নেই বললেও চলে। ইংরেজিতেই পড়লুম, ফরাসি-জর্মন-ওলন্দাজ-দিনেমার সবাই একথা স্বীকার করেছে। তাই আমরা ইংরেজের বাদবাকি দাবিগুলোও সুড়-সুড় করে মেনে নিলুম। ঘড়েল মিথ্যে সাক্ষী— কনফিডেন্স ট্রিক্‌স্টার— এইভাবেই সরল জনকে আপন সব পচা মাল পাচার করে দেয়।

ইংরেজ কিন্তু একথা বলতে ভুলে গেল, উপন্যাসে তার টলস্টয় নেই, গল্পে তার মপাসাঁ নেই, চিত্রকলায় তার রাফায়েল নেই, ভাস্কর্যে তার মাইকেল এঞ্জেলো নেই, দর্শনে কান্ট নেই, নৃত্যে পাভলোভা নেই, ধর্মে লুথার নেই, সঙ্গীতে বেটোফেন নেই।

বিশেষ করে বেটোফেনের কথাই তুললুম।

ইংরেজ জাত সুর-কানা। তাই সে বেটোফেনের নাম করে না। তাই ইংরেজের বাড়িতে সঙ্গীত-চর্চা নেই। যদি থাকত তবে এ দেশের বড় সায়েবদের বাড়িতেও সে চর্চা আসন পেত। আমরাও ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতুম। ইংরেজ চর্চা করল এবং আমাদের শেখাল— জ্যাজ্‌, যেটা তার খুড়তুতো ভাই মার্কিন শিখল তাদের গোলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে।

অতি অবশ্য আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে ফ্রান্স-জর্মনি-ইতালি-রুশে যায়নি বটে, কিন্তু শতে শতে তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক জন ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সংখ্যা এক হাতের এক আঙুলে গোনা যায় (এবং আশ্চর্য, যে মহাজন আমাদের সঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তিনি কখনও ফ্রান্সে যাননি— তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

'দেশ' পত্রিকার এ সংখ্যা ফরাসিস সাহিত্য নিয়ে। অতএব সেই বিষয়বস্তুর ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করি।

ইংরেজি ভাষা গম্ভীর এবং জটিল কিন্তু তার প্রসাদগুণও আছে। ফরাসি চটুল ও রঙিন। অতিশয় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করার সময়ও ফরাসি কেমন যেন একটুখানি তরল থেকে যায়। পক্ষান্তরে রসিকতা করার সময়ও ইংরেজি তার দার্ঢ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। চার্লস ল্যাম, এমনকি জেরম্‌ কে জেরম্‌ পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ধ্রুপদ। উড্‌হাউসে এসে আমরা সর্বপ্রথম চটুলতা পাই।

কিন্তু এহ বাহ্য। ফরাসি ভাষার সর্বপ্রধান গুণ তার স্বচ্ছতা, তার সরলতা। ফরাসিরা নিজেই বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার, ক্লিয়ার) নয় সে জিনিস ফরাসি নয়।' আমাদের দেশে আজকাল যে দুর্বোধ্য অবোধ্য পদ্য বেরোয় সে 'মাল' প্রথম যখন ফ্রান্সে বেরুতে আরম্ভ করল তখন গুণী আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'সে মধুর ললিত বয়সে মানুষ অবোধ জিনিস

www.pathagar.com

ভালোবাসে আমার সে বয়স পেরিয়ে গিয়েছে; আমি আলো ভালোবাসি।' তাই আরেক গুণী শেষ কথা বলেছেন, 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা পুনরপি স্বচ্ছতা।'

ফরাসি চটুলতা হয়তো অনেকেই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফরাসি স্বচ্ছতা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে যদি আসত তবে আর কিছু না হোক, আমাদের মনন-সাহিত্য যে অনেকখানি লোকপ্রিয় হত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি আরও একটুখানি ফরাসি আওতায় আসতেন তবেই ঠিক বোঝা যেত তাঁর দেবার মতো সত্যিই কিছু ছিল কি না। এ বিষয়ে বরঞ্চ বলব, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্করের লেখা অনেকখানি ফরাসিস্।

শব্দতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিকেরা ঠিক ঠিক বলতে পারবেন কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার নিবেদন, বাঙলা ভাষার ওপর ফরাসি ভাষার (Language) প্রায় কোনও প্রভাবই পড়েনি। বাঙলাতে কটি ফরাসি শব্দ ঢুকেছে সেকথা প্রায় আঙুলে গুনেই বলা যায়। অবশ্য এইটেই শেষ যুক্তি নয়; আমরা বাঙলাতে প্রচুর আরবি এবং ফারসি শব্দ নিয়েছি বটে কিন্তু ওই দুই ভাষার প্রভাব আমাদের ওপরে প্রায় নেই। কিন্তু অন্য কোনও বাবদেও ফরাসি ভাষার প্রভাব বাঙলার ওপর আমি বড় একটা পাইনি।

সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ইনি ফরাসি সাহিত্যের যতখানি চর্চা করেছেন ততখানি চর্চা বাঙলা দেশে তো কেউ করেনইনি, অল্প ইংরেজ জর্মন ইতালীয়ই— অর্থাৎ অফরাসিস— করেছে। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাট্য, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, কত বিচিত্র বস্তুই তিনি ফরাসি থেকে অনুবাদ করে বাঙলায় প্রচার করেছেন। এই যে ইংরেজি এবং ফরাসি পাশাপাশি জাতের ভাষা— সেই ইংরেজিতেই পিয়ের লোতির লেখা 'ভারত ভ্রমণ' অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজ অনুবাদক হিমশিম খেয়ে গিয়েছেন অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে মূল ফরাসি যে ঠিক ঠিক ধরা পড়েছে তাই নয়, প্রাচ্যদেশীয় আবহাওয়াও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে।

এই জ্যোতিরিন্দ্রের বাঙলা ভাষাতেই ফরাসি ভাষার কোনও প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

* * *

বরঞ্চ ফরাসি শৈলীর (style) প্রভাব বেশ কিছুটা আছে।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা পাকাপাকিভাবে বলতে পারবেন, বাঙলার কোন লেখক সর্বপ্রথম ফরাসির সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন; আমি শুধু সার্থক সাহিত্যিকদের কয়েকজনের কথাই তুলব।

মাইকেলের সার্থক সৃষ্টিমাত্রই গম্ভীর— সংস্কৃত এবং লাতিনের ক্লাসিকাল গুণের সঙ্গে তিনি তাঁর বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন। ওদিকে তিনি আবার অতি উত্তম ফরাসি জানতেন— নতুন ভাষা তিনি যে কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারতেন, সেকথা আজকের দিনের ভাষার 'ব্যবসায়ী'রা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না— কিন্তু সে 'রঙিলা ঘরানা' তাঁর ভাষার ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১] তাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে তিনি লা ফঁতেনের ধরনে 'ফাব্‌ল্' (ফেব্‌ল) রচনা করলেন কেন? লা ফঁতেন তাঁর অনেক গল্প নিয়েছেন ঈশপের

১. বরঞ্চ গৌর বসাককে লেখা চিঠিগুলোতে প্রচুর ফরাসি ফ্রিভলিটি পাবেন।

www.pathagar.com

গম্ভীর গ্রিক থেকে, কিন্তু লিখছেন অতি চটুল ফরাসি কায়দায়। অথচ তাঁরই অনুকরণে যখন মাইকেল বাঙলাতে 'ফাব্‌ল্' রচনা করেছেন তখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলছেন,

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে—'

দুই সুর একেবারে ভিন্ন। অথচ মাইকেলের প্রায় সবকটি 'ফাব্‌লে'র উৎস লা ফঁতেন।

প্রহসনেও তাই। *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*-র মূলে মলিয়ের। অথচ শৈলীতে গম্ভীর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। যদিও তাঁর আপন ভাষাতে ফরাসি প্রভাব নেই তবু তিনি অনুবাদের মারফতে যে শৈলী এবং বিষয়বস্তুর অবতারণা করে গেলেন তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের দূর-দূরান্ত কোণে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরও বহুদিন ধরে পৌঁছবে।

তোয়েফিল-গতিয়ে, এমনকি বাল্‌জাক্‌ও মপাসাঁর পূর্বে কয়েকটি সার্থক ছোটগল্প লিখেছেন কিন্তু আজ শুধু ফরাসিস না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করে, মপাসাঁই ছোটগল্পের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, দীর্ঘ উপন্যাস না লিখেও পাঠককে কী প্রকারে কাহিনী-রসে আপ্লুত করা যায় ('কণ্ঠহার' গল্প নিয়ে সাত-ভলুমি 'জাঁ ক্রিস্তফ' লেখা যায়)। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য ডস্‌তেয়ফ্‌সকির মতো ভলুম না লিখেও 'সূত্ররূপে' সেই রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছোটগল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ যবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মারফতে মপাসাঁকে চিনতে শিখলেন তবে থেকেই তাঁর গল্প ঋজু কাঠামো নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ পেল (অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে থাকত প্রচুর গীতরস) এবং পরবর্তী যুগে তিনি অন্য এক মিস্‌টিক নবরসে ছোটগল্পকে এক নবরূপ দান করেন।

* * *

দান্তে, শেক্সপিয়র, গ্যোটে, কালিদাস কেউই পৃথিবীর সুদূরতম সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারেননি মপাসাঁ যতখানি করেছেন। এটম্ বম্ হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু বাইসিক্‌ল ও সেলাইয়ের কল যেরকম গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছে এটম্ বম্ শেক্সপিয়র সেরকম সাহিত্যে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতে পারেননি।[২]

অথচ আজও যখন কোনও মানুষের জীবনের কোনও এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে সে তখন তার প্রকাশ দেবার চেষ্টা করে ছোটগল্পের মাধ্যমে, অর্থাৎ মপাসাঁর কাঠামো নিয়ে। ইংরেজ, জর্মন, রুশ, বাঙলা এসব অর্বাচীন সাহিত্যের কথা বাদ দিন, অতিশয় প্রাচীন চীন-আরবির মতো ক্লাসিকাল সাহিত্যেও আজকের দিনে মপাসাঁ ছোটগল্পে আদি গল্পগুরু বাল্মীকি। সবাই তাঁরই 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।'

* * *

বাংলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি ফরাসি জানতেন কি না শৈলী-আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং এদের মাধ্যমে মপাসাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের

২. হেমচন্দ্র বিস্তর শেক্সপিয়র অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলাতে আজ পর্যন্ত কেউ শেক্সপিয়রের অনুকরণ করেননি।

www.pathagar.com

কোনও গল্পলেখকই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো মপাসাঁর এত কাছে আসতে পারেনি। মপাসাঁর মতো প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণি, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মতো তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দু জনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিক রূপে মপাসাঁ ফ্রান্সে বিশেষ কোনও সম্মান পাননি; বাঙলা দেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নিবেদন, প্রভাত-পরবর্তী যুগের প্রায় সব বাঙালি গল্প-লেখকই মপাসাঁর অনুকরণ করেছেন প্রভাতের মাধ্যমে।

* * *

এই সময়ে 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক নতুন কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এ গোষ্ঠী অহরহ অনুপ্রেরণা পেত জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এঁদের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী ও সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা প্রধানত ফরাসি সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে বাঙলা দেশে এক নতুন ফরাসিস 'গুলস্তান' বানাতে আরম্ভ করলেন। এঁদের একটা মস্ত সুবিধে ছিল এই যে, এঁরা রবীন্দ্রনাথের গড়া আধুনিকতম বাঙলার সম্পূর্ণ ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সুযোগ পাননি বলে তাঁর ভাষা ছিল বিদ্যাসাগরী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাবলীল ভাষা ব্যবহার করাতে তখনকার দিনের বাঙালি পাঠকের মর্মদ্বারে দরদী আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

সবচেয়ে 'তাজ্জব ভেল্কিবাজি' দেখালেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তা-ও আবার কাব্যে। এক ভাষার কবিতা যে অন্য ভাষাতে তার আপন রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে এরকমভাবে প্রকাশ পেতে পারে এর কল্পনাও বাঙালি পাঠক এর পূর্বে কখনও করতে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমনকি রবীন্দ্রনাথও বিদেশি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এক 'সদ্ভাবশতক' ছাড়া অন্য কোনও বই জনপ্রিয় হতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন, অনুবাদ মাত্রই কাশ্মিরি শালের উল্টোদিকের মতো; মূল নকশার সন্ধান হাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর সব সৌন্দর্য উল্টো পিঠে ওতরায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন, ওতরায়, এবং মাঝে মাঝে উল্টোদিকটাও মূলের চেয়ে বেশি মূল্য ধরতে জানে।

যাঁরা সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন। অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক কান্তি ঘোষ বহুবার একথা বলেছেন। তিনি নেই। তাই আজকের দিনের সবে-ধন নীলমণি নরেন্দ্র দেবকে আমি সাক্ষী মানছি।

তোয়েফিল গতিয়ে, রঁসার ল্যকঁৎ দ্য লিল্, ভেরলেন্, বদলের, য়ুগো (Hugo), শেনিয়ে, মিস্ত্রাল, ভেরেরেন, ভালমোর, বেরাজেঁ— কত বলব?— কত না জানা-অজানা কবির কত না কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কুম্ভ 'তীর্থ সলিল' পূর্ণ করলেন, কত দেশের কত 'তীর্থরেণু' বাঙালির কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

ঋগ্বেদে আছে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের পুরোহিত, কারণ তুমি আমাদের সর্ব আহুতি দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। সত্যেন্দ্রনাথ বহু দেশের বহু কবির পুরোহিত।

* * *

www.pathagar.com

কথাসাহিত্যেও ওই সময়ে প্রচুর ফসল ফলল। গতিয়ে, য়্যুগো, মেরিমে, দোদে, মপাসাঁ, দ্যুমা, বাল্‌জাক্‌ ইত্যাদি বহু লেখকের বহু ছোটগল্প এবং উপন্যাসও বাঙলায় অনূদিত হল। এ গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বাঙলা সাহিত্যে কতখানি স্থায়ী মূল্য ধরে তার বিচার একদিন হবে; উপস্থিত বলতে পারি এঁরা বাঙলা সাহিত্যে যে ফরাসি উদারতার আমন্ত্রণ জানালেন তার ফলে পরবর্তী যুগের বাঙালি লেখক গোড়ার থেকেই সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে সাহিত্যের আরাধনা করতে পেরেছিলেন। হঠাৎ একদিন বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে এঁদের লোকপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু শরতের মোহ কেটে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেন যে কেউ এঁদের হেমন্তের সফলতা সন্ধান করে না সে এক আশ্চর্যের বস্তু।

* * *

বাঙলায় ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে শুধু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। ইনিই একমাত্র বাঙালি সাহিত্যিক যাঁকে সর্বার্থে ফরাসিস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র এঁরই ভাষাটিতে 'ইভনিং ইন প্যারিসে'র খুশবাই পাওয়া যায়। এঁর শৈলী ফরাসি শ্যাম্পেনের মতো বুদ্বুদিত, ফেনায়িত। এমনকি এঁর বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে ফরেসডাঙার ধুতি পরে মজলিসে এসে বসে। বাংলা সাহিত্যে বহু পণ্ডিত, বহু দার্শনিক, বহু কলাবিদ এসেছেন, কিন্তু একমাত্র এঁকেই সত্য বিদগ্ধজন বলা যেতে পারে। এবং সে বৈদগ্ধ্য ফরাসি বৈদগ্ধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসিদের সঙ্গে বাঙালির চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়েছিলেন; প্রমথনাথে দুই সাহিত্যের গভীরতম প্রণয়ালিঙ্গন।

এঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়তো বাঙলা দেশ একদিন ভুলে যাবে কিন্তু এই বাঙালি ফরাসিস্‌ চরিত্রকে বাঙালি কখনও ভুলবে না।

প্রমথনাথের শেষ বয়সে ভারতীয় গোষ্ঠীর মুমূর্ষু অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফরাসি পণ্ডিত সিলভা লেভি এদেশে আসেন। তাঁর চতুর্দিকে তখন এক ফরাসি পণ্ডিতমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এঁদের প্রধান ফণী বোস[৩], প্রবোধ বাগচী, মণি গুপ্ত, শশধর সিংহ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন। এঁদের কেউই প্রচলিতার্থে সাহিত্যে নামেননি কিন্তু এঁদের মাধ্যমে আমরা এদেশে সর্বপ্রথম ফরাসি পাণ্ডিত্যের সন্ধান পাই। এতদিন আমরা জানতুম, ইয়োরোপীয় 'প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব' বলতে বোঝায় ইংরেজ। এঁরা প্রথম দেখিয়ে দিলেন, ফরাসিস্‌ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে রাজত্ব না করেও ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা করেছে প্রচুর।[৪] বিশেষ করে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতাদি। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি সাহিত্য ছাড়া অন্য রসে ইংরেজ বঞ্চিত। ফরাসিরা সেখানে যথার্থ গুণী। মণি গুপ্তের অনুবাদে বাঙালি তার সন্ধান পাবে। শান্তা দেবী এই সময়েই বিশ্বভারতীতে ফরাসি শেখেন।

এই গোষ্ঠীর বাইরে আর দু জন পণ্ডিতের নাম করতে হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ রায় আর কালিদাস নাগও এই যুগের লোক।

* * *

৩. ইনি যৌবনেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এঁর রচনা তখনই বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৪. পরবর্তী যুগে ভিন্‌টারনিৎস জর্মন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং তুচ্চি ইতালির পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। এঁদের সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, বিশ্বভারতীতে।

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের জোড়া কুতুব-মিনার? বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ? তা হলে দীর্ঘতম প্রবন্ধ লিখতে হয়। এ যুগের ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, imitation-এর বাঙলা অনুকরণ; aping-এর বাংলা কী? 'হনুকরণ'। যাঁরা ফরাসির 'হনুকরণ' করেন তাঁদের উল্লেখ আমি এ প্রবন্ধে করিনি। পদস্খলন সকলেরই হয়। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের কেউ কেউ হয়তো অজানাতে মাত্রাধিক্য করেছেন কিন্তু এ দুটি লোক সম্বন্ধে অধম নিঃসংশয়।

বঙ্কিম কিঞ্চিৎ ফরাসিস জানতেন। কিন্তু তিনি ইংরেজির মাধ্যমে কঁৎ-কে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পূর্বসূরিগণের প্রসাদাৎ কঁৎ ফরাসি তর্কালোচনায় যে শুভবুদ্ধির (rationality-র) চরমে পৌঁছেন, বঙ্কিম সেই শাণিত অস্ত্র নিয়ে হিন্দুধর্ম রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার সবিস্তর আলোচনা অসম্ভব। তাই এই আক্ষেপ দিয়েই বঙ্কিমালোচনা শেষ করি, হায়, তাঁর এই শুভবুদ্ধির অনুসরণ আর কেউ করল না কেন? যে লোক ইস্তেক দয়াসাগরের খেলাফে তলোয়ার খাড়া করেছিল তার অনুকরণ অনুসরণ, এমনকি 'হনুকরণ'ও কেউ করল না কেন?

রবীন্দ্রনাথের ওপর মপাসাঁর ছায়া পড়েছিল সেকথা পূর্বেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ফরাসি কবিতানাট্য এমনকি 'শারাদ'-ও পড়েছিলেন। তারই ফলে—

Celui qui me lira, dans les
siecle, un soir,
Troublant mes vers—

ইত্যাদি ইংরেজিতে শব্দে শব্দে অনুবাদ :

One who will read me, after centuries, one evening— turning over my verses—

'আজি হতে শতবর্ষ পরে' হয়ে বেরুল। কিন্তু প্রথম কয়েক ছত্রের পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন।

ঠিক সেই সময় মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' যে কাঠামোতে[৫] লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'অরূপরতন' সেই কাঠামো নিয়ে, কিন্তু উভয় নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রসনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ককে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন। এবং সর্বশেষ নাটকদ্বয় 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'-র কাঠামোও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব— ভাষা, শৈলী, রসনির্মাণ পদ্ধতি রাবীন্দ্রিক তো বটেই।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, অরবিন্দ ঘোষ (ইনি উত্তম ফরাসি জানতেন)— এঁদের মতো প্রতিভাবান লেখকের রচনাতে এঁর প্রভাব, ওঁর ছায়াপাতের অনুসন্ধান করে কোনও লাভ নেই। হীনপ্রাণ লেখক সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ওই বুঝি লোকে ধরে ফেলল, সে অমুকের কাছ থেকে ধার নিয়েছে; তাই সে মহাজনদের বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই এত বড় মহাজন যে, তাঁরা যত্রতত্র অনায়াসে বিচরণ করেন। ক্ষুদ্রতম লেখকের বাড়িতেও পাত ফেলতে তাঁদের কণামাত্র ভয় নেই। তাঁদের ঘানিতে যাই ফেল না কেন, স্নেহঘন হয়ে বেরিয়ে আসবে।

---

৫. 'লোয়াজো ব্ল্যা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলায় অনুবাদ করেন।

www.pathagar.com

এইবারে শেষ প্রশ্ন : ফরাসির ওপর বাঙলা কোনও প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

রলাঁ যেরকম বহু বাঙালি লেখককে প্রভাবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি, তিনিও বাঙালি গুণী-জ্ঞানীদের সন্ধান রাখতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং এঁদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। বহু ফরাসি এঁরই মারফতে বাঙলা দেশের অনেক কিছু চিনতে শিখেছে।

পূর্বেই বলেছি, লেভির সঙ্গ পেয়ে বাঙালি গুণী ফরাসি পাণ্ডিত্যের চর্চা করেছিল। লেভি নিজে করলেন উল্টোটা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে তাঁর সাহায্যে করলেন 'বলাকা'র ফরাসি অনুবাদ। আজ যদি শুনি, পাণিনি কোনও এক চীনা কবির রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন তা হলে যেরকম আশ্চর্য হব।

শ্রীমতী আঁদ্রে কার্‌পেলেজ ফরাসিতে একখানা সঞ্চয়িতা বের করেন। তার নাম 'ফ্যই দ্যা ল্যাঁদ'— 'লিভ্‌জ্ অব্ ইন্ডিয়া'। এই চয়নিকায় বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা ছিল প্রধানত। দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানা আমার হাতের কাছে নেই।

এবং নেই, শান্তিনিকেতনে ফরাসি ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ফের্না বেনওয়ার রচনাবলি। অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তিনি 'মুক্তধারা'র ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন 'লা মাশিন' (দি মেশিন) নাম দিয়ে। এর পরবর্তী যুগে বাঙলা সম্বন্ধে আরও বিস্তর লেখা ফরাসিতে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন।

এবং মারাত্মক নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসি প্রেসের অভিমত, অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ যতবার ফ্রান্সে গিয়েছেন, যখনই তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে, ফ্রান্স তখনই বাঙলা দেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁকে স্বীকার করেছে। প্যারিসে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ কর্ম নয়— এসব প্রেস-কাটিংস্ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

অর্থাৎ হাতের কাছে কিছুই নেই— 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই'—

তাই আর কেউ বলার পূর্বেই স্বীকার করে নিই, এ লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

চার্লি চ্যাপলিন

আমার ছেলেবেলায় বায়স্কোপও ছেলেমানুষ ছিল। হরেকরকম ফিলিম তখন আসত; ছোট, বড়, মাঝারি— এখনকার মতো স্টান্ডার্ডাইজ্‌ড নয়। সেনসর বোর্ড-ফোর্ডও তখন শিশু, এখনকার মতো 'জ্যাঠা' হয়ে ওঠেনি— 'এটা অশ্লীল,' 'ওটা কদর্য', 'সেটা বড়কর্তাদের নিয়ে মশকরা করেছে' বলে দেশের-দশের রুচি মেরামত করার মতো হরিশ মুখুয্যে দি সেকেন্ড হয়ে ওঠেনি। কাজেই হরেক রুচির ফিলিম তখন এদেশে অক্লেশে আসত এবং আমরা সেগুলো গোগ্রাসে গিলতুম। তার ফলে আমাদের চরিত্র সর্বনাশ হয়েছে, একথা কেউ বলেনি। এবং আজ যে সেনসর বোর্ডের এত কড়াক্কড়ি, তার ফলে এযুগের চ্যাংড়া-চিংড়িরা যিশুখেস্ট কিংবা রামকেষ্ট হয়ে গিয়েছে এ মশকরাও কেউ করেনি। তবু শুনেছি সেনসর বোর্ডের বিশ্বাস,

www.pathagar.com

বিস্তর ছবি ব্যান করলে শেষটায় ভালো ছবি বেরুবে। তাই যদি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা সেনসর বোর্ড লাগাও না কেন? কাকা-মামা-শালাদের চাকরি তো হবেই এবং সুবো-শাম হুদোহুদো বই ব্যান করার ফলে একদিন ইয়া দাড়িগোঁফ সমেত আরেকটি সমুচা রবিঠাকুর বেহেশত থেকে টুকুস্ করে টস্কে পড়বেন— এই যেরকম হাওড়া ইস্টিশানের কল থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট মিন্‌স-ফর্সেপ্‌সে বেরিয়ে আসে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কার রুচি রিফর্ম করতে চায়? আমার? সাবধান! পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় মানে (ওরাই আমাকে মাঝেমধ্যে বায়স্কোপে নিয়ে যায়), শুনলে ক্ষেপে উঠবে। বোর্ডেরও প্রাণের ভয় আছে। তবে কি টাঙাওলা বিড়িওলাদের? ওহ্! কী দম্ভ! ওদের রুচিতে ভণ্ডামি নেই। ওইটে পেলে আমি বর্তে যেতুম।

কিন্তু সে কথা থাক। এই সেনসরিং ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কী প্রকারে সমাধান হয় সে সম্বন্ধে আরেকদিন সবিস্তর আলোচনা করব। ইতোমধ্যে ছোট হিটলারদের স্মরণ করিয়ে রাখি বড়া হিটলাররা জার্মানিতে 'অলকোয়ায়েট' ফিলিম ব্যান করেছিল।

সেই যুগে হঠাৎ দেখা দিলেন মহাকবি চার্লি চ্যাপলিন— ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন, এরকম একটি তাজমহলের-সামনে-দাঁড়িয়ে-নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনও উদয় হয়নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাগ্দেবী এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিক্‌টেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)। ইনি বিশ্বকর্তা। (মডার্ন টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মসিয়ো ভেরদু)। 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলেই ইনি 'সিদ্ধিতে নিপুণ' এবং লগ্ন এলে শঙ্করের মতো নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে শরৎচন্দ্র একদা বলেছিলেন, 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।' সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের হিস্পানি বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন,

> 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
> দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এই দোহাটি মনে পড়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর টলস্টয় একখানি প্রামাণিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। পুস্তকের প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন, 'হোয়াট ইজ্ আর্ট?' অর্থাৎ 'রস কী', মধুর সঙ্গীত শুনে, উত্তম কাব্য পাঠ করে, দেবীর মূর্তি দেখে আমরা যে আনন্দরসে নিমজ্জিত হই সে বস্তুটি কী?

তার সংজ্ঞা দেওয়ার পর টলস্টয় বলেন, গুটিকয়েক উন্নাসিককে যে রস আনন্দ দান করে সে রস হীন রস। আচণ্ডাল, (আ-সেনসর বোর্ড?)[১] জনসাধারণকে যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা, *মহাভারত*। পণ্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-বালক, পাপী-পুণ্যবান সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।

---

১. পাঠক ভাববেন না, আমি কলকাতা বা দিল্লির বোর্ডের কথা ভাবছি। আমি সর্ববিশ্বের জীবিত ও মৃত সর্ব বোর্ডের কথা ভাবছি। শ' যেরকম 'কুইন্‌জ্ রিডার অব প্লেজ'-এর স্মরণে আপন মন্তব্য বিশ্ব-বোর্ডের উদ্দেশে লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

অবশ্য সব পাঠক যে একই কাব্যে একই বস্তুতে আনন্দ পাবে এমনটা না-ও হতে পারে। বালক হয়তো কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ, বলদৃপ্ত যুবা হয়তো কর্ণার্জুনের যুদ্ধবর্ণনা শুনে বীর রসে লুপ্ত, বৃদ্ধ হয়তো শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আপ্লুত, এবং উদারচরিত সর্বরসে রসিকজন হয়তো প্রতি ঝঙ্কারে প্রতি মীড়ে প্রকৃত কাব্যরসে নিমজ্জিত।

তা হলে প্রশ্ন, মানুষের বর্বর রুচিকে কি মার্জিত করা যায় না? হয়তো যায়, কিংবা হয়তো যায় না, কিন্তু চেষ্টা আলবৎ করা যায়। সে চেষ্টা ভরত, দণ্ডিন, মম্মট, আরিস্ততেল, রবীন্দ্রনাথ, ক্রোচে করেছেন, কিন্তু এঁদের গলা কেটে ফেললেও এঁরা কোনও বোর্ডের মেম্বর হতে রাজি হতেন না। মানুষের রুচিপরিবর্তন এঁরাই করিয়েছেন— কোনও বোর্ড কখনওই কিছু পারেনি।

বর্তমান যুগে চার্লি সেই রসই সর্বজনকে উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে, রঙ্গমঞ্চেও কুত্রাপি কেউই চার্লির বৈচিত্র্য, বিস্তার, গভীরতা সর্বজনমর্মস্পর্শদক্ষতা দেখাতে পারেননি। এ যুগে শার্লক হোমস পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোমলতম স্পর্শকাতরতাকে তিনি তার চরম মূল্য দিতে পারেননি; ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ধর্মভীরুকে বিচলিত করতে পারেননি।

চার্লিকে বিশ্লেষণ করি কী প্রকারে?

তাঁর সৃষ্টি, কিংবা তিনি নিজে, এই যে 'লিট্‌ল্ ম্যান', সামান্য জন, যেন পাড়ার জগা, টম্, ডিক্, হ্যারি; 'কেউ-কেটা' তো নয়ই এক্কেবারে, 'কেউ-না' কী করে সক্কলকে ছাড়িয়ে এক অসাধারণ জন হয়ে সকলের হৃদয়ে এমন একটি আসন গ্রহণ করল যে আসন পূর্বে শূন্য ছিল এবং সেখানে আর কেউ কখনও আসতে পারবে না?

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি?

ভ্যাগাবন্ড চার্লি একটা শুকনো ফুল দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল। ঝাঁট-দিয়ে-ফেলে-দেওয়া ফুল— তার ফুল্ল যৌবন গেছে, সে পথপ্রান্তে অবহেলিত, পদদলিত। সামান্য যেটুকু গন্ধ এখনও তার অঙ্গে সুষুপ্ত ছিল চার্লি তাই যেন তার 'সহৃদয়' নিশ্বাস দিয়ে জাগিয়ে তুলে বুক ভরে নিচ্ছে। এ ফুল কি কখনও বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে— রবীন্দ্রনাথের কবি যেরকম আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে রাজকন্যার বরমাল্য পেল— সে তার চরম সম্মান পাবে?

এমন সময় রাস্তার দুষ্ট ছোঁড়ারা মোকা পেয়ে পিছন থেকে চার্লির ছেঁড়া পাতলুনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টে দিল টান। চচ্চড় করে ছিঁড়ে গেল পাতলুনের অনেকখানি— এই তার শেষ পাতলুন, এটাও গেল— আর বেরিয়ে এল ছেঁড়া শার্টের শেষ টুকরো।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যাগাবন্ড চার্লি ছোঁড়াদের দিকে তাকাল। তারা তখন 'শুভকর্ম' সমাধান করে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন ভ্যাগাবন্ডের চোখে কী বেদনাতুর করুণ ভাব!

ভিয়েনা, বার্লিন, প্যারিস-প্রাগে আমি বিস্তর থিয়েটার প্রচুর অপেরা দেখেছি, কাব্যে সাহিত্যে টন মণ করুণ রসের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু ভ্যাগাবন্ডের সে করুণ চাউনি এদের সবাইকে কোথায় ফেলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যায়।

www.pathagar.com

আর সেই নীরব চাউনিতে বলছে, 'কেন, ভাই, তোরা আমাকে জ্বালাস? আমি তো তোদের সমাজের উজির-নাজির হতে চাইনে। কুকুর-বেড়ালটাকে পর্যন্ত আমি পথ ছেড়ে দিয়ে কোনও গতিকে দিন গুজরান করছি। আমায় শান্তিতে ছেড়ে দে না, বাবারা!' তারপরে যেন দীর্ঘনিশ্বাস— হে ভগবান!

এখানেই কি শেষ? তা হলে চার্লি দস্তয়েফ্‌স্কির মতো শুধুমাত্র করুণ রসের রাজা হয়ে থাকতেন।

অন্ধ ফুলওয়ালি মিষ্টি হেসে চার্লিকে একটি তাজা ফুল দিতে যাচ্ছে। তাকে? চার্লিকে? অবিশ্বাস্য!

আইনস্টাইন একবার কোনও শহরের বড় স্টেশনে নেমে দেখেন বিস্তর লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে— যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে চায়। বিনয়ী আইনস্টাইন শুধু পিছনের দিকে তাকান আর ডাইনে-বাঁয়ে সরে যান। নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে কোনও ডাকসাইটে কেষ্টবিষ্টু আসছেন, সবাই এসেছে তাঁকেই বরণ করতে, আইনস্টাইন শুধু আনাড়ির মতো মধ্যিখানে বাধার সৃষ্টি করছেন।

কই? কেউ তো নেই? রাস্তা একদম ভোঁ— কলকাতার রেশনশপের গুদামের মতো। এরা এসেছে আইনস্টাইনের জন্যই।

আমাদের ভ্যাগাবন্ডটিও পিছনে তাকাল। এক্‌স্‌ট্রিমস মিট্‌। আইনস্টাইন খ্যাতির সর্বোচ্চ ধাপে, চার্লি নিম্নতম মাপে।

ফুল পেয়ে চার্লির মুখের ভাব। স্মিত হাস্যে মুখের দুই প্রান্ত দুই কানে ঠেকে গিয়েছে, শুকনো গাল দুটো ফুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো চেপে ধরেছে। চোখের কোণ থেকে রগ পর্যন্ত চামড়া কুঁচকে গিয়ে কাকের পায়ের নকশা ধরেছে, সে চোখ দুটো কিন্তু বন্ধ— আমার যেন মনে হল ভেজা-ভেজা ঠিক বলতে পারব না, কারণ আমার চোখও তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সর্বক্ষণ ভয় হচ্ছিল, এইবার না চার্লি ভ্যাক্‌ করে কেঁদে ফেলে!

কে বলে সংসারে শুধু অকারণ বেদনা, নিদারুণ লাঞ্ছনা! পকড়কে লে আও উস্কো। এলিসের রানির হুকুম, 'অফ্‌ফ্‌ফ্‌ উইদ্‌ হিজ্‌ হেড্‌।'

মানুষের কলিজায় চার্লি পুকুর খোঁড়েন কী করে? দুঃখ, সুখ, করুণ, কৃতজ্ঞতা এসব রস আমাদের কলিজার গভীরতম প্রদেশে চার্লি সঞ্চারিত করেন কোন্‌ পদ্ধতিতে?

এক ইরানি কবি বলেছেন, 'সর্ব জিনিসের হদ্দ— অর্থাৎ সীমা জানাটাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার লক্ষণ।'

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায়, তাঁর অভিনয়ে চার্লি বাড়াবাড়ি করেন না। কারণ কে না জানে, একঘেয়েমির চূড়ান্তে পৌঁছয় মানুষ যখন ভ্যাচর-ভ্যাচর করে সবকিছু বলতে চায়, সামান্যতম জিনিস বাদ দিতে চায় না!

তাই অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করবে।' ধ্বনি বলতে তাঁরা ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, সাজেস্‌টিভ্‌নেস অনেক কিছুই বুঝেছেন।

যথা :

www.pathagar.com

কুলটা রমণী পথিককে বলছে, 'হে পথিক, এই ঘরে রাত্রিকালে আমার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি শয়ন করেন, ওই ছোট ঘরে আমি একা থাকি, আমার স্বামী বিদেশে। তুমি এখন যাও।'

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ চার্লি যেটুকু অভিনয় করেন, সে তো করেনই; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই অনেকখানি অভিনয় করে নিই।

হালে চার্লি সুখবর দিয়েছেন, তিনি আবার সেই 'লিটল ম্যান,' সেই ভ্যাগাবন্ডকে পুনর্জন্ম দেবেন। তাঁর যা বলবার তিনি তারই মারফতে শোনাবেন। শুনে আমরা উল্লসিত হয়েছি। 'মঁসিয়ো ভের্দু', 'লাইম-লাইট' উৎকৃষ্ট অতুলনীয় রসসৃষ্টি কিন্তু আমরা সেই ভ্যাগাবন্ডকে বড্ড মিস্ করছি।

চার্লি ভ্যাগাবন্ডকে বর্জন করেছিলেন কেন?

হয়তো ভেবেছিলেন সব কথা ওই একইজনের মারফতে বলা চলে না। আমাদের ভ্যাগাবন্ডের পক্ষে সবাইকে তো বিষ খাইয়ে খাইয়ে— 'বিজনেস্ ইস্ বিজনেস্' বলে এলোপাতাড়ি বিধবাহনন করা যায় না— তাই ভের্দুর সৃষ্টি।

ঠিক এই কারণেই কোনান ডয়ল শার্লক হোমসকে মেরে ফেলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই গদ্য কবিতা ধরেছিলেন। এই উদাহরণটাই ভালো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে দেখলেন তাঁর কবিতায় পদে পদে মিল এসে যাচ্ছে, ছন্দ এসে যাচ্ছে। যাবেন কোথায়? পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। নাচার হয়ে মিলগুলো লাইনের শেষে না এনে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন— শাক ঢাকা দিয়ে মাংস খাওয়ার মতো।

শেষটায় বললেন, 'দুত্তোচ্ছাই! যাই ফিরে ফের মিল ছন্দে।' রবীন্দ্রনাথের গবিতা নিকৃষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের গবিতা উত্তম কবিতা, এই বাঙলা দেশে একমাত্র তিনিই সার্থক 'গবি', কিন্তু সোজা কথা— তিনি বুঝে গেলেন যে কবিতার মিল ছন্দ বজায় রেখেও তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলতে পারবেন। ফিরে গেলেন কবিতায়।

চার্লি যখন ভের্দু করছেন, তখন আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পিছনে ভ্যাগাবন্ডকে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাকে লুকোবার জন্যে— রবীন্দ্রনাথ যেরকম মিল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন গবিতায়— কিন্তু আমরা তাকে বারবার দেখতে পাচ্ছি। বারবার মনে হয়েছে, 'আহা এ জায়গায় যদি আমাদের ভ্যাগাবন্ডটি থাকত তবে সে সিচুয়েশনটা কী চমৎকারই না এক্‌স্‌প্লয়েট করতে পারত!'

চার্লিও সেটা বুঝেছেন। যে ভ্যাগাবন্ডকে এতদিন একটুখানি জিরিয়ে নিলেন, তাকে চার্লি আবার ঘরের ভিতর থেকে টেনে আমাদের চোখের সামনে তাকে দিয়ে বাউণ্ডুলেপনা করাবেন।

সুসংবাদ!!

www.pathagar.com

ফিল্মের ভাষা

থিয়েটারের কপাল মন্দ, পাঠান-মোগলের আপন দেশে ওটার রেওয়াজ নেই। তাই পাঠান রাজারা এদেশে জমে বসার পর গাইয়ে-বাজিয়েদের ডেকে পাঠালেন, পটুয়াদেরও ডাক পড়ল, নাচিয়েরাও বাদ গেল না আর এমারত বানানেওলাদের তো কথাই নেই। সংস্কৃত যদি তখন এ দেশের চালু এবং সহজ ভাষা হত তা হলে সংস্কৃত নাট্যও যে বাদশার দরবারে কদর পেত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ হিন্দি কদর পেয়েছিল এবং এ দেশে বাঙলা কদর পাওয়ার ফলে পরাগল খান, ছুটি খানের *মহাভারত* লেখা হয়েছিল।

সংস্কৃতে লেখা আমাদের নাট্য ঠিক মুসলিম আগমনের শুরুতে এদেশে কতখানি চালু ছিল বলা কঠিন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, সংস্কৃত তখন মৃত ভাষা, ওসব নাট্য তখন প্রায় উঠে গিয়েছে। আমি কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্নমত পোষণ করি।

পূর্বেই স্বীকার করেছি, পাঠান আমলে সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত নাটক তো সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা হয়। তুলনা দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করি।

শেক্সপিয়র জানতেন, তিনি রাজা-রাজড়া এবং শিক্ষিতজনদের জন্যই আপন নাটক লিখছেন। কিন্তু অন্য একটি তত্ত্বও বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁদের সংখ্যা কম, এবং বেঞ্চি গ্যালারি ভরভরাট করে নাটকটাকে জম-জমাট করে তোলে টাঙাওলা-বিড়িওয়ালার দল। কাজেই তাঁর নাটকে ওদেরই মতো চরিত্র ওদেরই ভাষায় কথা কয়, বিশেষ করে ভাঁড়টি সবসময়ই রাজা-প্রজা দু দলকেই খুশি করতে জানে।

ঠিক সেইরকম গুপ্ত যুগের কালিদাসও জানতেন যে, তাঁর যুগের 'টাঙাওলা' 'বিড়িওলা' সংস্কৃত বোঝে না, অথচ রাজা-রাজড়ারা নাটক চান সংস্কৃতে। ওদিকে তিনি শেক্সপিয়রের মতো বুঝতেন যে, জনসাধারণকে খুশি না করে কোনও নাটকই বক্স-আপিস ভরতে পারে না। গোলাপফুল খাপসুরৎ জিনিস। কিন্তু পাতা-কাঁটা ওটাকে খাড়া করে না ধরলে ওটা শুধু শূন্যে শূন্যে ঝুলতে পারে না। তাই তিনি তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণ আর রাজা ছাড়া আর সবাইকে দিয়ে কথা কওয়াতেন তখনকার দিনের চালু ভাষা প্রাকৃতে। আর শুধু কি তাই? রাজার সংস্কৃতে শোধানো প্রশ্নের উত্তর দাসী যখন প্রাকৃতে দিত তখন কালিদাস তার উত্তরের ভিতর রাজার প্রশ্নটি এমনভাবে জড়িয়ে দিতেন যে সংস্কৃত না-জাননেওলা শ্রোতাও দুই পক্ষের কথাই পরিষ্কার বুঝে যেত। দাসীর তুলনা দিয়েই যদি জিনিসটা বোঝাতে হয় তবে বলতে হবে, 'এ যেন 'বাঁদীকে ঠেঙিয়ে বিবিকে সোজা রাখা'র মতো রাজা এবং প্রজা উভয় দর্শককে সোজা রাখা।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাসের নাটক সর্বজনপ্রিয় ছিল।

তার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে জনসাধারণ কি কালিদাসের আমলের প্রাকৃত বুঝত? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো এলেম আমার পেটে নেই। তবে তার এক শ বছর পেরোবার পূর্বেই আমির খুসরৌ যে-হিন্দি ব্যবহার করেছেন সে হিন্দি অনেকটা ওই প্রাকৃতের মতোই। এবং এখানে আরও একটি কথা আছে। জনসাধারণ ততদিনে কালিদাসের নাটক দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এবং নিরক্ষর দর্শক একটা ফিলিম তিনবার দেখবার পর যে কতখানি মনে রাখতে পারে সেকথা শিক্ষিত জন জানেন না। আমার এক চাকর (বস্তুত এই গণতন্ত্রের ইনকিলাবি যুগে 'মনিব' বলাই ভালো) পাড়াতে নয়া ছবি

www.pathagar.com

এলেই একটানা সাত দিন ধরে সেই ছবি দেখতে যেত। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম, নাগাড়ে সাতদিন ধরে একই ছবি দেখে কী করে? পরে তার গুনগুনোনি থেকে বুঝলুম, ছবির চৌদ্দখানা গানই সে রপ্ত করতে চায় এবং করে ফেলেছেও। অনেক হিন্দি গানের বিস্তর কথা না বুঝতে পেরেও! অবশ্য আমার এ মন্তব্যে ভুল থাকতেও পারে। কারণ আমি এ জীবনে তিনখানা হিন্দি ছবিও দেখিনি এবং অন্য কোনও পুণ্য করিনি বলে এই পুণ্যের জোরেই স্বর্গে যাব বলে আশা রাখি। তবে বলা যায় না, সেখানে হয়তো হিন্দি ছবি দেখতে হবে! কারণ এক ইরানি কবি মহাপ্রলয়ের পরে যে শেষ বিচার হবে তারই স্মরণে অনেকটা এই ভয়ই করেন—

'শেষ-বিচারেতে খুদার সমুখে দাঁড়াব তো নিশ্চয়,
'মানুষের মুখ আবার দেখিব। এইটুকু মোর ভয়।'
'মরা ব্ রূজ-ই কিয়ামৎ গামি কি হস্ত ঈন্ অস্ত
কি রু-ই মরদুমে আলম্ দুবারা বায়দ দীদ।'[১]

যদি প্রশ্ন শোধান সে কী করে হয়?— তুমি হিন্দি ফিলিম্ বর্জন করার পুণ্যে স্বর্গে গেলে, সেখানে আবার তোমাকে ওই 'মাল'ই দেখতে হবে কেন? তবে উত্তরে নিবেদন, কামিনীকাঞ্চনসুরা বর্জন করার ফলে আপনি যখন স্বর্গে যাবেন তখন কি ইন্দ্রসভায় ওইগুলোরই ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন না?

তখন যদি আপনি এক কোণে মুখ গুমড়ো করে বসে থাকেন তবে কি সেটা খুব ভালো দেখাবে?

থাক্। কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! মূর্খকে চটালে এই তো বিপদ! আবোল-তাবোল বকে।

মোদ্দা কথা এই, পাঠান-মোগল যুগে নাট্যাভিনয় রাজানুকম্পা পেল না বলে আমরা এখন তার খেসারতি ঢালছি। এবং দ্বিতীয় কথা— নাট্যে, ফিলিমে ভাষা জিনিসটাকে অবহেলা করলে ক্ষতি হয়। এমনকি যদিও বহু গুণী বলে থাকেন, 'সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন' তবু সাইলেন্ট ফিলিম চলল না। বাঙলা ফিলিম যখন সেই সাইলেন্স্ ভাঙল তখন থেকে আজ পর্যন্ত যে ভাষা সে বলল তারই দিকে এ-প্রবন্ধের নল চালনা।

সাত শ বছর পরে ইংরেজ আমলে হল ঠিক তার উল্টো। কলাজগতে ইংরেজের প্রধান সম্পদ তার থিয়েটার। শেক্সপিয়রের মতো নাট্যকার নাকি পৃথিবীতে নেই। ইংরেজ বলল, 'চালাও থিয়েটার।' কিন্তু প্রশ্ন, কে করবে থিয়েটার?

ইতোমধ্যে বাঙালি বিলেত যেতে আরম্ভ করেছে। সেখানে একাধিক নেশার সঙ্গে সে থিয়েটারের নেশাটাও রপ্ত করে এল।

বাঙলা গদ্য এবং পদ্য তখন দুই-ই বড় কাঁচা।

আর জনসাধারণের ভাষা? তারও মা-বাপ নেই। একদিকে শেষ মোগলের ফারসি-উর্দুর শেষ রেশ, অন্যদিকে সুতোনুটি-গোবিন্দপুরের ঐতিহ্যহীন স্ল্যাঙ— দুয়ে মিলে তার যা চেহারা সেটা কিছুদিন পরে পাওয়া যায় হুতোমের নকশায়। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের অতি ভদ্র অতি মার্জিত ভাষা।

---

১. The only thing which troubles me about the Resurrection day is this, That one will have to look once again on the faces of mankind.

www.pathagar.com

এ যুগের নাটকের ভাষা তাই শব্দতত্ত্বের স্বর্গভূমি। কিন্তু নাটকে যে স্বচ্ছন্দ ভাষার প্রয়োজন তার বড়ই অভাব। সব নাট্যকারই যেন ঠিক মানানসই ভাষাটির জন্য চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।[২]

মাইকেলের পৌরাণিক নাট্যে বিদাসাগরি ভাষা; তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে কলকাতার স্ল্যাঙ; 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে গ্রামাঞ্চলের একাধিক ভাষা; এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাতে বিদ্যাসাগরি ও গ্রাম্য দুই-ই।

'নীলদর্পণ' সে যুগের বাঙলার বেদনা প্রকাশ করেই যে বিখ্যাত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগরি ভাষা ও মুসলমান চাষার ভাষা এ দুয়ের সম্মেলনও তার জন্য অনেকখানি দায়ী। অবশ্য শুধুমাত্র ভাষার বাহার যদি শুনতে চান তবে 'বুড়ো শালিকের' মতো নাটক হয় না। হিন্দু গৃহস্থ, হিন্দু চাকর, মুসলমান চাষা, চাষার বউ, হিন্দু দাসী এদের সকলের আপন আপন ভাষার সূক্ষ্মতম পার্থক্য মাইকেল যে কী কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে কোথাও নেই। নাটক হিসেবে এ বই উত্তম— সাহিত্য হিসেবে ভাষার বাজারে এ বই কোহিনূর।

অবাঙালির জন্য পারসি থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু বিস্তর বাঙালিও সেখানে যেত ও উর্দু-গুজরাটিতে মেশানো নাটক বুঝতে যে তাদের বিশেষ অসুবিধে হত না সে-তথ্য কিছু অজানা নয়। 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' জাতীয় জনপ্রিয়, বাঙলা-উর্দুতে মেশানো খিচুড়ি ঠাট্টা ব্যঙ্গের ভাষা কিছুটা হুতোম আর কিছুটা পারসি থিয়েটারের কল্যাণে।

ইতোমধ্যে ভাষাসমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায় বঙ্কিমের কল্যাণে। বঙ্কিমের ভাষানির্মাণে কোন কোন উপাদান আছে সেকথা আজ স্কুলের ছেলে পর্যন্ত জানে। ডি.এল. রায় শ্রেণি এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

এইখানে এসে আমাদের সবাইকে— বিশেষ করে রবীন্দ্র-শিষ্যদের একটু বিপদে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষা যে তার ছোটগল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন কথ্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে সেকথা আমরা সবাই জানি, এবং তার প্রভাব যে আমাদের রঙ্গমঞ্চেও পড়েছে সে-ও প্রতি মুহূর্তে কানে বাজে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর নাটকের ভাষা এত বেশি মার্জিত, এত বেশি সূক্ষ্ম যে নাট্যশালার আটপৌরে কাজ তা দিয়ে চালানো যায় না। তাই বোধহয় তাঁর নাটকের মূল্য সাহিত্য হিসেবে যত না সম্মান পেয়েছে এবং পাবে, নাট্য হিসেবে ততখানি পায়নি, পাবে কি না সন্দেহ।

* * *

গোড়ার দিকে ফিলিমের কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ সে তখন ভাষণ না করে শোভা বর্ধন করত। টকি আসার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল চিত্রচালককেই মনস্থির করতে হল টকির ভাষা ও উচ্চারণ হবে কী? এ মুশকিলের একটা অতি সহজ সমাধান আছে। শরৎবাবুর 'নিষ্কৃতি' করতে হলে তাঁর ডায়ালগের ভাষা দিলেই হল। এর আর ভাবনা কী?

---

২. শুনেছি সর্বপ্রথম নাকি এক রাশান এদেশে থিয়েটার করেন। তিনি তখন ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা কতখানি পেয়েছিলেন, তার প্রভাব পরবর্তী যুগের বাঙলা থিয়েটারে কতখানি পড়েছিল, এসব প্রশ্ন ভাষার বিচারে অবান্তর।

www.pathagar.com

মুশকিল আসান অত সহজ না। প্রথমত কোনও কোনও বর্ণনা ডায়ালগে প্রকাশ করতে হয়; তখন উপায়? সেটা তৈরি করে দেবে কে? সে কলম আছে কার? রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান নিয়ে যখন দম্ভী লেখকেরা মাঝখানে মাঝখানে 'আপন' গদ্য জুড়ে দিয়ে কিমপিয়ার (কঁপের) করেন, এবং দুই পাকা গানের মাঝখানে সেই কাঁচা বাঙলা শুনতে হয় তখন মনে হয়, না, থাক বাবা, বাড়ি যাই?

কিন্তু সেইটেই প্রধান শিরঃপীড়া নয়। আসল বেদনা অন্যখানে। বইয়ের লেখা ডায়ালগ আর সিনেমায় উচ্চারিত কথাবার্তা এক জিনিস নয়। বই বন্ধুজনের সঙ্গে পড়ে শোনানো যায়— তার পাল্লা অদ্দূর অবধি। নাট্যে, পর্দায় সেটা অত্যধিক 'সাহিত্যিক'। অবশ্য নিছক ফিলিমের জন্য লেখা রাবিশের কথা এখানে হচ্ছে না।

অন্যদিকে সিনেমার ভাষাতে যদি কোনও সাহিত্যিক মূল্যই থাকে তবে সে ইস্‌থেটিক পর্যায়ে উঠতে পারবে না। এই হল আমাদের দু-মুখো সাপ, ডিলেমা, প্যারাডক্স্— যা খুশি বলতে চান বলুন।

প্রথম যখন মানুষ পাথরের বাড়ি তৈরি করতে শিখল তখন পূর্বতর যুগের কাঠের বাড়ির অনুকরণে পাথরের বাড়ি তৈরি করত; বাঙলা দেশে ইঁট চালু হওয়ার পর প্রথমটায় সে খড়ের চাল অনুকরণ করেছে; বেতারের বয়স হয়েছে— এখনও সে নাটক করার সময় 'থিয়েডারে'র (থিয়েটারের নয়) অনুকরণ করে— ফিলিম কেন অনুকরণ করতে যাবে?

ক্রন্দসী

"শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত; সত্বর পশিল গৃহ মাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্য ভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন 'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ'।"

ওহ্ ভাষার কী জেল্লা! 'অতিশয় অসময়ে অভাজনে অযাচিত অনুগ্রহ—'

'অ'য়ে 'অ'য়ে ছয়লাপ! তা-ও ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেন্‌রেল্ অব্ পুলিসের মুখে।

গল্পটি সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ এটি কণেবর জাতক থেকে নিয়েছেন। আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে রাজ্যপালের মেয়ের আঙটি হারিয়েছে। তুমুল কাণ্ড। স্বয়ং আইজি যখন চোর ধরে গবর্নমেন্ট হৌসের দিকে যাচ্ছেন তখন মনে করুন মাতাহারি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি কি তখন 'উতলা' এবং 'রোমাঞ্চিত' হবেন না? তাঁর মুখে কি তখন খৈ ফুটবে না, চোখ দুটো পলকা নাচ নাচবে না! অবশ্য সামান্য 'অ' দিয়ে কবিত্বের প্রকাশ— রবীন্দ্রনাথ অতি মোলায়েম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুলিস এর বেশি আর কী কবিত্ব করবে? তবে

www.pathagar.com

কি না রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি লিখেছিলেন সেদিনের তুলনায় আজকের পুলিস বড্ড বেশি লেখা-পড়া করে আপন সর্বনাশ টেনে আনছে।

আমার অবস্থা হয়েছিল বজ্রসেনের। সে চোর।

আমি তখন বোম্বায়ে। আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কার। নাম জভেরি— অর্থাৎ জহুরির গুজরাটি সংস্করণ। এক বাঙালি 'ফিলিম-এস্টারে'র শাদি। তিনি তাঁর ব্যাঙ্কার জভেরিকে নেমন্তন্ন করেছেন। জভেরি ব্যাচেলর; আমার সঙ্গে চম্ করে। স্টার সেটি জানতেন। লক্ষ্ণৌয়ে প্রতিপালিত বঙ্গরমণী এটিকেট-দুরুস্ত হয়, যত না প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। বিবেচনা করি আমারও নিমন্ত্রণ ছিল— কিন্তু কসম খেতে পারব না।

রোশনাই বাদ্যি-বাজনা যা ছিল তা এমন কিছু মারাত্মক খুনিয়া ধরনের নয়। কন্যা কুরূপা হলে এসবের প্রয়োজন। ইংরেজিতে বলে লিলি ফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখাতে হয় না!— আজকের দিনের ভাষায় লিপস্টিক্-রুজ্ মাখাতে হয় না। যাঁরা আছেন এবং যাঁরা আসছেন তাঁদের এক-একজনই একধামা লিলি— না, দুইধামা।

দরিদ্র আবুহোসেন ঘুম ভাঙতে দেখে, সে সুন্দরীদের হাটে। কূজনে গুঞ্জনে গন্ধে অনুমান করল সে খলিফা হারুন-অর-রশিদের হারেমের ভিতর। সাক্ষাৎ পরীস্তান।

আর আমি? অধুনা মৃত ভাস্কর এপ্স্টাইন আমাকে 'বৃদ্ধ নিগ্রো'র মডেল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরীরা আমাকে অবহেলা করেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমিও বুঝি ফিলিম স্টার— 'স্যুটিঙে'র ('শুটিঙ্' সাদামাটা সিনেমা বাবদে অজ্ঞজনের শুদ্ধ উচ্চারণ!) ড্রেস না ছেড়েই দাওয়াতে এসেছি।

আমি ভালো করেই জানি, আপনারা সব স্টারদেরই চেনেন, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে দেখেছেন কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ। তদুপরি আরেকটি ছোট কথা আছে। তারকার তুলনা দিয়েই নিবেদন করি। অরুন্ধতী আকাশের ক্ষুদ্রতম তারকা। কিন্তু তিনি বশিষ্ঠের পাশে বসে যখন সপ্তর্ষির সাতটি তারকার একজন হয়ে দেখা দেন তখন মনে হয় ইনি না থাকলে সপ্তর্ষির সাতটি তারকাই মিথ্যা হতেন।

শাদি মজলিসে তাই ক্ষুদ্রতম তারকাটিও চিত্তহারিণী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

এলেন, মনে করুন— নামগুলো একটু উল্টেপাল্টে দিচ্ছি— শমশাদ বানু লায়লা। পরনে সাটিনের পাজামা। পায়ের এক-একটি ঘের অন্তত দু হাত। স্বচ্ছন্দে যে কোনও বঙ্গসন্তানের তিনটি পাজামা বা পাঁচটি পাতলুন হতে পারে। শমশাদ বানুর কোমরটি বঙ্গরমণীর কাঁকনের সাইজ। তাই কোমর থেকে পর্দার মতো ফোল্ডে ফোল্ডে সে পাজামা নেমে আসাতে বোঝা গেল না তিনি মাডাম পম্পাডুয়ের ফ্রক পরেছেন, না ভাওয়ালের জমিদারবাড়ির লুঙ্গি পরেছেন, না ইরানি বেদেনীদের তাম্বু-পানা ঘাঘরা পরেছেন। আসলে নাকি একে লক্ষ্ণৌঈ বড়া মুরি পাজামা বলে। তা সে যে নামই হোক, আমার মনে হল আমি যেন খাসিয়া পাহাড়ে মুশমই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে। বিজলির আলো প্রতি ফোল্ড বেয়ে যেন গলা রুপোর মতো ঝরনাধারায় পায়ের কাছে নেমে এসে শততরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে শমশাদ বানু লায়লা যেন আস্বচ্ছ দুগ্ধকুণ্ডে কটিতটটি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এর সঙ্গে সে-যুগে লম্বা কুর্তা পরা হত। ইনি পরেছেন কঞ্চুলিকা বা চোলি। আমি মাত্র একবার সেদিকে তাকিয়েছিলুম।

www.pathagar.com

মোগল বাদশা মারা গেলে যে ছেলে রাজা হত সে অন্যদের চোখ চোখেরই সুরমা পরার শলা দিয়ে কানা করিয়ে দিত। আমার দুটি চোখই যেন কানা হয়ে গেল। ওরকম কিংখাব আমি দেশ-বিদেশের কোনও জাদুঘরেও দেখিনি। সোনা-রুপোর জরি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে যে কিংখাবের একটি টানাপড়েনের রেশমি সুতোও দেখা যাচ্ছে না।

ঘাঘরাটি ছিল যেন শীতল ঝরনা; এ যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকুণ্ড।

চোলির হেথাহোথা দু একটি মুক্তো গাঁথা। যেমন বহ্নি নির্বাপিত করার জন্য ক্ষুদ্র হিমিকার নিষ্ফল প্রয়াস।

দু কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ ওড়না।

সেই ছেলেবেলায় দাদিমাকে বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ শাড়ি পরতে দেখেছি। আর আজ তার-ই ওড়না। অতি সূক্ষ্ম মসলিনের এখানে-ওখানে দুটি দুটি করে বুলবুলের চোখের (চশ্‌ম্‌) মতো ফুটো করে সে দুটি অতি ফাইন মুগা সিল্ক দিয়ে বোতামের ফুটোর মতো কাজ করা হয়। এ রমণীর রুচি আছে। ক্ল্যাসিক্‌স্‌ পড়ে। বুল্‌বুল্‌-চশ্‌ম্‌ কালিদাসের যুগের, তার মূল্য ইনি জানেন।

আশ্চর্য! এলো খোঁপা! গান্‌মেটল রঙের কৃষ্ণনীল চুলের খোঁপাটি কাঁধে শুয়ে আছে যেন কৃষ্ণকরবীর স্তবক শুভ্র ফুলদানিতে ঘুমিয়ে আছে।

* * *

হঠাৎ দেখি এক চোখ-ঝলসানো সুন্দরী, বিধবার থান পরে! ইনি বিয়ের পরবে কেন? আমাদের দেশে তো কড়া বারণ। তখন আবার দেখি তাঁর হাতে ফেনা-ভর্তি শ্যাম্পেনের গেলাস। নাহ্‌, ইনি সদ্য স্টুডিয়ো থেকে শুটিঙ অর্ধসমাপ্ত রেখে এসেছেন।

আরও অনেকেই ছিলেন। বেবাক বর্ণনা দিতে হলে তামাম পুজো সংখ্যাটা আমাকেই লিখতে হয়। খর্চায় পুষাবে না— সম্পাদক জানেন।

ইতোমধ্যে কৃষ্ণলাল জভেরি এসে আমাকে নিয়ে চললেন সেই তারকা যজ্ঞশালার প্রান্তদেশে অনাদৃতা উর্মিলার অবস্থা থেকে টেনেহিঁচড়ে অন্য প্রান্তে। কী ব্যাপার? জভেরি উত্তেজনার মধ্যিখানে ইংরেজি ভুলে গিয়ে গুজরাটিতে কী যেন 'সুঁ সুঁ' করলে। কে যেন আমাকে ইন্টারভ্যু দেবে। আমি বেকার। বিধি তবে দক্ষিণ। অদ্য প্রভাতের সবিতা প্রসন্নোদয় হয়েছেন। আম্মো ইস্টার হব।

শমশাদ বানু লায়লা মৃদু হাস্য করলেন। ফিল্‌ম্‌-স্টারের ধবধবে সাদা দাঁত নয়। গোলাপির চেয়েও গোলাপি রঙের অতি ক্ষীণ একটি ফিল্‌ম্‌-স্টারের দাঁতের উপর। কী সুন্দর! তাই বুঝি কালিদাস তাঁর নায়িকার দাঁতের সঙ্গে রাঙা অশোকের তুলনা দিয়েছেন— শুভ্র বন-মল্লিকার সঙ্গে দেননি। আগেই বলেছি, ইনি ক্ল্যাসিক্‌স্‌। পানের রস গ্রহণ করতে জানেন। অন্য পান কিন্তু জানেন না। হাতে লেমন-স্কোয়াশ।

শুধালেন, 'আপনি দার্শনিক?'

আমি জভেরিকে ধমক দিয়ে বললুম, 'জভেরি!'

জভেরি ভীরু। বলল, 'আমি কিচ্ছু বলিনি।'

আমি বিবি সাহেবাকে চালাকি করে শুধালুম, 'আমাকে কি এতই বিজ্ঞ মনে হয়?'

'বুদ্দু মনে হয়। বিজ্ঞ মনে হয় ফিল্‌মস্টারকে, ব্যাঙ্কারকে, পোকার খেলাড়িকে।'

www.pathagar.com

বাধ্য হয়ে বললুম, 'না। আমি দার্শনিক নই। আমি দর্শনের শত্রু, ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করি।'

শমশাদ বানুর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটল।

এতদিনে আমার নীরস শাস্ত্রচর্চা ধন্য হল।

বললেন, 'সে তো আরও ভালো। আমি তাই খুঁজছিলাম। আচ্ছা বলুন তো—' বলে তিনি যেই একটু থেমেছেন, আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'বিবি সাহেবা, এই জায়গা কি ধর্ম-চর্চার পক্ষে প্রশস্ত?'

অবহেলার সঙ্গে বললেন, 'নয় কেন? পাপীরাই তো ধর্মচর্চা করবে। ধার্মিকদের তো ওসব হয়ে গিয়েছে। তেলো মাথায় ব্রিলেন্টাইন? সেকথা থাক্। আমি শুধোতে চাই, কেউ যদি মরে যায় (আমার মনে হল শমশাদ কেমন যেন একটু শিউরে উঠলেন) তবে আমি মরে গেলে তাঁকে দেখতে পাব কি?'

আমি শুধালুম, 'কোন্ ধর্মমতে?'

'সে আবার কী?'

'আমি "তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্র" চর্চা করি।'

'তার মানে?'

'এই মানে ধরুন পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান মেলা ধর্ম আছে। আমি প্রত্যেক ধর্মের জন্ম, যৌবন, বর্তমান অবস্থা,— কে কী বলে তাই পড়ি। যেমন প্রত্যেক দেশের ইতিহাস হয়, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেরও ইতিহাস হয়।'

একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আমি অতশত বুঝি না। আমি ফিল্মে কাজ করি, আমি পণ্ডিত নই। আমি জানতে চাই, এতসব ধর্ম পড়ার পর এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত, পার্সনাল মতটা কী?'

মহা ফাঁপরে পড়লুম। বললুম, 'আমি কখনও ভেবে দেখিনি। মুসলমান ধর্ম বলে—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক্। আপনি তা হলে একটি আস্ত চিনির বলদ। ধর্ম বয়ে বেড়াচ্ছেন— কখনও কাজে লাগাননি।'

আমি বললুম, 'ধর্ম কি মসলা বাটার জিনিস! নামাজের কার্পেট দিয়ে কি মানুষ বিছানা বাঁধে?'

অতি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'না। কিন্তু নামাজের কার্পেটে মানুষ নামাজ পড়ে; ওটা শিকেয় তুলে রাখে না।'

আমি বললুম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ফিল্ম্-স্টারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। আপনি নিশ্চয়ই বিস্তর লেখাপড়া করেছেন।'

'কী আশ্চর্য! এ তো কমন্-সেন্সের কথা। এটা না থাকলে প্রডুসার, ডিরেক্টর, এডমায়ারার, লাভারের দল আমাকে কুটিকুটি করে ফেলত না! ওসব কথা থাক্। আপনি আমার কথার উত্তর বেশ চিন্তা করে দিন।'

তার পর জভেরির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে জভেরি, ওঁকে একটা শ্যাম্পেন দাও না?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'থাক্। আপনার পাল্লায় পড়ে আমার বিশ বছরের নেশা কপ্পুর হয়ে গেছে। আড়াই ফোঁটাতে আর কী হবে, লায়লীবানু!'

একটু হেসে বললেন, 'আপনার মুখে "লায়লী" বেশ মিষ্টি শোনায়।'

www.pathagar.com

সব্‌বোনাশ! সব্‌বোনাশ!! এ যে ডবল এটাক! পিনসার মুভমেন্ট!

ওড়নাটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ারে যেভাবে চেপে বসলেন তাতে বুঝলুম যে এঁর গায়ে কাবুলি রক্ত আছে। উত্তর না নিয়ে উঠবেন না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটি বন্ধ— বড় শান্ত প্রশান্ত নিস্তব্ধ ভাব। ওই বেশ পরা না থাকলে মনে হতো তপস্বিনী, কঠোর ব্রতচারিণী সুফি রমণী।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার মনে হয়—,' থামলুম। কোনও উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পর ফের বললুম, 'আমার মনে হয়—'

অল্প একটু 'উঁ' শুনতে পেলুম।

'— যে পুণ্যবান লোকের কোনও কামনা আল্লাতালা অপূর্ণ রাখেন না।'

* * *

আমি জানি, চতুর্দিকে তখন হই-হুল্লোড়। কিন্তু আমার মনে হল যেন আমি মরুভূমির মাঝখানে দুপুররাত্রে জেগে উঠেছি। দিবাভাগের আতপতাপে দগ্ধ সর্ব কাফেলার মানুষ উট গাধা ঘোড়া সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আকাশের নৈস্তব্ধ্যকেও যেন মরুভূমির নৈঃশব্দ্য হার মানিয়েছে। কোথা থেকে এল এ শান্তি, এ বিধান? তাকিয়ে দেখি, লায়লার মুখ থেকে।

ততক্ষণে জভেরি শ্যাম্পেন নিয়ে ফিরেছে।

লায়লা উঠে বললেন, 'আপনার কথা ঠিক।'

তার পর জভেরিকে রাজেশ্বরীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি থাকো। আমি এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

গাড়িতে একটি কথাও হয়নি।

আমি নামবার সময় তাঁকে 'আদাব আরজ, খুদা হাফিজ' বললুম। তিনি সযত্নে আমার ডান হাত আপন দু হাতে ধরে মৃদু চাপ দিলেন। সে চাপে ছিল বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা। ফিল্‌ম্-স্টারের হাতের চাপ আমি এর আগে, এখন এবং এর পরেও কখনও পাইনি।

মধ্যরাত্রি অবধি খাটে শুয়ে শান্তি অনুভব করেছিলুম।

রাত তিনটেয়, বোধহয়, একবার ধড়মড় করে জেগে উঠে ফের শুয়ে পড়েছিলুম।

* * *

সকালে উঠে দেখি, জভেরি ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছে।

তার পর দেখি, পূর্বরাত্রির প্রসন্নতা মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

কী যেন এক অজানা অস্বস্তির ভাব সর্বদেহমন অসাড় বিকল করে দিয়েছে।

ফোন বাজল। জভেরি চিৎকার করে কী বলছে।

'শোনো, কাল রাত তিনটেয় শমশাদ আত্মহত্যা করেছে। দুটো চিঠি রেখে গিয়েছে। একটা পুলিশকে, একটা তোমাকে। তোমার চিঠিটার নকল যোগাড় করেছি। লিখেছে, 'মাই ডিয়ার এম, তোমার কথাই ঠিক। আমি চললুম। দেখা যখন তাঁর সঙ্গে হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কী? আমি জানি আত্মহত্যা পাপ। আমার পুণ্যের বদলে এটা মাফ হয়ে যাবে।'

এখন মনে পড়ছে সন্ধ্যার সময় জভেরি বাড়ি এসে আমার হাত থেকে ফোন নামিয়েছিল।

এ-জীবনে এই প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলুম। আর এই শেষ ॥

www.pathagar.com

ছুছুন্দর কা সির্‌পর চামেলি কা তেল

লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ডের কথা অনেকেই শুনেছেন। এ রেকর্ডগুলোর সাহায্যে দেশি-বিদেশি যেকোনো ভাষা অতি চমৎকার রূপে শেখা যায়। রেকর্ডগুলোতে বড় বড় ভাষা এবং উচ্চারণবিদরা গোড়ার দিকে খুব সহজ ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে শেষের রেকর্ডগুলোতে এমনি বেগে বলেছেন যে, সেটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনি সে ভাষায় নিজেকে ওকিবহাল বলে পরিচয় দিতে পারবেন। প্রথম একখানা রেকর্ড নিয়ে বারবার সেটা শুনতে হয়। তার পর প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে, সামনে পাঠ্যপুস্তকের দিকে চোখ রেখে উচ্চারণ করে যেতে হয়। পাঠ্যপুস্তকে আবার 'অনুশীলন'ও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও করতে হয়। 'কি' দেওয়া আছে। তাই দিয়ে ভুলগুলো মেরামত করে নিতে হয়।

বুদ্ধি-শুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। শুধু গাধার খাটুনি আর সহিষ্ণুতা বা নিষ্ঠা কিংবা বলতে পারেন লেগে থাকার প্রয়োজন।

আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সুদৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিস শেখার জন্য আক্কেল-বুদ্ধি প্রয়োজন অতি সামান্য। আসলে প্রয়োজন গাধার খাটুনি। বাঙলায় বা অন্য যেকোনো ভাষাতে শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? 'পদ্ম' শব্দের প্রতিশব্দ 'কমল' 'সরোজ' 'পঙ্কজ' শিখতে হলে কাউকে মাইকেলের মতো মেধাবী হতে হয় না, প্রয়োজন হয় ওই কর্মে রোজ লেগে থাকা। কারও মুখস্থ হয় একদিনে, কারও লাগে তিনদিন— তফাৎ ওইটুকু মাত্র। স্বয়ং মাইকেলই নাকি বলেছেন, জিনিয়াসের ৯৯% পার্স্‌পরেশন, অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, আর মাত্র এক পার্সেন্ট ইন্‌সপিরেশন অর্থাৎ বিধিদত্ত প্রতিভা।

শুধুমাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাইকেলের মতো কাব্য রচনা করা যায় না। কিন্তু নিছক খাটুনির জোরে যেকোনো ভাষার অন্তত এতখানি আয়ত্ত করা যায় যে, দেশের ৯৯% লোক তাকে ওই ভাষায় পণ্ডিত বলে মেনে নেয়।

এবং এই সোনার বাঙলার ৯৯% লোক খাটতে রাজি নয়। রেওয়াজ না করেই সে গাওয়াইয়া হয়ে যায়, নিত্য নবীন নাচ 'কম্পোজ' করতে থাকে।

কিন্তু সেকথা থাক। পরনিন্দা বা আপন নিন্দা— আমিও তো বাঙালি বটি— করে আমি পুজোর বাজারে রসভঙ্গ করতে চাইনে। তাই মূল কথা আরম্ভ করি।

এই লিঙ্গোয়াফোন রেকর্ড পত্তনের প্রথম যুগে বার্নার্ড শ' চারটি বক্তৃতা দেন। সেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। অতি সুস্পষ্ট উচ্চারণের সুমধুর ভাষণ। ব্যঙ্গকৌতুক, রসসৃষ্টি, আর তথ্য-পরিবেশ তো আছেই।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

'... হয়তো তুমি চালাক ছেলে। আমাকে শুধালে, তা হলে কি আমি সবসময় একই ধরনে কথা বলি?'

'আমি সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি করিনে। কেউই করে না। এই তো এই মুহূর্তে আমি হাজার হাজার গ্রামোফোনওয়ালাদের সামনে কথা বলছি, এদের অনেকেই

www.pathagar.com

আমার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি কথা প্রাণপণ বোঝবার চেষ্টা করছে। বাড়িতে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যেরকম বেখেয়ালে কথা কই, এখন যদি তোমাদের সঙ্গে সেরকম ধারা কথা কইতে যাই, তা হলে এ রেকর্ডখানা কারও এক কড়ির কাজে লাগবে না; আর এখন তোমাদের সঙ্গে যেরকম সাবধানে কথা বলছি, সেরকম যদি স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে বলি তা হলে তিনি ভাববেন আমার বদ্ধ পাগল হতে আর বেশি বিলম্ব নেই।

'জনসাধারণের সামনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয় বলে আমাকে সাবধান থাকতে হয় যে, বিরাট হলের হাজার হাজার লোকের শেষ সারির শ্রোতাও যেন আমার প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়। কিন্তু বাড়িতে ব্রেকফাস্টের সময় আমার স্ত্রী আমার থেকে মাত্র দু ফুট খানেক দূরে বসে আছেন। তাই বেখেয়ালে এমনভাবে কথা বলি যে, তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রায়ই বলেন, "ওরকম বিড়বিড় কর না; আর দেখ, কথা বলার সময় অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ো না। তুমি যে কী বলছ আমি তার কিছু শুনতে পাচ্ছিনে।" এবং তিনি যে সবসময় সাবধানে কথা বলেন তা-ও নয়। আমাকেও মাঝে মাঝে বলতে হয়, 'কী বললে?'[১] আর তিনি সন্দেহ করেন যে, আমি ক্রমেই কালা হয়ে যাচ্ছি, অবশ্য তিনি সেটা আমাকে বলেন না। আমি সত্তর পেরিয়ে গিয়েছি— কথাটা হয়তো সত্যি।

'কিন্তু এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, রাজরানির সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই এবং তাঁরও বলা উচিত যেন তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন। তাই উচিত; কিন্তু আমরা তা করিনে।

'আমাদের আদব-কায়দা দু রকমের— একটা পোশাকি, অন্যটা ঘরোয়া। কোনও অপরিচিতের বাড়িতে গিয়ে যদি দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনো— অবশ্য আমি আদপেই বলতে চাইনে যে এরকম অভদ্র আচরণ তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভব— কিন্তু তবু, ভাষা শেখার অত্যধিক উৎসাহে তুমি যদি কয়েক মুহূর্তের তরে এরকম অপকর্ম করে শোনো, পরিবারের লোক বাইরে কেউ না থাকলে আপসে কী ধরনে কথা বলে এবং পরে যদি ঘরে ঢুকে ওদের কথা শোনো, তা হলে তোমার সামনে ওদের কথা বলার ধরন দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যাবে। এমনকি, আমাদের ঘরোয়া কায়দা-কেতা পোশাকি কায়দার মতো উত্তম হলেও— আসলে আরও ভালো হওয়া উচিত— তাদের মধ্যে সবসময়ই পার্থক্য থাকে এবং সে পার্থক্য অন্যসব কায়দাকেতার চেয়ে কথাবার্তাতেই বেশি।

'মনে কর ঘড়িটাতে দম দিতে ভুলে গিয়েছি; ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে! কাউকে তা হলে জিগ্যেস করতে হয়, কটা বেজেছে? অপরিচিত কাউকে জিগ্যেস করলে বলব, 'কটা বেজেছে, বলতে পারেন?' সে তখন প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু যদি স্ত্রীকে ওই কথাই শুধাই তবে তিনি সর্বসাকুল্যে শুনতে পান 'ক'টা বেচ্চে?' তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু তোমাকে জিগ্যেস করলে ওরকম বললে চলবে না। তাই এখন তোমাদের সামনে কথা বলছি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশি সাবধানে! কিন্তু লক্ষ্মীটি, ওঁকে সেটি বল না।'

* * *

১. এখানে শ' ইচ্ছে করেই 'আই বেগ ইয়োর পার্ডন' কিংবা 'এক্সকিউজ মি' বলেননি। ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাড়িতে স্ত্রীকে আমরা পোশাকি আদবকায়দা দেখাইনে।

www.pathagar.com

শ' কথাগুলো বলেছেন, প্রধানত উচ্চারণ সম্বন্ধে। কারণ, তিনি রেকর্ডের মারফতে বিদেশিকে ভালো ইংরেজি উচ্চারণ শেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি যে 'আমরা সর্বত্রই একই উচ্চারণে কথা বলিনে', ভাষা সম্বন্ধে আরও বেশি প্রযোজ্য। শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ ইত্যাদি আমরা সকলের সামনে একইভাবে বাছাই করে প্রয়োগ করিনে।

শ্বশুরমশায়ের সামনে ঘাড় নিচু করে, হাত-পা দিয়ে বায়ু সমুদ্র মন্থন করা কিছুক্ষণের মতো স্থগিত রেখে বলি,

'আজ্ঞে, রামবাবু বললেন, ওই ব্যাপার নিয়ে আমি যেন দুশ্চিন্তা না করি।'

পিতাকে বলি, 'রামবাবু বলল, 'যাও ও-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

রকের ইয়ারকে বলি, 'শ্লা রেমোটা কী বলল জানিস? বলল, "যা যা ছোঁড়া, মেলা ডোঁপোমি কত্তি হবে না; আপনার চরকায় তেল দে গে যা।"

শ' সর্বোচ্চ উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। সেটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে তাঁর স্ত্রীকে সমঝে চলতেন, এমনকি ডরাতেনও, সেকথা কারও অজানা নেই। আর ডরায় না কে? 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে দেখুন— বিষ্ণুশর্মার লেখাটা নয়, অন্য একজনের। লাইব্রেরি থেকে ধার করে নয়, কিনে। লোকটা অন্নাভাবে আছে।

তাই প্রশ্ন উঠবে, উপরের যে রিপোর্টটি পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে, সেটি যদি বউয়ের কাছে নিবেদন করি, তবে সেটা কী রূপ নেবে?

সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, বউ কী শুনতে চান। তিনি যদি শুনতে চান, 'রামবাবু ওই কাজের ভারটা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, আপনাকে তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তা হলে তো আপনি নিস্পরোয়া হয়ে গিয়ে তেরিয়া মেরে চড়াকসে বলবেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ গিন্নি, যা কয়েছ।" আমি যতই বলি, "রামবাবু, আপনাকে কিচ্ছুটি চিন্তা করতে হবে না। আমি সব বোঝা কাঁধে নিচ্ছি", তিনি ততই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "না ভায়া, ও কাজ আমার— তোমাকে দেখতে হবে না।" কী আর করি? ওঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে এলুম।'

আর যদি গিন্নি উল্টোটা আশা করে থাকেন? অর্থাৎ আপনি যদি মিশনে ফেল মেরে এসে থাকেন? তা হলে? তা হলে ঈশ্বর রক্ষতু।

গলা সাফ করে ইদিক-উদিক তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, '—'

আবার বলছি তখন ঈশ্বর রক্ষতু। আমি আর কী বলব। চল্লিশ বছর হল বিয়ে করেছি। এখনও সে ভাষা শিখতে পারিনি।

মূল কথায় ফিরে যাই।

এ তো হল কথাবার্তায়। সাহিত্যে এ জিনিসটি আরও প্রকট।

সেখানে কাকে উদ্দেশ করে লিখছেন সেটা তো আছেই, তার ওপর আছে বিষয়বস্তু।

কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন *মহাভারতের* অনুবাদ করেছেন তখন ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা, কারণ বিষয়বস্তু এপিক, গুরুগম্ভীর। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তিনি ব্যবহার করেছেন 'রকে'র ভাষা। কারণ সেখানে বিষয়বস্তু 'বেলেল্লাপনা', অতএব চটুল এবং সেই কারণেই 'মেঘনাদবধে'র ভাষা এক, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভাষা অন্য। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভাষা এক, 'কমলাকান্তে'র ভাষা অন্য।

www.pathagar.com

এমনকি ধরুন, বিষয়বস্তুও এক, কিন্তু সেখানে পরিবেশ এবং পাত্র ভিন্ন বলে ভাষাও ভিন্ন হল। 'পারস্য ভ্রমণে' রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন ওই দেশের অভিজাত সম্প্রদায়, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে— তাই তার ভাষা এক এবং 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র পাত্রপাত্রী অতি সাধারণ জন— এমনকি রিফ্‌র‍্যাফ্‌— তাই তার ভাষা অন্য; 'মরুতীর্থ' 'পারস্যে'র চেয়ে ভালো না মন্দ সেকথা উঠছে না। দুটোই রসসৃষ্টি, কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস।

অর্থাৎ বিষয়বস্তু— কন্‌টেন্‌ট্‌— তার শৈলী এবং ভাষা— স্টাইল— নির্বাচন করে। সেখানে উল্টোপাল্টা করলে রসসৃষ্টি হয় না।

'বঙ্কিমের ভাষার অনুকরণ করবে'— ছেলেবেলা থেকেই সে উপদেশ শুনেছি এবং ধরে নিয়েছি সে ভাষা 'রাজসিংহ', 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা।

ওই ভাষা দিয়ে পাড়ার কানাই-বলাইয়ের কাহিনী লিখতে গেলে ফর্ম ও কন্টেন্টের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার ফলে বারেবারে তাল কাটে। শরৎ চাটুজ্জের প্রথম যৌবনের লেখাতে তার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তাঁর আপন ভাষা পেয়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাল রেখে অদ্ভুত তবলা শোনালেন।

এমনকি 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'র ভাষা দিয়ে 'কচিসংসদ' লেখা যায় না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের অনুকরণ (ইমিটেশন) সহজেই হনুকরণ (এপিং) হয়ে যেতে পারে।

আর্ট না অ্যাকসিডেন্ট

আর্ট বলতে আমরা আজকাল মোটামুটি রস-ই বুঝি। তা সে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে সঙ্গীতে যে কোনও কলার মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন আর্ট বা রসের সংজ্ঞা কী? সে জিনিস কী? তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনব কী করে? অন্যান্য রস থেকে তাকে আলাদা করব কী করে? সরেস আর্ট কোনটা আর নিরসই-বা কোনটা?

প্রাচীন ভারত, গ্রিস এবং চীন— এই তিন দেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং অধুনা পৃথিবীর বিদগ্ধ দেশ মাত্রেই এ নিয়ে কলহ-বিসংবাদের অন্ত নেই। বিশেষ করে যবে থেকে 'মডার্ন আর্ট' নামক বস্তুটি এমন সব 'রস' পরিবেশন করতে আরম্ভ করল যার সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। এলোপাতাড়ি রঙের পোঁচকে বলা হল ছবি, অর্থহীন কতকগুলো দুর্বোধ শব্দ একজোট করে বলা হল কবিতা, বেসুরো বেতালা কতকগুলো বিদঘুটে ধ্বনির অসমন্বয় করে বলা হল সঙ্গীত। বলছে যখন তখন হতে পারে, কিন্তু না পেলাম রস, না বুঝলাম অর্থ, না দিয়ে গেল মনে অন্য কোনও রসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। তাই বোধহয় হালের এক আলঙ্কারিক মডার্ন ভাস্কর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভাস্কর এক বিরাট কাঠের গুঁড়ি নিয়ে তার উপর ছ মাস ধরে প্রাণপণ বাটালি চালানোর পর সেটাকে কাঠের গুঁড়ির আকার দিতে পারেন, এবং নিচে লিখে দেন 'কাঠের গুঁড়ি'— তখন সেটা 'মডার্ন ভাস্কর্য'।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে এই মডার্ন আর্টের বাজারে একটি নতুন জীব ঢুকেছেন এবং সেখানে হুলস্থুল বাঁধিয়ে তুলেছেন— এর নাম অ্যাকসিডেন্ট, বাঙলায় দুর্ঘটনা, দৈবযোগ, আকস্মিকতা যা খুশি বলতে পারেন।

এঁর আবির্ভাব হয়েছে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশে— যেখানে মানুষ ঠাণ্ডাভাবে ধীরেসুস্থে কথা কয়, চট করে যা-তা নিয়ে খামখা মেতে ওঠে না।

* * *

সুইডেনের মহাসম্মানিত ললিত-কলা আকাদেমির বিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রফেসর, কলারসিক গুণীজ্ঞানীরা অকস্মাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কর্ণমূলের পশ্চাদ্দেশ কণ্ডুয়ন করতে লাগলেন। তাঁদের মহামান্যবর প্রেসিডেন্ট তো খুদাতালার হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি বলেই ফেললেন, 'কী করি, মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এরকমধারা হবে? আজকাল নিত্যি নিত্যি এতসব নয়া নয়া এক্‌স্‌পেরিমেন্ট হচ্ছে যে, কোনটা যে এক্‌সপেরিমেন্ট আর কোনটা যে অ্যাকসিডেন্ট কী করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি, চিত্রকর ফালস্ট্রোম আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাই ভেবে ওই ছবিটাও একজিবিশনের অন্যান্য ছবির পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

ওদিকে আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্যোম্‌ রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সর্বত্র চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, তাঁকে লোকচক্ষে হীন করার মানসে দুষ্ট লোক কুমতলব নিয়ে এই অপকর্মটি করেছে।

অপকর্মটি কী?

ফাল্‌স্ট্রোম্‌ ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেকরকম রঙ লেগে থাকার কথা। ওই সময়ে সুইডিশ ললিত-কলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী এক্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেন— 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (স্পন্টানিস্‌মুস বা Spontaneous art) ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সে চিত্র-প্রদর্শনীতে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পন্টানিস্‌মুস কলার উত্তম নিদর্শন তাতে থাকবে। (ক্যুবিজম, দাদাইজমের মতো স্পন্টানিয়েজম-ও এক নবীন কলাসৃষ্টি পদ্ধতি— আমি অবশ্য এখানে সে প্রশ্ন তুলছিনে যে সার্থক কলাসৃষ্টি মাত্রই স্পন্টানিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে— বিশেষ পদ্ধতিতে এ নাম দিলে তাকে চেনবার কী যে সুবিধে হয় বোঝা কঠিন।)

এখন হয়েছে কী, আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্রোম্‌ তাঁর অন্য ছবি যাতে করে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে রঙবেরঙের ম্যাসনাইটের টুকরোখানা তাঁর ছবির উপরে রেখে চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আকাদেমির বড় কর্তারা ভাবলেন, এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন মহান কলানিদর্শন এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই ম্যাসনাইটের টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামখ্যাত নামটি লিখে ঝুলিয়ে দিলেন আর্টিস্টের অন্য ছবির পাশে!

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন আর্ট সমালোচকরা কী যে করবেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে গেলেন আর সুইডেনবাসী আপনার-আমার মতো সাধারণজন মুখ টিপে হাসল যে বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা ওই 'স্বতঃস্ফূর্ত' রসিকতাটা ধরতে না পেরে ফাঁদে পা ফেলেছেন বলে।

কিন্তু এইখানে ব্যাপারটার গোড়াপত্তন মাত্র।

www.pathagar.com

সুইডেনের কাগজে কাগজে তখন আলোচনা আরম্ভ হল এই নিয়ে : একখানা উটকো কাঠ জাতীয় জিনিসের উপর এলোপাতাড়ি রঙের ছোপকে যদি পণ্ডিতেরা আর্ট বলে মেনে নিতে পারেন তবে তাঁদের ঢাক-ঢোল-পেটানো এই মহাসাধনার 'মডার্ন' আর্টে'র মূল্যটা কী?

* * *

ওইভিন্দ ফাল্‌স্ট্রোম্, সুইডেনের নামকরা তরুণ চিত্রকর। তিনি সম্প্রতি এই 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা-মার্গে' প্রবেশ করেছেন এবং কলা নির্মাণের ক্রমবিকাশে তিনি ইতোমধ্যেই তাঁর ঢং একাধিকবার আগাপাশতলা বদলিয়েছেন। সুইডেনে এখন এই 'কনক্রিট', 'স্থূল' বা 'বাস্তব' মার্গের খুবই নামডাক; এঁরা নিজেদের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত অনব্যবহিতভাবে রঙের মারফতে প্রকাশ করেন— সে প্রকাশে কোনও বস্তু বা কোনওকিছুর প্রতিকৃতি থাকে না, কোনওকিছু রূপায়িত করে না, ছবির নাম পর্যন্ত থাকে না— এবং দর্শক তাই দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সরাসরি আর্টিস্টের অনুভূতি বুঝে গিয়ে তার অর্থ করে নেয়— কিংবা ওই আশা করা হয়।

এই হল মোটামুটি তার অর্থ— অর্থাৎ অর্থহীন জিনিসকে যদি অর্থ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে যে 'অর্থ' দাঁড়ায়।

ফাল্‌স্ট্রোম্ চিত্রপ্রদর্শনীতে দু খানি ছবি পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং পূর্বেই বলেছি, সে দু খানি ছবি যাতে করে পোস্টাপিসের চোট না খায় তাই সঙ্গে সেই ম্যাসনাইটের টুকরো দিয়ে সেগুলোকে প্যাক্ করে তিনি চলে যান গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। এদিকে আকাদেমির বাঘ-সিঙ্গিরা ছবি তিনখানা (আসলে অবশ্য দু খানা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বাছাই করে নিলেন দু খানা— এবং তার মধ্যে মনোনীত হয়ে গেল তুলি পোঁছার সেই ম্যাসনাইটের পট্টি! ক্রিটিকদের কারওরই কাছে ওই ম্যানসাইটের 'অঙ্কিত' তুলিপোঁছা রঙ-বেরঙ করা জিনিসটির স্টাইল বা বিষয়বস্তু অদ্ভুত বা মূল্যহীন ঠেকেনি। তার অর্থ একদিকে চিত্রকরের 'ন্যায়ত' 'ধর্মসঙ্গত' আঁকা ছবি ও অন্যদিকে তাঁর তুলি পোঁছার এলোপাতাড়ি রঙের ছোপ— এ দুয়ে কোনও পার্থক্য নেই।

তাই লেগেছে হুলস্থুল তর্কবিতর্ক, 'সে আর্ট তবে কী আর্ট যেখানে "ভুল" জিনিস অক্লেশে খাঁটি আর্ট বলে পাচার হয়ে যায়?'

এটা ধরা পড়ল কী করে? ফাল্‌স্ট্রোম, ছুটি থেকে ফিরে একদিন স্বয়ং গিয়েছেন চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সেখানে ওই 'ম্যাসনাইট ছবি'র কাণ্ড দেখে যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কোথায় না তিনি বিচক্ষণ জনের মতো চুপ করে থাকবেন— তিনি উল্টো আরম্ভ করলেন তুলকালাম কাণ্ড!

ফলে জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিতমণ্ডলী, তীক্ষ্ণচক্ষু কলাসমালোচকদের দল, ঝানু ঝানু আর্টসংগ্রহকারীগণ, সরলচিত্ত সাধারণ দর্শক এবং সর্বশেষে নিজেকে আর তামাম ওই 'স্বতঃস্ফূর্ত-কলা-পন্থী'কে বিশ্বজনের সম্মুখে তিনি হাস্যাস্পদ করে ছাড়লেন।

এর কয়েক বছর পূর্বে এক বিদগ্ধ বিদূষক চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জির 'আঁকা' একখানি 'ছবি' ওইরকম এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়ে শহরের লোককে বোকা বানিয়েছিল— তখনও কেউ ধরতে পারেননি, ওটা বাঁদরের মশকরা।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ধরনের তামাশা চলবে কতদিন ধরে? এই যে স্পন্টানিস্টের দল, কিংবা অন্য যে কোনও নামই এদের হোক— এরা আর কতদিন ধরে আপন ব্যবহার দিয়ে ইচ্ছায়

www.pathagar.com

প্রকাশ করবেন যে এদের আর্ট কোনওকিছু সৃজন করার দুরূহ শক্তিসাধনায় আয়ত্ত নয়, আকস্মিক দৈবদুর্বিপাকে বা অ্যাকসিডেন্ট বা ঘটনাকে এঁদেরই মতো উত্তম উত্তম ছবি আঁকতে পারে, শ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে, সার্থক কবিতা রচনা করতে পারে— এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্রেরাই বহু সাধনার পর করতে পারতেন?

এই প্রশ্নটি শুধিয়েছেন এক সরলচিত্ত, দিশেহারা সাধারণ লোক— সুইডেনের কাগজে।

উত্তরে আমরা বলি, কেন হবে না? এক কোটি বাঁদরকে যদি এক কোটি পিয়ানোর পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারা যদি এক কোটি বংশপরম্পরা ওগুলোর ওপর পিড়িং পাড়াং করে তবে কি একদিন একবারের তরেও একটি মনোমোহন রাগিণী বাজানো হয়ে যাবে না? সে-ও তো অ্যাকসিডেন্ট!

আমার ব্যক্তিগত কোনও টীকা বা টিপ্পনী নেই। মডার্ন কবিতা পড়ে আমি বুঝি না, রস পাই না। সে নিয়ে আমার কোনও খেদ নেই। পৃথিবীতে যে অতশত ভালো জিনিস রয়েছে যার রসাস্বাদন আমি এখনও করে উঠতে পারিনি, ওগুলো আমার না হলেও চলবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

আমরা যারা বাল্য বয়স থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই যাঁকে সেদিনও পর্যন্ত এলাকার সর্বজন পূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠ রূপে পেয়ে সঙ্কটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ তাদের শোক সবচেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে তাঁকে অসংখ্য লোক কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো তাঁদের অনেককেই আমাদের চেয়ে তাঁকে পূর্ণতররূপে দেখেছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে আশ্রমের সত্তাতে যে আঘাত লেগেছে তার কঠোরতা আজ এই প্রথম আমরা বুঝতে আরম্ভ করলুম। একদিন আমাদের এমন একজন ছিলেন যিনি বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তারপরেও সেদিন পর্যন্ত তিনি আশ্রমবাসীদের সর্বাগ্রণীরূপে আমাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন সমস্যাতে তাঁকে জড়িত করা হত না, কিন্তু তিনিই ছিলেন গুরুতর সমস্যাতে আমাদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

এখানকার শিক্ষাভবনের (অর্থাৎ স্কুলের) শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে তাঁর এই কর্মভার গ্রহণ যে উভয়ের পক্ষেই পরম শ্লাঘার বিষয়, সেকথা দু জনেই জানতেন। পরবর্তীকালে উত্তর বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হলেন ও সর্বশেষে বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্যরূপে আশ্রম পরিচালনা করেন। 'উপাচার্য' শব্দ এখানে প্রয়োগ করাতে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অভিধা— বস্তুত তিনি আচার্যোত্তম ছিলেন। আমি বলতে পারি, পৃথিবীর যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আচার্যরূপে পেলে ধন্য হত।

www.pathagar.com

এবং এই তাঁর একমাত্র কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়।

বস্তুত এরকম বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সর্বদেশেই বিরল। কেউ তাঁকে জানেন সংস্কৃতশাস্ত্রের পণ্ডিতরূপে, কেউ মধ্যযুগীয় সন্তদের প্রচারকরূপে, কেউ রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক রসজ্ঞ ও টীকাকাররূপে, কেউ বাউল-ফকিরের গূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচকরূপে, কেউ চৈনিক-ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থী গবেষকরূপে, কেউ শব্দতত্ত্বের অপার বারিধি অতিক্রমণরত সন্তরণকারীরূপে, কেউ সুখ-দুঃখের বৈদিকার্থে পুরোহিতরূপে, কেউ এই আশ্রমের অনুষ্ঠানাদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী রূপ দিবার জন্য উপযুক্ত মন্ত্র আহরণে রত ঋষিরূপে— আমরা তাঁকে চিনেছি গুরুরূপে।

বিনয়বশত প্রকৃত গুণীজন তাঁর গুণ আচ্ছাদিত রাখেন, কিন্তু শিষ্যের কাছে তাঁর সর্বগুণ উন্মোচন করে দেন। তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল এবং ভরতমম্মটসম্মত প্রাচীনমত আলঙ্কারিক সূত্র তিনি অতি সাধারণ, অতিশয় গ্রাম্য গীতিকাতে আরোপন করে সে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেকথা বারবার সপ্রমাণ করতে জানতেন। বৈদ্যসন্তান বৈদ্যরাজও ছিলেন। রন্ধনশাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল। অভিনয়ে তিনি সুদক্ষ নট। ভারতের ঐক্যানুসন্ধানের পর্যটকরূপে চৈতন্য ও বিবেকানন্দের পরেই তাঁর নাম করতে হয়।

তাঁর আরও বহু গুণ ছিল। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। আজ সেদিন নিশ্চয়ই নয়। এই এখন আমার কানে ভেসে আসছে ক্ষিতিমোহনের বিহারক্ষিতি শালবীথিকায় তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আশ্রমবাসীগণের সশ্রদ্ধ 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীতি।

* * *

চিত্রে নন্দলাল। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন।

শুনেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রাথমিক পুস্তক প্রকাশ করেছেন। তার ভিতরই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতিসম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংখ্যাতীত শিষ্যের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন কাশীর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত চর্চায় যশস্বী হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জনবৈদগ্ধ্য চর্চায়। আজ আর মধ্যযুগের সন্তরা যে পৃথিবীর সর্বসন্তদের সমকক্ষ একথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না, এদেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অতলে পৌঁছে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছিলেন সেকথাও কেউ অস্বীকার করে না, এমনকি কোনও কোনও অর্বাচীন ওই বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ করতে চায় যে, সে ক্ষিতিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তার 'অসম্পূর্ণ' জ্ঞান 'সম্পূর্ণতর' করে দিয়েছে! বিরাটকায় ক্ষিতিমোহনের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে বামনও হয়তো একটু বেশি দূর অবধি দেখতে পায় অস্বীকার করিনে, কিন্তু সে বামন ক্ষিতি-অতিকায়ের বিরাট মস্তিষ্ক আর বিরাটতর হৃদয় পাবে কোথায়! তবে আজ এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব (অবশ্য আমার কাছে নয়) উত্থাপন করব না— আজ শোকের দিন।

www.pathagar.com

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতিমোহন আউল-বাউল গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্র-চর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যেরকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ওইসব শাস্ত্রের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের জীবনদর্শন অধ্যাত্মদর্শন লোকচক্ষের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভক্তিবাদে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মুসলিম সুফিবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সুফিবাদের এমনই গভীরে পৌঁছলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সুফি পর্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, সুফি আবহাওয়ার এত দূর থেকে এই লোকটি একে আপন প্রাণ-নিশ্বাসে ভরে নিল কী করে? রামমোহনকে যদি বলা হয় জবরদস্ত মৌলবি, এঁকে তা হলে বলতে হয় 'খবরদস্ত'— বা 'খবর-দার-সুফি'। পূর্ব বাঙলার অনাদৃত মুসলিম চাষিকে ক্ষিতিমোহন ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন— তিনি প্রমাণ করলেন তার আধ্যাত্মিক সাধনা কুরান ও সুফিবাদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আশ্চর্য প্রাণশক্তিবলে সে তার চতুর্দিকের ভিন্ন সাধনাও আপন করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয় হিন্দু সাধকের কাছে সে ঋণীও বটে, উত্তমর্ণও বটে। এই সর্বশেষে সুপ্রমাণ করলেন, হিন্দু-মুসলমান সাধনার মিলন হয়েছে এই 'চাষাভুষো'দের কল্যাণেই— মৌলভি-ভশ্চাযে যে ভাবনা-সাধনার আদান-প্রদান অতি অল্পেই হয়েছে সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

গণসাধনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ক্রিয়াকর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। 'মেয়েলি' বলে আমরা যেসব পালপার্বণ ব্রতপূজা অবহেলা করে আসছিলুম সেগুলো একটি একটি করে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখাতে লাগলেন যে, এগুলোর ভিতরও অতি প্রাচীন ঐতিহ্য লুকোনো রয়েছে, এর অনেকগুলোই চলে যায় আমাদের ধর্মানুসন্ধানের প্রাচীনতম যুগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলেন যে, আমাদের অনেকগুলোই আবার আমাদের প্রতিবেশী অনার্যদের কাছ থেকে নেওয়া।

সে এক বিপরীত দর্পণ! আমরা যেসব পালপার্বণকে ভেবেছিলুম অতিশয় খানদানি 'আর্য', ক্ষিতিমোহন প্রমাণ করলেন তার অনেকই 'অনার্য' এবং তথাকথিত 'অনার্য' ক্রিয়াকর্মের মূল রয়েছে নৈকষ্য আর্য সাধনার গভীরে।

এর সবকিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মানুপ্রাণিত দর্শনচর্চায়— কারণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহুর বাহ্যরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্যদর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেলেন জ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথের[১] উপদেশ এবং সহযোগিতা— গুণী রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য

---

১. এই ঋষি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যে প্রায় কোনো আলোচনাই হয়নি। এ যুগে এঁর ভগবৎ-উপলব্ধি তুলনাহীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন। ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে এঁর যোগ হওয়াতে উভয়েই প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। নিম্নে ক্ষিতিমোহনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একখানা চিঠি ক্ষিতিমোহনের পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে উদ্ধৃত করছি :

"হিরাক্লিটসের প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্মবাদের গোড়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনার বিচারে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন, এইটে আমি লিখিতে ইচ্ছা করি।

www.pathagar.com

যে তিনি অহরহ পেতেন সে জানা কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, যোগতন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূল তত্ত্বে রয়েছে একই নির্দ্বন্দ্ব সত্য।

এই সত্যের ভানুমতী-দণ্ড হাতে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন হীনযান, মহাযান এবং তারই ভিন্ন ভিন্ন তান্ত্রিক যান, নেপাল-তিব্বত-চীনের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মজগতের ভিতর। সেই এক সত্য কখনও বৌদ্ধদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাধারায়, তন্ত্রের বিকৃত কর্মকাণ্ডের পিছনেও সেই সত্য ভস্মাচ্ছাদিত, সেই সত্যই চর্যাপদে, সেই সত্যই পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে, পশ্চিমবঙ্গের আউল-বাউলের গানে কখনও স্বপ্রকাশ, কখনও শাস্ত্রানধিকারীর উৎপাতে লুক্কায়িত— কখনও সরলতম ভাষায় স্বচ্ছ, কখনও রহস্যাবৃতরূপকে আস্বচ্ছ কুহেলিকাঘন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এতে আর নতুন কথা কি? আমরা তো চিরকালই স্বীকার করে এসেছি, সর্বধর্মেই সত্য সমাহিত।

সত্যই কি আমরা তা জীবনে স্বীকার করেছি? ধর্মের বাহ্যরূপে যে বিকট প্রভেদ অহরহ দেখতে পাচ্ছি, সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করেনি? নাহলে চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণের কী প্রয়োজন ছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন এঁদের মতো ধর্মসংস্কারক ছিলেন। এঁদের প্রধান কর্ম ছিল, যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের ঐতিহ্যের ধন যার প্রায় সবকিছুই আমরা দৈনন্দিন জড় অভ্যাসের ফলে সম্পূর্ণ অবহেলা করে বসে আছি, সাধনাবিহীন মন্ত্রতন্ত্রই সর্বপাপহর বলে বিশ্বাস করে বসে আছি, মুখে 'সর্বভূতে নারায়ণ', কর্মে সে 'নারায়ণ'কে ডোম-চণ্ডালের কলুষতার ভয়ে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছি, স্বর্ণেপর্ণে, ধর্মে-অধর্মে প্রভেদ করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি— এই নিদারুণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি সেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা যে সত্য আমাদের হাতের কাছেই আছে— লালন ফকিরের ভাষায়—

'হাতের কাছে— পাইনে খবর
খুঁজতে গেলেম দিল্লি শহর—।'

যাকে চাইলেই পাওয়া যায়।

ক্ষিতিমোহনের প্রধান কর্ম ছিল, সমাজের তথাকথিত নিম্নতম সম্প্রদায়েও যে সে সত্য যুগপৎ লুক্কায়িত ও উদ্ভাসিত আছে, তারই দিকে তথাকথিত শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে তিনি তাঁর সাধনা আরম্ভ করে নিচের দিকে নেমে এলেন

'প্রবর্তিত' না বলিয়া 'প্রকল্পিত' বলিলাম এইজন্য যেহেতু হিরাক্লিটসের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য নহে— তাহা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র। 'প্রকল্পিত' অপেক্ষা আরও বেশি সঙ্গতমাফিক বিশেষণ আমাকে দিতে পারেন তো ভালো হয়।

'অগ্নিব্রহ্মবাদ' হয় কি না? এরূপ একটি কথা চলিতে পারে কি না— তাহাতে কী বোঝায়?

'প্রকল্পিত' ইহার পরিবর্তে মনোভিমত, প্রস্তাবিত, উপন্যস্ত— এ তিনটির কোনওটি খাটে না। যেহেতু তাহা শুধু মনোভিমত বা প্রস্তাবিত বা উপন্যস্ত নহে। কাশীর পণ্ডিতেরা এরূপ স্থলে কীরূপ তান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করেন?

এই বিষয়ে উচিতানুচিত আমাকে লিখিয়া পাঠান।"

www.pathagar.com

আউল-বাউল এবং সেখানে সেসব মণিমুক্তা পেলেন, তাদের প্রাচীনত্বের সন্ধানে উপরের দিকে গেলেন বেদ-উপনিষদে। এই অবিচ্ছিন্ন তিন লোকে তাঁর গমনাগমন গতিধারা ছিল অতিশয় স্বতঃস্ফূর্ত আয়াসহীন। এটা পণ্ডিতজন-দুর্লভ— ধর্মলোকে বিধিদত্ত স্পর্শকাতরতা না থাকলে এ জিনিস সম্ভবে না।

ক্ষিতিমোহন পথ প্রদর্শন করার পর আরও অনেকেই আউল-বাউল নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্ষিতিমোহন একক।

তার কারণ ক্ষিতিমোহনের এমন একটি গুণ ছিল যা এ যুগে আর কারও ছিল না— আমার অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর কুত্রাপি আমি এ গুণটি দ্বিতীয় জনে দেখিনি।

কঠিনতম জিনিস সরল ভাষায় মধুর রূপে প্রকাশ করার অলৌকিক 'খুদাদাদ্'-বিধিদত্ত ইন্দ্রজাল-শক্তি।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যতখানি, বলেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কারণ তিনি জানতেন পুস্তক সর্বগামী নয়, লিখিত অক্ষরের শক্তি সীমাবদ্ধ।

বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক থেকে আরম্ভ করে শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, অভ্যাগত রবাহূত সকলকে, সভাস্থলে, বন্ধু-সমাগমে, ট্রেনে-জাহাজে, হিমালয়ের চটিতে, নর্মদার পারে পারে, দেশে-বিদেশে তিনি যেখানেই থেকেছেন, যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি এই অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গি দ্বারা তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। শত শত লোক হাজার হাজার গম্ভীর পুস্তক লিখেও যা করতে সক্ষম হবেন না, কথকসম্রাট ক্ষিতিমোহন একাই তা করে গেছেন তাঁর খুদা-দাদ্ এই সওগাতের দৌলতে।

সবিনয় নিবেদন করছি, আচার্য ক্ষিতিমোহনের বহুমুখী কর্ম এবং চিন্তাধারার সম্যক বিশ্লেষণ আমার সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরে। যে-টুকু আছে তা-ও শোকাচ্ছন্ন। তবু আশ্রমবাসী, তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরই স্মরণে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতাদের উদ্দেশে এই কথা কয়টি নিবেদন করি।

আমার অক্ষমতার রচনাও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করত। পুণ্যলোক থেকে আগত তাঁর সে আশীর্বাদ থেকে আমার এ দীন শ্রদ্ধাঞ্জলি অকিঞ্চন গুরুদক্ষিণা বঞ্চিত হবে না— এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com